গল্পে গাথায় ছন্দে

বাংলা স্থাননাম

সংকলক

সমরেন্দ্রনাথ চন্দ



গাঙচিল

প্রথম প্রকাশ
জুলাই ১৯৭০

প্রকাশক
অনিমা বিশ্বাস
গাঙচিল
'মাটির বাড়ি', ওঙ্কারপার্ক, ঘোলাবাজার
কলকাতা ৭০০ ১১১

পরিবেশক
দোয়েল
শাখা-অফিস ও বিক্রয়কেন্দ্র
৩৩ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯

হরফবিন্যাস
রচয়িতা ১০ কিরণশঙ্কর রায় রোড, কলকাতা ৭০০ ০০১

মুদ্রক
জয়শ্রী প্রেস ৯১/১বি বৈঠকখানা রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদপট
বিপুল গুহ

আমার প্রয়াত স্ত্রী
এলা'র স্মৃতির উদ্দেশে

ভূমিকা

ইতিপূর্বে গবেষণামূলক একটি পরিকল্পনার কাজ করবার সময় নদিয়া জেলার 'চাকদা' নামক স্থাননামের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে একটি রোচক গল্প নজরে আসে। ভগীরথ রথে চেপে স্বর্গীয় নদী গঙ্গাকে পথ দেখিয়ে পৃথিবীতে নিয়ে আসছেন। লক্ষ্য কপিল মুনির আশ্রম, যেখানে মুনির শাপে ভগীরথের পিতৃপুরুষগণের শাপদগ্ধ ভস্ম ও আত্মা গঙ্গার জলস্পর্শে উদ্ধারের অপেক্ষায় রয়েছে। লক্ষ্যস্থানের কাছাকাছি এসে হঠাৎ এক জায়গায় ভগীরথের রথের একটি চাকা (চক্র) ভেঙে পড়ল এবং সেই আকস্মিক দুর্ঘটনার চাপে পথে এক বিরাট 'দহ'র সৃষ্টি হল। গঙ্গার অগ্রগতি কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে রইল। রথের 'চক্র' বা চাকা পুনরুদ্ধার হলে গঙ্গা আবার গতিশীল হল। রথের 'চক্র' দ্বারা সৃষ্ট 'দহ' থেকে স্থানটি 'চক্রদহ' নামে পরিচিত হল। কালক্রমে লোকমুখে 'চক্রদহ', 'চাকদহ' বা 'চাকদা' নামে পরিবর্তিত হয়।

এইরকম পৌরাণিক গল্প বা কিংবদন্তির খোঁজ করতে গিয়ে বাংলার স্থাননাম সম্বন্ধে বেশ কিছু চমকপ্রদ গল্প-গাথা এবং তথ্য হাতে এল। সেই তথ্য এবং গল্পসমূহ থেকেই এই সংকলনের পরিকল্পনা। এই বিষয়ে অনুসন্ধানকালে অনেক বিশিষ্ট গবেষকদের লেখা পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ ও গ্রন্থ পর্যালোচনা করার সুযোগ পেয়েছি। তথ্যপূর্ণ সেই সকল গ্রন্থগুলি প্রধানত স্থাননামের ভাষাতত্ত্বের বিন্যাস হলেও অনেকাংশে আমার এই নগণ্য প্রকল্পের রসদ সেইসব গ্রন্থাদি থেকেই আহৃত।

পশ্চিমবঙ্গে প্রায় বিয়াল্লিশ হাজার গ্রাম ও শহর আছে। সেই সকল স্থাননামের পেছনে লুকিয়ে আছে না জানি কতই না ইতিহাস, কিংবদন্তি অথবা পৌরাণিক কাহিনি। দুর্ভাগ্যবশত বৈচিত্র্যময় এই বিশাল নামের তালিকা থেকে সামান্যতম কিছু গল্প-গাথা আমি প্রাপ্ত গ্রন্থাদি থেকে সংগ্রহ করতে পেরেছি। (গ্রন্থপঞ্জি দেখুন) এই প্রকল্প সম্বন্ধে আমি মৌলিকতার দাবি রাখি না। এটা একটা কষ্টার্জিত সংকলন মাত্র। মনে বাসনা জাগে গ্রামবাংলার প্রতিটি গ্রামে গ্রামে গিয়ে স্থাননামের ইতিহাস বা কিংবদন্তির খোঁজ করি। কিন্তু বয়সের ভার

এবং একক প্রচেষ্টায় সে অসাধ্য সাধন সম্ভব নয়। যদি কোনও উদ্যোগী যুবক বা প্রতিষ্ঠান এই কাজে এগিয়ে আসে তবে সে সম্ভবত বাংলার ইতিহাসের অন্তর্নিহিত রহস্যময় যখের ধনের অলৌকিক ভাণ্ডারের সন্ধান পাবে।

এই প্রকল্পে কাজ করার সময় স্থাননামের সঙ্গে যুক্ত পুরনো কালের অনেকগুলি প্রচলিত ছড়া হাতে এল। বৈচিত্র্যের দিক থেকে সেই ছড়াগুলি যেমনই অনন্য, তেমনই বাংলার লোকসংস্কৃতি ও সামাজিক কাঠামোর এক অনবদ্য রেখাচিত্র তুলে ধরে। উদাহরণস্বরূপ—

ছাজা, রাজা, কেশ,
তিন মে বাংলা দেশ। (ছাজা — ঘর ছাওয়ার রীতি।)

* * *

উতরের মানুষ ভিতরে বুদ্ধি,
দখিনের মানুষ সাদা।
পূবের মানুষ চাঁদ সদাগর,
পছিমের মানুষ গাধা ॥

কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্থাননামের ব্যুৎপত্তির হদিশ না পাওয়া গেলেও স্থান সম্পর্কিত ছড়া মাত্র পাওয়া যায়। যথাস্থানে সেইসব ছড়াও উদ্‌ধৃত হয়েছে। কোনও কোনও ছড়ায় একাধিক স্থানের উল্লেখ থাকায় স্থান বিশেষের শিরোনামায় সেই ছড়াগুলির পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। প্রত্যেক নামের সঙ্গে জেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এই পাণ্ডুলিপির যত্ন সহকারে পর্যবেক্ষণ, ভাষা সংশোধন ও মূল্যবান পরামর্শ দেওয়ার জন্য আমি আমার ভগ্নি গীতা সরকারের (কবি ও সমাজসেবিকা) কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

এইরূপ একটা প্রচেষ্টায় ত্রুটি বিচ্যুতির সম্ভাবনা যথেষ্ট। তা ছাড়া স্বভাবতই অনেক স্থাননাম এই গ্রন্থে স্থান পায়নি। এই ব্যাপারে সহৃদয় পাঠকদের একান্ত সহযোগিতা কামনা করি। অজানা কোনও তথ্য বা স্থাননাম সম্বন্ধে কোনওপ্রকার কিংবদন্তি বা গল্প-গাথা জানা থাকলে জানাতে দ্বিধা করবেন না। পরবর্তী সংস্করণে আপনাদের প্রাপ্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করা হবে।

কলকাতা

সমরেন্দ্রনাথ চন্দ

সূচি

উপক্রমণিকা

বাংলা স্থাননামের গল্প-গাথা বলার আগে 'বাংলা' বা 'বাঙ্গালা' শব্দের ব্যুৎপত্তির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আশা করি পাঠকদের জন্য কৌতূহল উদ্দীপক হবে। ভূ-বিজ্ঞানীদের মতে বাংলা সুদূর অতীতে সাগর-গর্ভে নিহিত ছিল। পরে মহাসমুদ্র দক্ষিণাভিমুখী হওয়ায় এই ভূখণ্ড সাগর থেকে উত্থিত হয়। ক্রমশ গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্র নদী ও তাদের শাখা-প্রশাখার পলিতে পুষ্ট হয়ে আধুনিক বাংলা ভূখণ্ড গড়ে ওঠে। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন— "আদিতে বাংলা এক দেশ বা এক জাতি ছিল না। গঙ্গার (পদ্মার) শাখা ভাগীরথী বা হুগলি এবং ব্রহ্মপুত্র এই ভূখণ্ডকে চারভাগে বিভক্ত করে, যেখানে, খৃষ্ট জন্মের বহু পূর্ব থেকে 'পুণ্ড্র' (গঙ্গার দক্ষিণ এবং করতোয়ার পূর্বাংশ-উত্তর-মধ্য বাংলা) 'বঙ্গ' (ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব এবং পদ্মার উত্তরাংশ) 'রাঢ়' (বর্তমান বাঁকুড়া, বীরভূম ও বর্ধমান অঞ্চল) এবং 'সুম' (হুগলির পশ্চিমাংশ) নামক আদিম জন-জাতিরা বাস করত। এই জন-জাতিদের নাম অনুসারেই এই চারটি অঞ্চল 'পুণ্ড্র', 'বঙ্গ', 'রাঢ়' এবং 'সুম' (Pundra, Vanga, Radha and Shuma) নামে অভিহিত হয়। আদিতে গঙ্গার ব-দ্বীপের বহুলাংশ খাল-বিলে পরিপূর্ণ এবং মনুষ্যবাসের অনুপযোগী ছিল।"

প্রশ্ন জাগে এই ভূখণ্ডের আদিম বাসিন্দারা কে বা কারা এবং কোথা থেকে এল। জাতি বিদ্যাবিদ্‌দের মতে প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন জন-জাতির অভিপ্রয়াণ ধারা থেকে জানা যায় যে আদিতে প্রধানত কোল বা দ্রাবিড় এবং মঙ্গোলিয়ান জন-জাতিরা এই অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করে। আর্যরা আসে অনেক পরে। বর্তমান বাংলা স্থাননামের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের মধ্যে দ্রাবিড় বা অস্ট্রিক (Austro-asiatic) প্রভাবের স্পষ্ট ছাপ এই তথ্যের পরিপূরক। (পরিশিষ্ট-'গ'-এ স্থাননামের সঙ্গে জড়িত কিছু দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক শব্দের উদাহরণ দেওয়া হল)

প্রাচীন বৌদ্ধ, জৈন, সংস্কৃত গ্রন্থাদি এবং রামায়ণ ও মহাভারতে এই অঞ্চলের উল্লেখ 'বঙ্গ' এবং 'রাঢ়' নামে পাওয়া যায়। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে এই অঞ্চল সম্রাট অশোকের আয়ত্তাধীনে আসে। ফা-হিয়েন এবং হিউয়েন সাং-এর বৃত্তান্ত অনুসারে যথাক্রমে খ্রিস্টীয় পঞ্চম এবং সপ্তম শতাব্দীতে এখানে উচ্চস্তরীয় আর্য সভ্যতার উন্মেষ হয়। কথিত আছে, ওই সময় 'আদিশূর' এই স্থানে সর্বপ্রথম স্বাধীন হিন্দু রাজ্য স্থাপন করেন এবং সমগ্র অঞ্চল 'গৌড়বঙ্গ' নামে খ্যাত হয়। পরবর্তীকালে পাল ও সেন রাজাদের আমলে গৌড়-বঙ্গের সমধিক আর্থিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি হয় এবং এই রাজন্যদের গৌরব-গাথা সুদূর পাশ্চাত্য দেশেও ছড়িয়ে পরে। সমকালীন গ্রিক ইতিহাসে 'গঙ্গারিডি' নামে এই স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়। (অন্য এক মতে 'বঙ্গ' নামধেয় জনৈক চন্দ্রবংশীয় রাজার রাজত্বরূপে নির্দিষ্ট এই অঞ্চল 'বঙ্গ' নামে অভিহিত হয় এবং এই রাজ্য ভাগলপুরের দক্ষিণ-পূর্ব থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।)

খ্রিস্টীয় ১২০০ সালের কাছাকাছি বাংলা মুসলমান আক্রমণের সম্মুখীন হয় এবং খ্রিস্টীয় ১৫৭৬ সালে এই অঞ্চল সম্রাট আকবরের অধিকারে আসে। আইন-ই-আকবরি প্রণেতা আবুল ফজল লিখেছেন—

"বাঙ্গালা প্রাচীন বঙ্গের নামান্তর মাত্র। পুরাকালে এতদ অঞ্চলে রাজন্যবর্গ সমগ্র প্রদেশে দশ গজ উর্দ্ধ ও বিশ গজ আয়ত এক একটি 'আল' অর্থাৎ মৃত্তিকা স্তুপ প্রস্তুত করিয়া জল প্লাবন নিবারণ করিতে চেষ্টা করিতেন। বঙ্গ + আল এই দুই শব্দের যোগে 'বঙ্গাল' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে।"

ত্রয়োবিংশ শতাব্দী থেকে 'বঙ্গ' ও 'রাঢ়' 'বাঙ্গালা' নামে পরিচিত হয় এবং মুসলমান রাজত্বকালে এই অঞ্চল সরকারিভাবে 'বাঙ্গালা' নামে উল্লিখিত হয়। স্বভাবতই ইংরেজি শব্দ 'বেঙ্গল' বাঙ্গলারই অপভ্রংশ মাত্র।

বাংলা স্থাননাম

অগ্রদ্বীপ: বর্ধমান

আভিধানিক অর্থে গঙ্গাগর্ভে প্রথম চর পড়ে উৎপন্ন দ্বীপবিশেষ। গোপীনাথ মন্দির এবং মেলার জন্য খ্যাত এই স্থানটি প্রায় পাঁচশো বছরের পুরনো বলে কেউ কেউ মনে করেন। শোনা যায় প্রায় চব্বিশ কিলোমিটার দক্ষিণে উৎপন্ন 'নতুন' বা 'নব' দ্বীপের নাম অগ্রদ্বীপ থেকে পৃথক করে দেখাবার জন্য, 'নবদ্বীপ' নামকরণ করা হয়। (নবদ্বীপ দেখুন)

প্রচলিত ছড়া:

নেড়া নেড়ী দোলে।
অগ্রদ্বীপের কোলে।

* * *

অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ ঘোষ ঠাকুরের পাটে।
মানিকপীর দেওয়ান আছেন নগরীর হাটে।

* * *

উলোর মেয়ের কুলকুলজি,
শান্তিপুরের খোঁপা।
অগ্রদ্বীপের হাত নাড়া,
গুপ্তিপাড়ার চোপা ॥

অমরকুণ্ড: মুর্শিদাবাদ

পূর্বনাম পানিকুণ্ড। কথিত আছে, পুরাকালে এখানে গঙ্গা প্রবাহিত ছিল। প্রচলিত কিংবদন্তি অনুসারে রাজা বিক্রমাদিত্য দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ছদ্মবেশে দেশভ্রমণে বেরিয়ে এক সন্ধ্যায় এই গ্রামে আসেন। সন্ধের সময় আরতি এবং কাঁসর ঘণ্টার শব্দে মুগ্ধ হয়ে তিনি রাত্রি যাপন উদ্দেশ্যে স্থানীয় জনৈক পণ্ডিতের গৃহে আশ্রয়

নেন। রাত্রে তিনি গ্রাম্যদেবতার মাহাত্ম্য এবং গ্রামে সংস্কৃত ও ধর্মশিক্ষার পদ্ধতির কথা বিশদভাবে জানার পর এই স্থানের নাম পানিকুণ্ডের বদলে অমরকুণ্ড রাখেন এবং গ্রামদেবতার নিত্যসেবার জন্য ভূমি দান করেন।

অম্বিওখ: দার্জিলিং
মূল তিব্বতি শব্দ; অর্থ, কোনও আসুরিক দেবতার মন্দিরসংলগ্ন স্থান।

অম্বিকানগর: বাঁকুড়া
পূর্বনাম আমাইনগর। শোনা যায় রাজস্থানের ক্ষত্রিয়বংশীয় রাজা জগন্নাথ দেও-এর পৌত্র অনন্তধবল দেও এই স্থানে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন। এক স্বপ্নাদেশানুসারে অনন্তধবল দেও শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জন্মস্থান জয়রামবাটি থেকে এক পাযাণময়ী মূর্তি এনে এই স্থানে প্রতিষ্ঠা করেন। সেই দেবীমূর্তি অম্বিকা নামে পরিচিত হন এবং দেবীর নামানুসারে এই স্থানের নাম অম্বিকানগর হয়।

প্রচলিত ছড়া:

অম্বিকানগর গেছে গানে,
খাতরা গেছে দানে,
রাইপুর গেছে বানে ॥

অম্বিকাবাটিটাকি: প মেদিনীপুর
অম্বি + বাটিটাকি। বাটিটাকি মূল ওড়িয়া শব্দ; অর্থ, সেইসব জমি বোঝায় যাদের খাজনা প্রতি 'বাটি' = ২৪ বিঘা পিছু মাত্র একটাকা। এই স্থানের জমিজমার খাজনা এই নিয়মে নির্ধারিত হওয়ার জন্য এইরকম স্থাননাম হয়েছে।

অম্বুটিয়া: দার্জিলিং
মূল নেপালি শব্দ। অর্থ, আমবাগানে সমৃদ্ধ স্থান।

অযোধ্যা: বাঁকুড়া
মল্লভূমের বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী রাজারা শ্রীবৃন্দাবনের অনুকরণে রাজধানী বিষ্ণুপুরের নিকটবর্তী অঞ্চলে মন্দিরাদি স্থাপন করে সেই সকল স্থানের নাম

রাধানগর, অবন্তিকা, মথুরা, দ্বারিকা, অযোধ্যা ইত্যাদি নামকরণ করেন। অযোধ্যা সেইরকমই একটি স্থান।

প্রচলিত ছড়া:

বুধপুরের বুধেশ্বর,
আনাড়ার বাণেশ্বর,
অযোধ্যার দামোদর
গয়াধামের গদাধর ॥

অযোধ্যা নামে পুরুলিয়া জেলায় তিনটি স্থান আছে। হুগলি জেলাতেও দুটি গ্রামের নাম অযোধ্যা।

অশোক গ্রাম: দ দিনাজপুর
অ + শোক, অর্থাৎ শোকহীন এক পল্লীর অভিলাষিত ভাবনা থেকে উদ্ভূত স্থাননাম।

আউস-গাঁ: বর্ধমান
সুকুমার সেন জানাচ্ছেন, আবৃষ+গ্রাম থেকে আউস-গাঁ অর্থাৎ যেখানে ঠিকমতো বৃষ্টি হয় না।

প্রচলিত ছড়া:

কড়ড়ের ত্যাঁদড়।
আউস গাঁয়ের বাঁদর।
গুসকারার ঢেমন (লম্পট)।
দারাপুরের বামন ॥

আঁটপুর: হুগলি
পূর্বনাম বিষখালি। এই অঞ্চলে একদা ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজার অষ্ট (আট) সেনাপতি বসবাস করতেন বলে স্থানটি আঁটপুর নামে পরিচিত হয়। কেউ কেউ বলেন আটটি গ্রাম নিয়ে গঠিত বলে স্থাননাম আঁটপুর হয়েছে। অন্য এক মতে মুসলমান রাজত্বকালে এইস্থানে আনোয়ার খাঁ ও আঁটোর খাঁ নামে দু'জন মুসলমান জমিদার বাস করতেন। সম্ভবত আঁটোর খাঁর নামে স্থাননাম আঁটপুর

হয়ে থাকবে। পরবর্তীকালে এই গ্রামে স্বামী বিবেকানন্দ দীক্ষিত হন। সেজন্য বর্তমানে আঁটপুর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ স্মৃতিজড়িত তীর্থভূমি।

আকছড়া: প মেদিনীপুর
আক্ + ছড়া। ব্যুৎপত্তি অস্পষ্ট কিন্তু ছড়া অন্ত্য-পদ যুক্ত গ্রামের নামের উল্লেখ চিটাগং কপার প্লেটে (124c A.C.) পাওয়া যায়।

আকড়পুঞ্জী: দ চব্বিশ পরগণা
পূর্বনাম 'সিরিস-পুঞ্জ'। ওই নামের উল্লেখ Silimpur inscription of Jayapala of Kamrup. 11th century-তে পাওয়া যায়। নাম বিবর্তনের ঘটনাক্রম জানা যায় না।

আকন্দডাঙা আকন্দবেড়িয়া: নদিয়া
শোনা যায় একদা এই স্থানদুটি আকন্দ গাছে পরিপূর্ণ ছিল। আকন্দের ঝাড় কেটে গ্রাম পত্তন হওয়ায় গ্রামের অনুরূপ নামকরণ হয়েছে।

আখড়াই: পুরুলিয়া
প্রচলিত ছড়া:

আখড়াই-এর মাটি
বাহাদুরপুরের লাঠি,
আড়কালির ঘাঁটি ॥

আখড়ার হাট: কুচবিহার
ফলিমারির সংলগ্ন এই স্থানে প্রায় দু'শো বছরেরও আগে স্বরূপদাস গোস্বামী নামে একজন সিদ্ধপুরুষ বাস করতেন। তিনি বাক্‌সিদ্ধপুরুষ ছিলেন এবং ভূত-ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নির্ভুল ব্যাখ্যা করতে পারতেন। ক্রমে তাঁর বাসস্থান একটি 'আখড়া'য় পরিণত হয় এবং বহু সাধু-সন্ন্যাসী ও শিষ্য তাঁর আখড়ায় এসে বসবাস আরম্ভ করেন। সেই কারণেই কালক্রমে স্থানটি আখড়ার হাট নামে পরিচিত হয়।

আগঝোর: পুরুলিয়া
আগ + ঝোর। অর্থাৎ অগ্রভাগে অবস্থিত কোনও 'ঝোর' বা ঝরনা বা জলপথ

সূচক স্থাননাম। 'ঝোর' কন্নড় শব্দ 'জোরু' থেকে উদ্ভূত বলে অনুমিত, অর্থ জলধারা বা ঝরনা।

আগরাড়া: প মেদিনীপুর
আগুরী + আড়া শব্দ দুটি থেকে বিবর্তিত স্থাননাম। আগুরী = উগ্রক্ষত্রিয় এবং আড়া = উঁচু ডাঙা জমি। উগ্রক্ষত্রিয়দের বসতিসূচক নাম। 'আড়া' শব্দটি দ্রাবিড় 'ভড়া' অথবা কোল শব্দ 'ওড়ক'-এর অপভ্রংশ বলে অনুমিত। অন্যমতে 'পাড়া' বা বাড়ি অথবা রাড়া শব্দের বিকৃত রূপ 'আড়া'। আগরাড়া নামে এই জেলায় দুটি স্থান আছে।

আগুনকুমারী: বাঁকুড়া
আগুনে গাছপালা পুড়িয়ে জমির উর্বরতা বা কুমারীত্ব পুনর্নবীকৃত করা হয়েছে বলে এইরূপ স্থাননাম হয়েছে বলে অনুমান করা হয়।

অছিপুর: দ চব্বিশ পরগনা
ওয়ারেন হেস্টিংসের সময় টং আচু নামে একজন চিনদেশি ব্যক্তি এই স্থানে একটি চিনির কল স্থাপন করেন। তাঁর নাম থেকেই স্থাননাম হয় আচিপুর, যা পরে লোকমুখে আছিপুর এবং ক্রমে অছিপুর হয়। সেই চিনা ব্যক্তির সমাধি ও একটি চিনা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এখনও কিছু কিছু দেখা যায়।

আটবাইচণ্ডী: বাঁকুড়া
গ্রামে প্রতিষ্ঠিত অষ্টভুজা দেবী চণ্ডীর নামানুসারে স্থাননাম। আট + বাই + চণ্ডী। 'বাই' কথাটা বাহুর অপভ্রংশ। দেবীর দশবাহু স্পষ্টত দেখা গেলেও স্থানীয় লোকেরা দেবীকে অষ্টভুজা বলেই গণ্য করে।

আড়কালি: পুরুলিয়া
প্রচলিত ছড়া:

আখড়াই-এর মাটি।
বাহাদুরপুরের লাঠি।
আড়কালির ঘাঁটি ॥

আড়বান্দা/আড়বান্দি: নদিয়া

বহুকাল পূর্বে গঙ্গা নদীর দিক পরিবর্তন হলে এই স্থানে এক বিরাট চরের সৃষ্টি হয়। ওই চরের জমি মানুষের বাসযোগ্য করার জন্য আড়াআড়িভাবে দুটি মাটির বাঁধ দেওয়া হয়। এই বাঁধ দুটি যথাক্রমে আড়বান্দা ও আড়বান্দি বাঁধ নামে খ্যাত হয়। ক্রমে আশেপাশের গ্রাম থেকে লোকজন এখানে বসতি স্থাপন করলে এই নতুন বসতির নাম হয় আড়বান্দা ও আড়বান্দি।

আদড়া: বর্ধমান

গ্রামে অবস্থিত স্বয়ম্ভু আদরেশ্বর শিবের মন্দির থেকে স্থানের নাম আদড়া (আদ্রা) হয়েছে। অন্যমতে আদড়া বা আদ্রা কথাটি 'অর্ধকরক'-এর অপভ্রংশ। 'অর্ধকরক'-এর উল্লেখ Malla-Sarul copper-plate inscription of Gopa (Chandra) and Vijaya-Sena, 6th century পাওয়া যায়। সুকুমার সেন জানাচ্ছেন, অর্ধকারক অর্থ—'যে গ্রামের খাজানা অর্ধেক কম'।

আনাড়া: পুরুলিয়া

প্রচলিত ছড়া:

বুধপুরের বুধেশ্বর
আনাড়ার বাণেশ্বর,
অযোধ্যার দামোদর,
গয়াধামের গদাধর ॥

আনুলিয়া: নদিয়া

অন্ন + আকুল শব্দ-দ্বয়ের সন্ধিযোগে আনুলিয়া হয়েছে বলে অনুমিত। অন্য এক মতে পূর্বপরিচিত 'অনল' নামের অপভ্রংশে আনুলিয়া হয়েছে। হাওড়া জেলাতেও এই নামে গ্রাম আছে।

আন্দুল: হাওড়া

সুকুমার সেন জানাচ্ছেন, আন্দুল < অন্ন + বাংলা ডোল ('বড়ো পাত্র') অর্থাৎ যেখানে অন্নের অপ্রতুলতা নেই।

প্রচলিত ছড়া:

নষ্ট, দুষ্ট, কুঁদুল।
তিন নিয়ে আঁন্দুল ৷৷

আন্দুল-মৌড়ি: হাওড়ার সাঁকরাইল থানার দুটি পাশাপাশি জনপদ আন্দুল ও মৌড়ি। দুটো জনপদ একত্রে উচ্চারিত হয়।

প্রচলিত ছড়া:

ধন, ধান, কৌড়ি (কড়ি),
তিনে আঁন্দুল-মৌড়ি।

আন্ধার-মানিক: দ চব্বিশ পরগনা

চব্বিশ পরগনা জেলার এই স্থানটির পূর্বনাম কৃষ্ণপুর। কথিত আছে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কোনও অজানা কারণে এই স্থানের নাম পরিবর্তন করে 'আন্ধার-মানিক' নামকরণ করেন।

আন্ধার-মানিক: মুর্শিদাবাদ

শোনা যায়, প্রায় চারশো বছর আগে এই জেলার ভট্টবাটি বা ভট্টমাটি গ্রামের রাজবাড়ির জনৈক মহারাজা একদিন রাত্রে ভাগীরথী-পথে নৌকাভ্রমণ করবার সময় জনমানবহীন এই অঞ্চলে কেবলমাত্র একটি কুটিরে প্রদীপের আলো দেখতে পেয়ে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বলে ওঠেন, 'আঁধারে যেন মানিক জ্বলছে'। সেই সময় থেকে সম্ভবত স্থানটি 'আন্ধার-মানিক' নামে অভিহিত হয়ে আসছে।

আমঘাটা গঙ্গাবাস: নদিয়া

কৃষ্ণনগর শহরের প্রায় ১০ কি. মি. পশ্চিমে জলঙ্গীর শাখা নদী অলকানন্দার তীরে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র একটি প্রাসাদ নির্মাণ করে নাম দেন 'গঙ্গাবাস' অর্থাৎ গঙ্গার তীরে অবস্থিত বাসস্থান। সেই থেকে গ্রাম আমঘাটার নাম হয় আমঘাটা গঙ্গাবাস।

আমডহরা: বীরভূম
আম + ডহবা। ডহরা বা ডহর অর্থে নদীর দহ অথবা বর্ষাকালে প্লাবিত হয় এবং পরে ভাল শস্য ফলায়, এমন জমি বোঝায়। এইরকম ডহরে আম বাগানের উপস্থিতি সূচক স্থাননাম। এই নামে বীরভূম জেলায় দুটি এবং বাঁকুড়ায় একটি স্থান আছে।

আমডোল: বীরভূম
আম + ডোল। আভিধানিক অর্থে 'ডোল' = গড়ন। সম্ভবত আমবাগানের মধ্যে গড়ে ওঠা স্থানবিশেষ। 'ডোল' অন্ত্যপদযুক্ত স্থাননামের উল্লেখ Pushpabhadra inscription of Dharmapala of Pragjyotisa, 12th century-তে পাওয়া যায়।

আমতা: হাওড়া
প্রচলিত ছড়া:

জয়পুরের চোপা, খালনার খোঁপা,
আমতার টান।
কোঁদল দেখবি যদি
রামচন্দ্রপুরের মেয়ে আন ॥

আমবাড়ি-ফালাকাটা: জলপাইগুড়ি
একদা বেঙ্গল ডুয়ার্স নামে পরিচিত এই স্থানটি পূর্বে ভুটান রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে স্থানটি ইংরেজ সরকারের অধিকারে আসে। এই স্থানের এক অংশে বিস্তীর্ণ আমবাগান থাকায় পরবর্তীকালে স্থানের নাম আমবাড়ি-ফালাকাটা হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।

আমলাগড়: বর্ধমান
কথিত আছে, একসময় এই স্থানে সদ্‌গোপ রাজবংশের রাজা মহেন্দ্র'র আধিপত্য ছিল এবং 'গড় অমরাবতী' নামে তাঁর এক বিশাল দুর্গ ছিল। রাজা মহেন্দ্র'র রাজবাড়ি বা দুর্গের ধ্বংসাবশেষের কোনও চিহ্নমাত্র আজ নেই। কিন্তু 'গড় অমরাবতী'র নাম লোকমুখে 'আমরার গড়' নামে আজও অতীতস্মৃতি ধারণ করে আছে এবং পরবর্তীকালে আমলাগড় হয়েছে।

প্রচলিত ছড়া:

আমরার গড় পরিখা বেষ্টিত
নিতান্ত দুর্ভেদ্য জগতে বিদিত।
প্রবেশের পথ
রোধি মহারথ।
থাকিবে সতত সতর্কিত
যাবৎ না শত্রু হয় প্রতারিত ॥

আমলাশুলী: প মেদিনীপুর
আমলা+শুলী। এখানে আমলা অর্থে রাজকর্মচারী। কিংবদন্তি আছে, স্থানীয় অঞ্চলের ভূস্বামীরা একদা তাঁহাদের 'আমলা'রা বিদ্রোহ করায় তাদের এই স্থানে শূলে বিদ্ধ করে হত্যা করে। সেই কারণে এই স্থানের নাম আমলাশুলী হয়।

আমারুন: বর্ধমান
প্রচলিত ছড়া:

তরকারিতে দেয় না নুন,
বাড়ি কোথা, না আমারুন ॥

আরঙ্গাবাদ: প মেদিনীপুর এবং মুর্শিদাবাদ
আরঙ্গ + আবাদ। 'আবাদ' ফারসি শব্দ। অর্থ নতুন বসতি বা জনপদ। মুর্শিদাবাদ জেলার স্থানটি সম্বন্ধে বলা হয় যে দিল্লির বাদশাহ আরঙ্গজেবের নামানুসারে স্থাননাম আরঙ্গাবাদ হয়েছে বলে অনুমান করা হয়। কথিত আছে, বাদশাহের আমলে এই স্থানে একটি সরাইখানা ও সেনানিবাস ছিল। এখানে প্রাপ্ত অনেক মুঘলকালীন প্রত্নতাত্ত্বিক নমুনা এই তথ্যের পরিপূরক। অন্য এক মতে 'আরঙ্গ' নামক কোনও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা স্থাপিত স্থান।

আরবপুর: নদিয়া
পূর্বনাম রামনগর। প্রচলিত জনশ্রুতি— একদা এই স্থানের তিন পাশে ভৈরব নদ বহতা ছিল। রানি ভবানী এই গ্রামে শাস্ত্রাদি চর্চার জন্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের

বসতি স্থাপন করেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা প্রত্যহ প্রাতঃকালে মন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে নদীতে স্নান তর্পণাদি করতেন। একদিন কাশীর এক বিখ্যাত পণ্ডিত ভৈরব-নদপথে নৌকাযোগে রামনগরে আসছিলেন। তিনি অবগাহনরত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মন্ত্র উচ্চারণে মুগ্ধ হয়ে বলেন, যে স্থানে মন্ত্রধ্বনি শোনা যায় সে স্থানের নাম হোক 'অরব' (বেদমন্ত্র ধ্বনি)-পুর। তখন থেকেই এই স্থানের নতুন নাম হয় অরবপুর, যা কালক্রমে আরবপুরে বিবর্তিত হয়। অন্যমতে, মধ্যযুগে আরবদেশীয় সুফিরা এবং কয়েকটি আরবদেশীয় পরিবার এই স্থানে বসবাস করতেন বলে স্থাননাম হয় আরবপুর।

আরসিগঞ্জ: নদিয়া
নীলকর সাহেব রোমান্ড কলিনস্-এর আদ্যাক্ষর আর সি সাহেব নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁরই নামানুসারে আর সি থেকে স্থাননাম আরসিগঞ্জ হয়েছে।

আর্শা: পুরুলিয়া
প্রচলিত ছড়া:

টাঙ্গি, তলোয়ার বর্শা,
তিন নিয়ে আর্শা ॥

আলফা: নদিয়া
নীলকর সাহেব আলফার নামানুসারে স্থাননাম।

আলমপুর: মুর্শিদাবাদ
গিরিয়ার প্রথম যুদ্ধে (১৭৪০) নবাব শরফরাজ খাঁর অন্যতম সেনানায়ক আলমচাঁদের নামানুসারে স্থানের নাম আলমপুর হয়েছে বলে অনুমান করা হয়। এই নামে এ জেলায় তিনটি স্থান আছে। পশ্চিমবঙ্গের অন্য জায়গাও এই নামের একাধিক স্থান আছে।

আলিপুরদুয়ার: জলপাইগুড়ি
ভুটান যুদ্ধ খ্যাত কর্নেল হেদায়েৎ আলি খাঁর নামানুসারে স্থানের নাম হয়

আলিপুর। পরবর্তীকালে 'ডুয়ার্স' শব্দের অপভ্রংশে 'দুয়ার' কথাটি স্থাননামের সঙ্গে যুক্ত হয়।

আলিবং: দার্জিলিং
মূল লেপচা শব্দ। 'আলি' অর্থে জিহ্বা এবং 'আবং' অর্থে মুখ থেকে নির্গত। দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন এই স্থানটি দার্জিলিং পাহাড় থেকে জিবের মতো মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে। স্থানটি 'লেবং' নামে সমধিক পরিচিত।

আলীনান: পূ মেদিনীপুর
আলী + নান। নান কথাটি মূলত ফারসি, অর্থ রুটি। ফারসি 'নানকান' শব্দ থেকে উৎপন্ন বাংলা 'নানকর' অথবা 'নানকার'। যার অর্থ, জমিদার ইত্যাদিকে দত্ত অর্থ বা ভূসম্পত্তি অথবা খোরপোশ বাবদ ভৃত্যদত্ত ভূমি বোঝায়। অন্য মতে, যাঁরা এহেন জমিজমা ভোগ করেন বা করতেন তাঁদেরও 'নানকার' বলা হয়ে থাকে। চলতি কথায় সংশ্লিষ্ট জমিও পরিচিত হয় 'নান' জমি বলে। এই শ্রেণির জমিতে গ্রামের পত্তন হলে বা তার নির্ধারণের সময় 'নান' অন্ত্যপদটি বহুক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে। বর্তমান ক্ষেত্রে 'আলী' নামক ব্যক্তিকে 'নান' জমি প্রদত্ত সূচক স্থাননাম।

আষাঢ়গ্রাম: প মেদিনীপুর
শোনা যায় একসময় এই স্থানে 'আষাঢ়গড়' নামে স্থানীয় হিন্দু রাজাদের একটা দুর্গ ছিল। আষাঢ়গড় থেকে কালক্রমে স্থানের নাম আষাঢ় গ্রাম হয়।

আসনচুয়া: বাঁকুড়া
আসন + চুয়া। 'চুয়া' অর্থে সুগন্ধ নির্যাস। 'আসন' অর্থে স্থান বা বসবার জায়গা। সম্ভবত সুগন্ধ নির্যাসের স্থানসূচক নাম। আবার 'আসন' অর্থে পিয়াল বৃক্ষও বোঝায়। পিয়ালের সুগন্ধ নির্যাস সূচক স্থাননাম হওয়াও অসম্ভব নয়।

আসনঝোর: বাঁকুড়া
আসন + ঝোর। 'ঝোর' কন্নড় 'জোরু' থেকে উদ্ভূত অর্থে জলধারা বা ঝরনা। 'আসন' বা পিয়াল বনের কাছে অবস্থিত 'ঝোর' থেকে স্থাননাম আসনঝোর হয়েছে।

আসনাশোল: বাঁকুড়া
স্থানীয় একটি বড় পুকুরের পাড়ে একত্রে গজিয়ে ওঠা কুঁচিল ফলের গাছের তলায় কয়েকটি মাটির হাতি-ঘোড়া রাখা থাকে। স্থানটিকে স্থানীয় লোকেরা আসনানীদেবীর স্থান বলে অভিহিত করে। 'আসনানী' কথাটার অর্থ অস্পষ্ট, কিন্তু 'জাগ্রত' বলে খ্যাত আসনানীদেবী বর্ষার দ্যোতকরূপে পূজিত হয়ে থাকেন। আসনানীদেবী থেকেই ক্রমে স্থাননাম আসনাশোল হয়েছে বলেই অনুমান।

আসানসোল: বর্ধমান
আসান + সোল। 'সোল' দ্রাবিড় শব্দ, অর্থ জনবসতি বা কোনও কিছুর প্রাপ্তিস্থান। এক মতে আশেপাশের উঁচু জমি থেকে প্রবাহিত জলধারায় কমবেশি সরস জমিকেও 'সোল' জমি বলে। 'আসান' আরবি 'অহসান' শব্দ থেকে এসেছে; অর্থ 'অবসান' বা 'লাঘব'। আদিতে স্থানটি আদিবাসী অধ্যুষিত বনজঙ্গলে পূর্ণ ছিল বলে জানা যায়। প্রায় তিন শতাধিক বছর পূর্বে স্থানীয় রায় জমিদারবংশের তিনকড়ি রায় এবং রামকৃষ্ণ রায় বনজঙ্গল কেটে এইস্থানে গ্রামের পত্তন করেন। এই স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন ঘাগরাচণ্ডী। শোনা যায়, গ্রাম পত্তনের অনেক আগে থেকেই একদা বহতা নুনে নদীর তীরে বিশাল পাথরখণ্ডের ওপর একটি বৃক্ষের নীচে ঘাগরাবুড়ি অধিষ্ঠা ছিলেন। জনশ্রুতি আছে যে কাঙাল চক্রবর্তী নামে এক ব্যক্তি জীবনধারণে বিতৃষ্ণ হয়ে একদা আত্মহননের উদ্দেশ্যে নুনে নদীর তীরে দেবীর পূজাস্থানের কাছে এলে ঘাগরা পরিহিতা এক বৃদ্ধা নারী তার সামনে এসে ব্রাহ্মণকে আত্মঘাতী না হয়ে পূর্বোক্ত বৃক্ষমূলে নিত্য পূজার্চনা করতে নির্দেশ দেন। দেবীর কৃপায় ঠাকুরের দুঃখ অবসান হয়। নদীতীরে কাঙাল ঠাকুরের দুঃখের অবসানের আখ্যান থেকেই স্থানের নাম 'আসানসোল' হয়েছে কি না তার কোনও সঠিক যোগসূত্র জানা যায় না। কাঙাল ঠাকুর বৃক্ষের নিম্নস্থ শিলাখণ্ডকে চণ্ডীকার ধ্যানে পূজা অর্চনা করতেন এবং তিনি দেবীকে ঘাগরা পরিহিতা দেখেছিলেন বলে কালক্রমে দেবী ঘাগরাদেবী বা ঘাগরাচণ্ডী নামে খ্যাত হন। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে এই স্থান দিয়ে রেলপথ চালু হলে আসানসোল গ্রাম ধীরে ধীরে শহরে পরিণত হয়।

ইংলিশবাজার: মালদহ
(মালদহ দেখুন)।

ইটারই: হাওড়া
প্রচলিত ছড়া:

গজা হাবুডুবু,
ইটারাই ভাসে,
সোনার শিবপুর
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসে ॥

ইন্দাস: বাঁকুড়া
পূর্বনাম ইন্দ্রহাস বা ইন্দ্রবাস। অপভ্রংশে ইন্দাস। অর্থ, ইন্দ্রের আবাস। একমতে 'ইন্দ্রহাস' রাজবংশেব চতুর্থ রাজা কানুমল্ল ৭৩৩ খ্রিস্টাব্দে এই স্থানের তদানীন্তন নরপতিকে পরাজিত করে এই স্থানটি দখল করে ইন্দ্রহাস রাজবংশের নামানুসারে 'ইন্দ্রহাস' নামকরণ করেন।

ইন্দ্রপুর: দ চব্বিশ পরগনা
এই স্থানের আদি জমিদার ইন্দ্রনারায়ণ হাজরার নামানুসারে স্থানের নাম ইন্দ্রপুর হয়েছে বলে অনুমিত।

ইন্দ্রাণী: মুর্শিদাবাদ
কথিত আছে, আকবরের সময়ে এই স্থানে বাংলার নবাব কতলু খাঁর পুত্র ওসমানের মনসবদার ইন্দ্র বসবাস করতেন। এই মনসবদার ইন্দ্রের নামানুসারে স্থানের নাম ইন্দ্রাণী হয়েছে বলে জানা যায়।

ইন্দ্রেশ্বর: বর্ধমান
কাটোয়ার নিকটবর্তী এই স্থানটিও ইন্দ্রাণী নামে পরিচিত। প্রবাদ আছে যে দেবরাজ ইন্দ্র এই স্থানে গঙ্গাস্নান করেন বলে স্থানের নাম ইন্দ্রেশ্বর বা ইন্দ্রাণী হয়। কথিত আছে, একসময় এইস্থানে বারোটি ঘাট ছিল এবং তার প্রত্যেকটি তীর্থরূপে গণ্য হত।

প্রচলিত ছড়া:

নিমেষেতে আইলেন গ্রামে ইন্দ্রেশ্বর,
গঙ্গা লয়ে ভগীরথ চলিল সত্বর।
গঙ্গা জলে যথা ইন্দ্র করিলেন স্নান,
ইন্দ্রেশ্বর বলি নাম হইল সে স্থান ॥

* * *

ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্বাপর স্থিতি।
দ্বাদশ তীর্থেতে যথা বৈসে ভাগীরথী ॥

* * *

বারো ঘাট, তেরো হাট, তিনচণ্ডী, তিনেশ্বর।
এই যে বলিতে পারে তার ইন্দ্রাণীতে ঘর ॥

ঈশ্বরচন্দ্রপুর: নদিয়া
নদিয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের উত্তরাধিকারী নদিয়ার রাজা শিবচন্দ্রের পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রের নামানুসারে স্থাননাম।

উচকরণ: বীরভূম
পূর্বনাম বাসুদেবনগর। শোনা যায় এই স্থানে অনেকগুলি ক্ষুদ্র-বৃহৎ বাসুদেব মূর্তি অধিষ্ঠিত ছিল বলে স্থাননাম হয় বাসুদেব নগর। কথিত আছে, নবাব আলিবর্দি খাঁর শাসনকালে বর্গি অত্যাচারের ভয়ে গাঙ্গেয় অঞ্চল থেকে এই স্থানের প্রাচীন বাসিন্দা চৌধুরীরা এখানে এসে বসবাস করেন। চৌধুরীদের পূর্বে উপাধি ছিল চট্টোপাধ্যায়। এই পরিবারের অনেকেই নবাব সরকারের অধীনে কাজ করতেন। তাঁদের কাজে সন্তুষ্ট হয়ে আলিবর্দি খাঁ এঁদের প্রভূত ভূসম্পত্তি প্রদান করেন এবং 'চৌধুরী' উপাধিতে ভূষিত করেন। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের সেবাকার্যের জন্য চৌধুরীপরিবার ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেন এবং তৎকালীন সরকার স্থানের নাম বাসুদেবনগরের পরিবর্তে 'উচ্চকরণ' নামে রাজস্ব নথিপত্রে লিপিবদ্ধ করার আদেশ দেন। এই নাম পরিবর্তনের কারণ অবশ্য জানা যায় না। কালক্রমে 'উচ্চকরণ' অপভ্রংশে 'উচ্‌করণ' হয়। অন্য এক মতে, 'করণ' উপাধিধারী কারণিকদের বসতির জন্য এই অঞ্চলের এইরকম নাম হয়েছে।

উত্তরপাড়া: হুগলি

উত্তরদিকে অবস্থিত পল্লীসূচক স্থাননাম। পূর্বে স্থানটি হাওড়া জেলার বালি গ্রামের একটি পাড়া ছিল। পরে স্বতন্ত্র জনপদে পরিণত হলে হুগলি জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। শোনা যায় একসময় স্থানটি রাসযাত্রার জন্য খ্যাত ছিল।

প্রচলিত ছড়া:

গাড়ি, ঘোড়া, টাকার তোড়া,
এ তিন নিয়ে উত্তরপাড়া ॥

* * *

গাড়ি, ঘোড়া, ফুলের তোড়া,
এ তিন নিয়ে উত্তরপাড়া ॥

* * *

ওতোর পাড়া, ধনের ঘড়া।
বালী— হাড় কালি ॥

* * *

গাঁজা, গুলি, মদের ছড়া।
এ তিন নিয়ে ওতোর পাড়া ॥

উদং: হাওড়া

কথিত আছে, এই ভূভাগটি ধীরে ধীরে ধরাতল থেকে উত্থিত হয়ে লোকবসতির উপযোগী হয়। উদ্‌গত বা উত্থিত এই অর্থে স্থাননাম উদং হয়েছে বলে অনুমিত।

উদয়পুর: বর্ধমান

কিংবদন্তি আছে, বেহুলা মৃত পতির শব নিয়ে কলার ভেলায় ভেসে যাবার পর এখানে উদিত হন। সেই কারণে স্থানের নাম হয় উদয়পুর।

উদ্ধারণপুর: বর্ধমান

রাধাকৃষ্ণপুর অথবা নৈহাটি নামে এই স্থানের উল্লেখ পুরনো নথিপত্রে পাওয়া যায়। কবিকঙ্কণ চণ্ডী গ্রন্থে নদীপথে চাঁদসদাগরের যাত্রা বর্ণনা প্রসঙ্গে

ভাগীরথী তীরবর্তী অনেক স্থানের উল্লিখিত নামের মধ্যে 'নৈহাটি' ও 'উদ্যানপুর' নাম পাওয়া যায়। অনেকে মনে করেন স্বর্গউদ্যান সাদৃশ্য ছিল বলে একদা স্থানটি 'উদ্যানপুর' নামে খ্যাত ছিল। কালক্রমে 'উদ্যানপুর' অপভ্রংশে 'উদ্ধারণপুর' হয় বলে মনে করা হয়। কিন্তু এই স্থানের নামের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে পরম বৈষ্ণব সাধক উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের নাম। চৈতন্যদেবের অনুগতভক্ত হুগলি জেলার সপ্তগ্রাম নিবাসী দিবাকর দত্ত (উদ্ধারণ দত্তের পৈতৃক নাম) নৈরাজের অত্যন্ত প্রতিষ্ঠিত লাভজনক পদ ত্যাগ করে সাধন-ভজন করার জন্য ভাগীরথী তীরের শান্ত এবং মনোরম এই স্থানে বাকি জীবন অতিবাহিত করার সিদ্ধান্ত নেন। কথিত আছে, একবার তিনি হরিনাম জপ করতে করতে গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে যান। সেইসময় চৈতন্যদেব দেশভ্রমণের সময় দিবাকরের কুটিরে এসে হাজির হন। ধ্যানমগ্ন দিবাকরকে দেখে এবং তাঁর প্রগাঢ় হরিভক্তির কথা জেনে চৈতন্যদেব দিবাকরের নাম রাখেন উদ্ধারণ দত্ত। শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপালব্ধ দিবাকর তখন থেকে উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর নামে খ্যাত হন এবং স্থানটি উদ্ধারণপুর নামে পরিচিত হয়। বৈষ্ণবগ্রন্থে এই স্থানটি চৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বাদশ গোপালের পাটবাড়ির মধ্যে একটি পাটবাড়িরূপে উল্লেখ পাওয়া যায়। দ্বাদশ গোপালের মধ্যে উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর অন্যতম বলে অভিহিত হন এবং উদ্ধারণপুরই যে উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের পাটবাড়ি তার সমধিক উল্লেখ বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়। এই থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে সাধকপ্রবর উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের নামানুসারেই এই স্থানের নাম উদ্ধারণপুর হয়েছে।

প্রচলিত ছড়া:

উদ্ধারণপুরের মেলা,
কলা আর শোলার মালা ৷৷

উলপুর: উ চব্বিশ পরগনা

প্রচলিত ছড়া:

টাকির মেয়ের টক্‌টকানি।
উলপুরের মেয়ে ঘরভাঙানী ৷৷

উলা: নদিয়া

স্থানটি উলা-বীরনগর নামেও পরিচিত। (বীরনগর দেখুন) প্রবাদ আছে উলুবনের জঙ্গল কেটে জনবসতি হয়েছিল বলে স্থাননাম উলা হয়। অন্য এক মতে ফারসি 'আউল' অর্থাৎ জ্ঞানী শব্দ থেকে উলা নাম হয়েছে। কিন্তু এই তথ্যের কোনও যুক্তিসংগত সূত্র পাওয়া যায় না। এক প্রাচীন লোকগাথা অনুসারে এই স্থানটির নাম শ্রীমন্ত সদাগরের উপাখ্যানের সঙ্গে জড়িত। গঙ্গা তখন এখানে বহতা ছিল। একদা শ্রীমন্ত সদাগর গঙ্গাপথে যাত্রাকালে ভীষণ ঝড়-ঝঞ্ঝার সম্মুখীন হন। প্রবল ঝড় থেকে তাঁর নৌবহর রক্ষার জন্য তিনি শিবপত্নী উলাই চণ্ডীর দ্বারস্থ হন। শ্রীমন্তের প্রার্থনায় ঝড়ের প্রকোপ শান্ত হলে তিনি এই স্থানে দেবীর বিশেষ পুজোর আয়োজন করেন। সেই থেকে স্থাননাম 'উলা' হয়েছে বলে অনেকে অনুমান করেন।

প্রচলিত ছড়া:

পোল, পাগল, পুলো,
তিন নিয়ে উলো।
(পোল = বাগান, পুলো = খড়)

* * *

উলুই (উলার) পাগল,
গুপ্তিপাড়ার বাঁদর,
হালিশহরের তেঁদর (ত্যাঁদড়) ॥

* * *

কৃষ্ণনগরের ময়দা ভাল,
মালদহের ভাল আম।
উলোর ভাল বাঁদর-পুরুষ,
মুর্শিদাবাদের জাম ॥

* * *

উলোর ভুঁয়ের ময়দার সয়দাবাদের ঘি,
শান্তিপুরের কড়াই এনে লুচি ভেজে দি ॥

* * *

উলোর মেয়ের কলকলানি শান্তিপুরের খোঁপা,
নদের মেয়ের নথ নাড়া কলকাতার চোপা ॥

* * *

উলোর মেয়ের কুলজি অগ্রদ্বীপের খোঁপা,
শান্তিপুরের হাতনাড়া গুপ্তিপাড়ার চোপা ॥

উলুবেড়িয়া: হাওড়া

শোনা যায় একসময় এই স্থানটি উলু ঘাসের জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। উলুবন পরিষ্কার করে জনবসতি হলে স্থাননাম হয় উলুবেড়িয়া। অন্যমতে, 'উলু' অর্থাৎ পেঁচার আবাসস্থল অর্থে স্থাননাম উলুবেড়িয়া হয়েছে।

প্রচলিত ছড়া:

দাঁড়ি, মাঝি, ফড়ে,
তিনে উলুবেড়ে ॥

* * *

দাঁড়ি, মাঝি, পাইকার, ফড়ে,
এই চার নিয়ে উলুবেড়ে ॥

* * *

ঘেঁটেল, চোটেল, ফড়ে,
তিনে উলুবেড়ে ॥
(ঘেঁটেল = ঘাঁটকারী; চোটেল = কুতার্কিক।)

* * *

ওরে আমার ননী,
সাধ গিয়েছে খেতে
তোমার উলুবেড়ের ফেনী ॥
(ফেনি = বিশেষ ধরনের বড় বাতাসা)

* * *

হাজিপুরের তাল-পাটালি,
বাসুলডাঙ্গার খই।
ধামুয়ার রাঙা মুলো,
উলুবেড়ের দই ॥

একআনা-চাঁদপাড়া: মুর্শিদাবাদ

স্থানটির প্রকৃত নাম চাঁদপাড়া। একআনা-চাঁদপাড়া নামের পেছনে একটি কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। সুদূর আরব থেকে হুসেন নামে এক বালক তার পিতার সঙ্গে ভাগ্যের সন্ধানে এই স্থানে এসে উপস্থিত হয়। বালকটি স্থানীয় জমিদার সুবুদ্ধি রায়ের অধীনে গোরু চরাবার কাজে নিযুক্ত হয়। একদিন হুসেন গোরু চরাতে গিয়ে মাঠে ঘুমিয়ে পড়লে দুটি সাপ তার মাথার কাছে ফণা বিস্তার করে রোদের তাপ থেকে রক্ষার জন্য তার মাথা আচ্ছাদিত করে রাখে। সুবুদ্ধি রায় এই দৃশ্য দেখে বালককে বলেছিলেন যে, সে একদিন রাজা হবে এবং তখন যেন সে তার পুরাতন মনিবকে ভুলে না যায়। চাঁদপাড়ায় থাকাকালীন স্থানীয় এক কাজির বাড়িতে হুসেন লেখাপড়া শেখে এবং পরে কাজির মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। সেই কাজির গৌড়-দরবারে যাতায়াত থাকায় তাঁর সাহায্যে হুসেন রাজদরবারে একটি চাকরি পায়। শীঘ্রই নিজের গুণবলে হুসেন উজির পদে উন্নীত হয়। উত্তরকালে সেই হুসেন গৌড়েশ্বর হুসেন শাহ বাদশাহরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বাদশাহ হয়ে তিনি তাঁর পুরনো মনিব সুবুদ্ধি রায়কে সমগ্র চাঁদপাড়া জনপদের নিষ্কর জমিদারিত্ব দিতে চাইলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ সুবুদ্ধি রায় বাদশাহের দান গ্রহণ করতে সম্মত না হওয়ায় এই জনপদের খাজনা মাত্র একআনা ধার্য করেন। তখন থেকে এই স্থানের নাম হয় একআনা-চাঁদপাড়া।

একচালা: বাঁকুড়া

কথিত আছে, একসময় এই স্থানের বাসিন্দারা স্থানীয় দুর্দান্ত সামন্তদের দ্বারা অত্যাচারিত ও বিতাড়িত হতে থাকলে স্থানীয় জমিদার জনৈক রাজীবলোচন করমহাশয়-এর শরণাপন্ন হন এবং তাঁকে এই স্থানে বসবাসের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করে দেন। করমহাশয় এখানে এসে একটি একচালা গৃহ নির্মাণ করে বাস করতে থাকেন এবং দুর্দান্ত সামন্তদিগকে দমন করেন। স্থানত্যাগী বহু লোকজন ফিরে এসে এই স্থানে আবার বসবাস আরম্ভ করেন। করমহাশয়ের নির্মিত একচালা গৃহকে কেন্দ্র করে স্থানের নাম হয় 'একচালী', যা বর্তমানে একচালা নামে পরিচিত।

একবর্ণা: মালদহ

এই স্থানের নাম সম্বন্ধে দুটি জনশ্রুতি আছে। এক মতে, পূর্বে এই স্থানটি আকন্দ বনে পূর্ণ ছিল। আকন্দ বন পরিষ্কার করে জনবসতি গড়ে উঠলে স্থাননাম একবর্ণা হয়। ব্যুৎপত্তি এইরকম—আকন্দবন = আকবন্না = একবন্না = একবর্ণা। অন্যমতে পূর্বে এই স্থানে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণদের বসবাস ছিল বলে স্থানের নাম একবর্ণা হয়। অর্থাৎ একবর্ণের বাস থেকে একবর্ণা। গৌড় থেকে বৃন্দাবনের পথে শ্রীচৈতন্য এখান দিয়ে গিয়েছিলেন বলে একটি জনশ্রুতি প্রচলিত আছে।

এক্তেশ্বর: বাঁকুড়া

প্রবাদ আছে যে, একসময় এক রাজা এই স্থানে উচ্চনীচ সব সম্প্রদায়ের লোককে একত্রে বসিয়ে ভোজের আয়োজন করেছিলেন বলে একতার নিদর্শনস্বরূপ স্থানের নাম হয় এক্তেশ্বর। অন্য মতে, বিষ্ণুপুরের রাজা এই স্থানে একপাদেশ্বর শিবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন বলে একপাদেশ্বর থেকে এক্তেশ্বর স্থাননাম হয়। কেউ কেউ মনে করেন, স্থাননাম এক্তেশ্বর থেকেই গ্রাম-দেবতার নাম এক্তেশ্বর হয়।

এনায়েৎপুর: মালদহ

প্রায় চারশো বছর আগে এই স্থানটি গঙ্গার পরিত্যক্ত একটি চরাভূমি ছিল। সেই সময় দ্বারভাঙ্গা জেলার অবস্থাপন্ন লোকেরা গঙ্গাপথে বাংলার তদানীন্তন রাজধানী গৌড়ে যাতায়াত করতেন। যাতায়াতের পথে পলিমাটিপূর্ণ এই চরটি দেখে তাঁরা কিছু সংখ্যক কৃষকদের নিয়ে এখানে বসবাস আরম্ভ করেন। পরে জমিতে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হতে দেখে আশেপাশের গ্রাম থেকে কিছু কিছু লোকও এই জায়গায় স্থায়ী বসবাস আরম্ভ করেন। এইভাবে শূন্য চরটি ধীরে ধীরে একটি গ্রামে পরিণত হয়। এই নতুন জনবসতির প্রথম অধিবাসী শেখ এনায়েৎ-এর নামানুসারে স্থানের নাম এনায়েৎপুর হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।

এলাশাইরাঙাদিঘি: প মেদিনীপুর

কথিত আছে এই স্থানের এক দিঘিতে রাঙা পদ্ম, রাঙা মাছ, এমনকী দিঘির মাটিও রাঙা ছিল বলে স্থানীয় লোকেরা এই দিঘির নাম রাঙাদিঘি রাখেন এবং স্থানটিও ওই নামেই পরিচিত হয়। কিন্তু স্থাননামের সঙ্গে 'এলাশাই' কথার যোগসূত্র অস্পষ্ট।

এল্লাবনী: প মেদিনীপুর
একদা এই স্থানের জলাভূমি 'এলা' নামে পরিচিত একপ্রকার তৃণ দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। পরবর্তীকালে এখানে জনবসতি গড়ে উঠলে স্থানটি 'এলাবনী' নামে অভিহিত হয়, যা পরে অপভ্রংশে 'এল্লাবনী' হয়েছে।

ওঁদা: বাঁকুড়া
প্রচলিত ছড়া:

ঘরে ঘরে ভাত জঁদা (পচানো),
তবে জানবি এলি ওঁদা ॥
* * *
পুরুষ ভাল মেয়ে খাঁদা,
দেখবি যদি আয় ওঁদা ॥

ওমরপুর: বর্ধমান
প্রচলিত ছড়া:

ওমরপুরের মাটি,
মীরহাট বদ্যিপুরের বেটি ॥

কক্সা: বর্ধমান
পূর্বনাম কঙ্কেশ্বর। অপভ্রংশে কক্সা। কথিত আছে, একসময় এই স্থানে গোপভূম ও সেনপাহাড়ির সদ্‌গোপ রাজবংশের আধিপত্য ছিল। বাংলায় মুসলমান আক্রমণের গোড়ার দিকে সৈয়দ বোখারি নামে জনৈক দুঃসাহসী মুসলমান সৈনিক সদ্‌গোপ রাজাকে পরাজিত করে নিহত করে এই স্থান দখল করে।

কঙ্কণগুড়ি: কুচবিহার
পূর্বনাম মহিষটারী। প্রবাদ আছে যে, একসময় একটি ছোটনদী এই স্থানের মাঝখান দিয়ে বহতা ছিল। প্রায় শতাধিক বছর আগে এই নদীতে একটি সোনার কঙ্কণ পাওয়া যায়। কঙ্কণটিকে দেবজ্ঞানে গ্রামবাসীরা পুজোর ব্যবস্থা করে। সেই থেকে এ-স্থানের নাম হয় কঙ্কণগুড়ি।

কঙ্কণদিঘি: দ চব্বিশ পরগনা
কোনও কঙ্কণবতীর জলতলে অন্তর্ধান বা সলিলসমাধির উপাখ্যানের সঙ্গে জড়িত স্থাননাম।

কঙ্কালীতলা/কঙ্কালী: বীরভূম
পূর্ব নাম জলজোল। বিষ্ণুচক্রে ছিন্ন হয়ে সতীর 'কাঁক' অর্থাৎ কোমরের একাংশ এখানে পড়েছিল বলে অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম হয় কঙ্কালী এবং সেই থেকে স্থানের নাম হয় কঙ্কালীতলা। সেই সূত্রে স্থানটি বাহান্নপীঠের এক পীঠ রূপে গণ্য। এখানে দেবীর কোনও মূর্তি নেই, আছে কেবল একটি নির্দিষ্ট বাঁধানো স্থান। মন্দির বা মূর্তি না থাকার কারণ সম্পর্কে বলা হয় কঙ্কালী জলময়ী দেবী। বাঁধানো স্থানটি একটা কুণ্ডের পাশে অবস্থিত। বলা হয়, সতীর দেহের অংশ সেই কুণ্ডের ঈশানকোণে পড়েছিল। দেবী এই কুণ্ডেই জলমগ্না বলে গণ্য করা হয়। বাঁধানো চত্বরের ওপর তিনটি মাত্র ত্রিশূল প্রোথিত আছে এবং ত্রিশূলগুলির পাদদেশে স্থাপিত মাটির ঘটকে কালীর ধ্যানে কঙ্কালীদেবীর পুজো করা হয়। অনেকে বলে, দেবীর নির্দিষ্ট বেদির নীচে একশো আটটি নরমুণ্ড প্রোথিত আছে।

কড়িধ্যা: বীরভূম
প্রচলিত ছড়া:

কডড়ের ত্যাঁদড়।
আউস গাঁয়ের বাঁদর।
গুসকারার ঢেমন (লম্পট)।
দারাপুরের বামন ॥

কনকনগর: উ চব্বিশ পরগনা
একদা জঙ্গলাকীর্ণ এই স্থানটি স্যাণ্ডেল নামক এক ইংরেজ তদানীন্তন ২৪ পরগনা: শাসকের কাছ থেকে 'জমা-বন্দোবস্ত' নেন। তিনি পরে ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে সালে তরুণ সরকার ও যোগেন ঘোষ নামক ব্যক্তিদ্বয়কে ৯৯ বৎসরের জন্য স্থানটি লিজ দেন। কথিত আছে, তরুণ সরকারের পুত্র কনক সরকারের নামে স্থানের নাম কনকনগর হয়।

কমলাবাড়ি: উ দিনাজপুর
আনুমানিক চতুর্দশ শতকে এই অঞ্চলের রাজা গণেশের পত্নীর নামানুসারে স্থাননাম। (কসবা মহেশো দেখুন)

কয়া: মুর্শিদাবাদ
কিংবদন্তি অনুসারে এই স্থান-সংলগ্ন একটি বিল দিয়ে মঙ্গলকাব্যে উল্লিখিত চাঁদসদাগর তাঁর বজরায় চড়ে যাতায়াত করতেন। সেই সূত্রে বিলটি চাঁদবিল নামে খ্যাত হয়। বিলের জলকে গ্রামবাসীরা স্থানীয় ভাষায় 'কো আয়া' বলে। খুব সম্ভবত 'কো আয়া' কথার অপভ্রংশে এই স্থানের নাম 'কয়া' হয়েছে। অন্য মতে, খেজুর গাছের অপর নাম 'কয়া'। এখানে খেজুর গাছের প্রাধান্য থাকায় স্থানটির নাম 'কয়া' হয়েছে। 'কয়া' নামে মুর্শিদাবাদ জেলায় দুটো এবং নদিয়ায় একটি স্থান আছে।

করদহ: দ দিনাজপুর
কিংবদন্তি আছে, অসুররাজ বাণের কন্যা উষার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের পরিণয় উপলক্ষে যে যুদ্ধ হয় তাতে শ্রীকৃষ্ণ অসুররাজের আটানব্বইটি হাত (অন্যমতে বাহান্ন) কেটে ফেলেন। সেই কাটা হাতগুলো এই স্থানে এসে পড়ে এবং কথিত আছে এখানেই সেই কাটা হাতগুলো দাহ করা হয়। এই কারণে স্থাননাম করদহ হয়েছে বলে অনেকে অনুমান করেন।

করণদিঘি: উ দিনাজপুর
কর্ণদিঘি নামে একটি স্থানীয় বৃহদাকার দিঘির থেকে অপভ্রংশে করণদিঘি স্থাননাম হয়েছে বলে অনুমান করা হয়। জনশ্রুতি আছে, এই দিঘিটি দাতা কর্ণ খনন করেছিলেন। সাধারণের বিশ্বাস এই স্থানে কর্ণের রাজধানী ছিল।

কর্জনা: বর্ধমান
প্রচলিত ছড়া:

যদি যাবি কর্জনা,
তো নেয়েধুয়ে ঘর যানা ॥

কর্ণগড়: প মেদিনীপুর

প্রবাদ আছে যে, উৎকলাধিপতি কর্ণকেশরী এই স্থানে একটি জনপদ প্রতিষ্ঠা করে কর্ণগড় নামকরণ করেন। কবি সন্ধ্যাকর নন্দী প্রণীত 'রামচরিতম্' নামক সংস্কৃত কাব্যে কর্ণকেশরীর উল্লেখ পাওয়া যায়। কেউ কেউ অনুমান করেন, এই স্থানে দাতাকর্ণের বসতবাড়ি ও ভোজরাজার রাজধানী ছিল। সেই সূত্রে স্থাননাম কর্ণগড় হয়। একসময় এখানে সিংহ উপাধিধারী এক রাজবংশের রাজধানী ছিল বলে জানা যায়। স্থানটি অনাদিলিঙ্গ দণ্ডেশ্বর শিবের জন্য প্রখ্যাত।

কর্ণসুবর্ণ: বর্ধমান

পুরাতন নাম চিরতী। স্থানটি রাঙামাটি নামেও পরিচিত। কর্ণসুবর্ণ ও রাঙামাটি নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে জনশ্রুতি আছে যে, এখানে দাতা কর্ণের রাজধানী ছিল। তাঁর পুত্র বৃষসেনের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে লঙ্কার অধিপতি বিভীষণ নিমন্ত্রিত হয়ে এখানে আসেন। তিনি শিশুর মঙ্গল কামনায় এখানে স্বর্ণবৃষ্টি করায় এখানকার মাটি রক্তবর্ণাভ হয়। সেই থেকে স্থানের নাম কর্ণসুবর্ণ ও রাঙামাটি রাখা হয়। অদূরবর্তী গোকর্ণ নামক স্থানে কর্ণের গোশালা ছিল বলে প্রবাদ আছে। কর্ণসুবর্ণের সঙ্গে রাঙামাটির অভিন্নত্বের প্রমাণস্বরূপ আরও বলা হয় যে, আগে এই স্থানটি 'কানসোনা' নামেও পরিচিত ছিল। কানসোনা স্পষ্টতই কর্ণসুবর্ণ নামের অপভ্রংশ। ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন যে, চৈনিক পর্যটক হিউয়েন সাঙের বর্ণিত কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ নগরী এখানেই অবস্থিত ছিল। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন সাঙের কর্ণসুবর্ণ রাজধানীর কাছে 'লো-টো-বী-চী' বা রক্তভিত্তি নামে বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম দেখেছিলেন বলে তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে বর্ণিত আছে। 'রক্তভিত্তি' বা 'রক্তমৃত্তি' নাম থেকেই রাঙামাটি নাম হয়েছে অনেকে অনুমান করেন। য়ুয়ান চোয়াঙের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে মহারাজ শশাঙ্কের বহু পূর্ব থেকেই রাঙামাটি একটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধকেন্দ্র ছিল।

কলগাঁ: বীরভূম

কথিত আছে 'চারকল' নামের অপভ্রংশে কলগাঁ নাম হয়েছে।

প্রচলিত ছড়া:

কলগাঁয়ের হেলে।
মোহনপুরের ছেলে ॥

কলাছড়া: হুগলি

পূর্বে স্থানীয় জমিদার মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের নামানুসারে স্থানের নাম ছিল 'মধুয়াবাটী'। পরে 'শুভিপুর হয়। বর্তমানে 'কলাছড়া' নামে পরিচিত। এই নাম বিবর্তনের কারণ জানা যায় না।

কলিকাতা/কলকাতা

শহর কলিকাতা (বর্তমানে কলকাতা) ছাড়া হাওড়া জেলার আমতা থানার অন্তর্গত দামোদর নদের উত্তরপাড়ে কলিকাতা নামে আরও একটি স্থান আছে। দুই কলিকাতাকে পৃথক করে দেখার জন্য হাওড়া জেলার কলিকাতাকে রসপুর-কলিকাতা বা ছোট কলিকাতা বলা হয়।

কলিকাতা নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। অনেকে বলেন কালীক্ষেত্র বা কালীঘাট থেকে 'কলিকাতা' নাম হয়েছে। কিন্তু এই অনুমান যথার্থ নয়, কেন না কালীর নামে কালীঘাট এবং তার পাশে স্বতন্ত্র গ্রাম কলিকাতার ভৌগোলিক অবস্থান দীর্ঘকালের। কবিরামের গ্রন্থে 'কিলকিলা' নামক গ্রামের উল্লেখ আছে। রাজা রাধাকান্ত দেবের মতে 'কিলকিলা' থেকেই কলিকাতা নাম হয়েছে। ইংরেজ উপনিবেশের আগে জনৈক ওলন্দাজ পর্যটক এই জায়গায় বহু মড়ার খুলি দেখতে পেয়ে এই জায়গাটা একটা নরমুণ্ডের স্থান বা তাঁর নিজের ভাষায় 'গলগাথা' নামে উল্লেখ করেন। অনেকে মনে করেন 'গলগাথা'র অপভ্রংশে 'কলিকাতা' হয়েছে। আর একটি প্রচলিত গল্প অনুসারে একজন ইংরেজ জনৈক ঘেষুড়েকে এই স্থানের নাম জিজ্ঞাসা করায় সে ব্যক্তি মনে করে যে 'কবে ঘাস কাটা হয়েছে' সাহেব বুঝি এই কথাই জিজ্ঞাসা করছে, এবং উত্তর দেয় 'কাল কাটা'। এই 'কালকাটা' থেকে 'ক্যালাকাটা' এবং তার বঙ্গানুবাদ 'কলিকাতা' হয়। কারও কারও মতে 'খালকাটা' থেকে 'ক্যালকাটা' এবং অপভ্রংশে 'কলিকাতা' হয়েছে। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে 'কলিকাতা' একটা খাঁটি বাংলা শব্দ, অর্থ 'কলি' বা কলিচুনের জন্য 'কাতা' বা শামুকপোড়া। কলির বা চুনের ও কলিচুনের জন্য শামুকের আড়ত এবং চুনের কারখানা থেকে 'কলি-কাতা' নাম হয়েছে।

হাওড়া জেলার দামোদরের তীরে অবস্থিত 'কলিকাতা' ছাড়া আরও একটা 'কলিকাতা' নামের সন্ধান পাওয়া যায় ঢাকা জেলায় (বর্তমানে বাংলাদেশে)।

নাম ‘কলিকাতা ভোগদিয়া’। কিন্তু ঢাকা জেলার কলিকাতায় চুনরি বা চুন তৈরির কোনও অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় না। হাওড়া জেলার কলিকাতায় বা রসপুর বা ছোট কলিকাতায় এখনও চুনরিদের বসবাস ও কলিচুন তৈরিও হয় বলে জানা যায়।

জানুয়ারি ১, ২০০১ থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভারত সরকারের ঐক্যমত নিয়ে কলিকাতার নাম পরিবর্তন করে ‘কলকাতা’ নাম প্রচলন করেন।

খাস ‘কলিকাতা’ বা ‘কলকাতা’ যে স্থানকে বোঝায় তিন শতাধিক বছর আগে তা সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর এই তিনটি ভিন্ন গ্রাম ছিল। বাগবাজারের খাল থেকে নিমতলা পর্যন্ত স্থান সুতানুটি, নিমতলা থেকে চাঁদপাল ঘাট পর্যন্ত স্থান কলিকাতা এবং চাঁদপাল ঘাট থেকে আদিগঙ্গা পর্যন্ত স্থান গোবিন্দপুর নামে পরিচিত ছিল। কলিকাতায় ইংরেজদের আসার আগে সুতানুটিতে সুতো বেচাকেনার একটা বড় হাট ছিল এবং আর্মেনীয় ও পর্তুগিজেরা এখানে ব্যবসা বাণিজ্য করতেন। কথিত আছে, গোবিন্দপুরের শেঠ ও বসাকেরা এই হাট বসিয়েছিলেন। শেঠ ও বসাকদের পূর্ব নিবাস ছিল হুগলিতে। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের জন্য তাঁরা হুগলি থেকে বাস উঠিয়ে গোবিন্দপুরে এসে বসবাস শুরু করেন। শেঠেদের গৃহদেবতা গোবিন্দজির নামানুসারে গ্রামের নাম রাখা হয় গোবিন্দপুর এরকম অনেকে মনে করেন। সুতো বিক্রির হাটই সুতানুটি নামে পরিচিত হয়। সুতানুটি থেকে জাহাজযোগে সহজে সমুদ্রাভিমুখে যাওয়ার সুবিধা থাকায় এবং ব্যবসায়ের পক্ষে উপযুক্ত স্থান বিবেচিত হওয়ার জন্য ২৪ আগস্ট ১৬৯০ জব চার্নক তাঁর সঙ্গীগণ সহ চারটি বাণিজ্য জাহাজে চেপে হুগলি পরিত্যাগ করে সুতানুটিতে আসেন এবং বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করেন। কথিত আছে, একসময় বর্তমান কলিকাতার ‘বরানগর’ নামক অঞ্চল ‘বাফতা’ শ্রেণির একপ্রকার কাপড়ের জন্য খ্যাত ছিল। সেই কাপড়ের ব্যাবসার সুযোগের দিকে লক্ষ্য রেখেই নাকি চার্নক হুগলি পরিত্যাগ করে এখানে বাণিজ্যকুঠি স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। বরানগর তখন ডাচদের অধীনে এক পৃথক জনপদ ছিল। ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে ডাচেরা বরানগরকে ইংরেজদের হাতে তুলে দেয়। শোনা যায় স্থানটি পূর্বে ‘বরাহনগর’ নামে পরিচিত ছিল। পরে অপভ্রংশে ‘বরানগর’ হয়।

এ যাবৎ ঐতিহাসিকগণ জব চার্নকের সুতানুটিতে পদার্পণের দিনটিকেই

মহানগরী কলিকাতার পত্তন দিবস বলে মেনে আসছিলেন। কিন্তু অকাট্য ঐতিহাসিক তথ্যাদি চার্নকের আগমনের আগে থেকেই 'কলকাতা' নামক স্থানের অস্তিত্ব সহজেই প্রমাণ করে। মহামান্য কলিকাতা উচ্চ ন্যায়ালয় তাঁদের ১৬ মে ২০০৪-এর ঐতিহাসিক রায়ে সেই সংশয়ের ওপর পূর্ণ বিরতি টেনে দিয়েছেন।

সুতানুটিতে বাণিজ্যকুঠি স্থাপনের পর জব চার্নক স্বয়ং সেই কুঠি এবং কুঠির এলাকাভুক্ত উপনিবেশের অধ্যক্ষ হন। কম্পানির এলাকায় যাতে লোকজন এসে বসবাস করে সেইজন্য তিনি অধিবাসীগণকে নানাপ্রকার সুবিধা দেন। সুতানুটিতে কুঠি স্থাপনের পর ইংরেজ কম্পানির ব্যাবসা ক্রমশ বিস্তার লাভ করে। ১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন বাংলার সুবেদার, আওরঙ্গজেবের পৌত্র (কারও মতে পুত্র).আজিম-উশ-শানের কাছ থেকে ইংরেজরা ১৬,০০০ টাকার বিনিময়ে সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর গ্রাম তিনটির মালিকানা স্বত্ব কিনে নেবার অধিকার লাভ করে (বর্ধমান দেখুন) এবং সেই বছরের ১০ নভেম্বর তারিখে মাত্র ১৩০০ টাকার বিনিময়ে স্থানগুলির তৎকালীন মালিক সবর্ণ রায়চৌধুরীদের কাছ থেকে এই গ্রাম তিনটি কিনে নেয়। এই তিনটি গ্রামের জন্য ইংরেজ কম্পানি মুঘল সরকারকে বার্ষিক ১২৮১$^{১}/_{২}$ টাকা খাজনা দিতে হত। এই গ্রাম তিনটির অধিকার লাভের পর কম্পানি দপ্তরের কাগজপত্রে 'ক্যালকাটা' বা 'কলিকাতা' নাম ব্যবহার করতে আরম্ভ করে। সুতানটি আর গোবিন্দপুর নাম ক্রমশ লুপ্ত হয়ে যায়।

'ক্যালকাটা' বা 'কলিকাতা' নামের প্রাধান্য সম্বন্ধে জনশ্রুতি এই যে, পর্তুগিজগণ 'কালিকট'[১]-এর দ্রব্যাদি ইউরোপে বহুমূল্যে বিক্রয় করত বলে ইংরেজ কম্পানিও 'কালিকট' নামের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত 'ক্যালকাটা' নাম নিজেদের সেরেস্তায় পত্তন করে। পলাশীর যুদ্ধের পর ভারতে ইংরেজ শাসনের গোড়াপত্তন হলে ১৭৭৪ থেকে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ৩১ মার্চ পর্যন্ত 'ক্যালকাটা' বা 'কলিকাতা' ইংরেজ ভারতের রাজধানী ছিল। ১ এপ্রিল ১৯১২ থেকে ভারতের রাজধানী দিল্লিতে স্থানান্তরিত হয়। 'কলিকাতা' বা বর্তমানে পরিবর্তিত 'কলকাতা' পশ্চিমবাংলার রাজধানী এবং পূর্ব ভারতের মেট্রোপলিটন শহর ও বন্দরনগরী।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন:

এই কলিকাতা কালিক্ষেত্র

কাহিনী ইহার সবার শ্রুত।
বিষ্ণুচক্র ঘুরেছে হেথায়,
মহেশের পদ ধূলে পূত ॥

প্রচলিত ছড়া:

আমার ভাই চাকরি করে
কইলকত্তার দালানে।
ম্যালা ট্যাহা কামাই করে
সোনা গাড়ে পালানে।
হেই সোনা আনামু।
তায় গয়না বানামু

* * *

কলকাতার মাথাঘষা,
খিদিরপুরের চিরুনি।
নোটন-খোঁপা বেঁধে দেব,
বেলফুলের গাঁথুনি ॥

* * *

কলকাতার ছিস্টি, গুড়ে নেই মিষ্টি।
তেঁতুলে নেই টক, কলকাতার ঢপ ॥

* * *

কলকাতা বলে কথা,
আগে বেরোয় হাত-পা,
শেষে বেরোয় মাথা ॥

* * *

রাঁড়, ভাঁড়, মিছে কথা।
এ তিন নিয়ে কলকাতা ॥

* * *

মিথ্যেকথার কিবা কেতা।
আজব শহর কলকাতা।
রেতে মশা, দিনে মাছি।
এই নিয়ে কলকাতায় আছি ॥

* * *

উলোর মেয়ের কলকলানি
শান্তিপুরের খোঁপা।
নদের মেয়ের নথনাড়া
কলিকাতার চোপা ॥

কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলের ওপর প্রচলিত ছড়া:
এন্টালি—

ভুঁড়ি, ভড়ং, বুলি,
তিন নিয়ে ইটালী ॥

কালীঘাট—

কালির অক্ষর নাই গো পেটে।
চণ্ডী পড়েন কালীঘাটে ॥

* * *

কাক, কাঙ্গালী, ভাট।
তিন নিয়ে কালীঘাট ॥

* * *

লঘুগতি সদাগর পাইল কালীঘাট,
দুই কূলে জপতপ যাত্রিকার ঠাট ॥
(চণ্ডীমঙ্গল কাব্য)

* * *

কুমারটুলি-

রং, মাটি তুলি,
তিনে কুমারটুলি ॥

খিদিরপুর—

জাহাজ, কুলি, চিটেগুড়,
এ তিন নিয়ে খিদিরপুর ॥

চেতলা—

আশীর্বাদ করি মাথার কাটে,
মেগে খাও গে চেতলার হাটে ॥

* * *

চাল, চিঁড়ে, ঝ্যাঁতলা
তিন নিয়ে চেতলা ॥
(ঝ্যাঁতলা = মাদুর)

বরানগর—

বরানগর রসের সাগর।
এক-এক ঘরে তিন তিন নাগর ॥

বাগবাজার—

বাগবাজারের রসগোল্লা
মোল্লার চকের দই।
জনাই-এর মনোহরা,
যশোরের কই ॥

* * *

ময়রা মুদি, কলাকার,
এ তিন নিয়ে বাগবাজার ॥

বেলেঘাটা-

যার নেই পুঁজিপাটা।
সে যায় বেলেঘাটা ॥

বেহালা—

মশা, মাছি, ময়লা,
এ তিন নিয়ে ব্যায়লা।

খানা, খন্দ, হোগলা,
এ তিন নিয়ে বেহালা ॥

সরশুনা—

গাঁজা, তাড়ি, প্রবঞ্চনা,
এ তিন নিয়ে সরশুনা ॥

কসবা নারায়ণগড়: প মেদিনীপুর

আনুমানিক ৭০৩ বঙ্গাব্দে রাজা নারায়ণবল্লভ তাঁর পিতা রাজা গন্ধর্বের মৃত্যুর পর এই অঞ্চলের রাজ্যাধিপতি হন। তিনি নিজের নামানুসারে স্থানটির নাম নারায়ণগড় রাখেন। আদি রাজা গন্ধর্ব পাল ওড়িশার গঙ্গাবংশীয় রাজাদের অধীনে এই অঞ্চলে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।

কসবা মহেশো: উ দিনাজপুর

পূর্বনাম মহেশ্বরবাড়ি বা মহেশবাটী। কথিত আছে, গ্রামস্থিত মসজিদই পূর্বে গ্রামদেবতা মহেশ্বরের মন্দির ছিল। সেই থেকে স্থাননাম হয় মহেশ্বরবাড়ি। আনুমানিক চতুর্দশ শতকে এই স্থানটি রাজা গণেশের রাজধানী ছিল। রাজা গণেশের পিতা মহেশনারায়ণের নামানুসারে স্থানের নাম মহেশবাড়ি বা মহেশবাটী হয়েছিল বলে অনেকে অনুমান করেন। জনশ্রুতি এই যে, রাজা গণেশ কিছুকাল স্বাধীনভাবে রাজত্ব করার পর তিনি বিহারের মুসলমান শাসনকর্তা কর্তৃক আক্রান্ত হন। কয়েকদিন যুদ্ধ করার পর সন্ধি করতে বাধ্য হলে সন্ধির শর্তানুযায়ী রাজা গণেশের জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে হয়। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর যদু জালালুদ্দিন নামধারণ করেন। কথিত আছে, যদু বা জালালুদ্দিনই মহেশ্বরের মন্দির ভেঙে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করান। স্থানীয় মুসলমান জনগণের মতে গণেশ ও মহেশ একই ব্যক্তি ছিলেন এবং তারা গণেশকেই মহেশ নামে অভিহিত করত। এবং সেই একই কারণে তারা স্থানটিকে কসবা মহেশো নামে উল্লেখ করে। কালক্রমে স্থানটি কসবা মহেশো নামেই পরিচিত হয়। পার্শ্ববর্তী কমলাবাড়ির নাম রাজা গণেশের পত্নী কমলাদেবীর নামানুসারে হয়েছে বলে অনুমিত।

কাঁকোড়া: বর্ধমান

নবাব আলিবর্দি খাঁর আমল পর্যন্ত এই স্থানের নাম ছিল কঙ্কণনগর। পরে বর্গির আক্রমণে স্থানটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়। পুনর্গঠিত স্থাননাম হয় কর্কটনগর, যা পরে অপভ্রংশে কাঁকোড়া হয়েছে।

কাঁচড়াপাড়া: উ চব্বিশ পরগনা

পূর্বনাম কাঞ্চনপল্লী। অপভ্রংশে কাঁচড়াপাড়া। কেউ কেউ মনে করেন অনেকদিন আগে এই জায়গার নাম ছিল নবহট্টগ্রাম এবং এখান থেকেই বৈদ্যদের নবহট্টীয় সমাজের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু নবহট্টগ্রাম থেকে কাঞ্চনপল্লী বা কাঁচড়াপাড়া নাম বিবর্তনের কোনও যোগসূত্র পাওয়া যায় না। কথিত আছে, পূর্বখ্যাত আদি কাঞ্চনপল্লী গঙ্গাবক্ষে বিলীন হয়ে গেছে। বর্তমান কাঞ্চনপল্লী বা কাঁচড়াপাড়া গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে চরভূমির ওপর স্থাপিত। বৈষ্ণব সাহিত্যে এই স্থান 'সেন শিবানন্দের পাট' নামে উল্লিখিত আছে। শিবানন্দ শ্রীচৈতন্যদেবের বিশেষ অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। চব্বিশ পরগনা: গেজেটিয়ারে কাঁচড়াপাড়ার অন্য এক নাম 'বীজপুর'-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। গেজেটিয়ারের মতে এই স্থানে একটি ডাকাইতি কালী মন্দির ছিল এবং ডাকাতেরা দেবীর আশীর্বাদ লাভ করার জন্য সেই মন্দিরে নরবলি দিত।

কাঁথি: পূ মেদিনীপুর

পূর্বনাম 'কেণ্ডোয়া' বা 'কেণ্ডুয়া'। ইংরেজ বণিকদের পুরনো কাগজপত্রে এবং সেই সময়কার মানচিত্রে 'কেণ্ডোয়া' নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। ডাচ বণিকদের নথিপত্রেও 'কেণ্ডুয়া' নামক স্থানে তাদের চাল ও অন্যান্য দ্রব্যাদির ব্যবসায়ের কেন্দ্র ছিল বলে বর্ণনা আছে। 'কেণ্ডোয়া' বা 'কেণ্ডুয়া' থেকেই 'কাঁথি' বা ইংরেজিতে 'কন্টাই' নাম হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। কারও কারও মতে এই স্থানটি বালিয়াড়ি বা উঁচু বালির স্তূপের ওপর অবস্থিত ছিল। বালিয়াড়ি বা বালির 'কাঁথি' থেকে কাঁথি নামকরণ হয়েছে। সেই কারণে হয়তো এই স্থানের চলতি নাম 'বেলদা'।

প্রচলিত ছড়া:

বালি, বালিকা, বাদাম।
তিনে কাঁথির সুনাম ॥

কাঁদড়া: বর্ধমান

প্রায় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে মুর্শিদাবাদ জেলার এক চট্টোপাধ্যায়-পরিবারের ধর্মপ্রাণ জনৈক মঙ্গলঠাকুর এই স্থানে এসে আস্তানা গড়েন এবং রাধাবল্লভজির মূর্তি স্থাপন করে সাধনভজন করে দিন কাটাতেন। শ্রীচৈতন্যদেব রাঢ়দেশ পরিক্রমা করার সময় একবার মঙ্গলঠাকুরের আতিথ্যগ্রহণ করেছিলেন। শ্রীচৈতন্যের কৃপাধন্য মঙ্গলঠাকুরের কাছে তখন থেকেই দূরদূরান্ত থেকে ভক্তদল শিষ্যত্ব নিতে আসে। কথিত আছে, মঙ্গলঠাকুর ভক্তের কান ধরে তাঁদের দীক্ষা দিতেন বলে ক্রমে স্থানের নাম হয় 'কানধরা'। 'কানধরা' ক্রমে 'কান্দারা' এবং পরে 'কাঁদড়া' হয়। অন্য মতে, মঙ্গলঠাকুর এই স্থানে এসে একটা 'কাঁদড়'-এর কাছে কুঠি নির্মাণ করেছিলেন। কোনও বড় নদী থেকে যেসব সরু সরু খাল বার হয়ে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করে স্থানীয় ভাষায় তাকে 'কাঁদড়' বলে। মঙ্গলঠাকুরের কুটিরের আশেপাশে ক্রমে জনবসতি গড়ে স্থানটি 'কাঁদড়' এবং পরে অপভ্রংশে কাঁদড়া হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।

কাকটিয়া: বাঁকুড়া

লোকমুখে কাফ্‌টে নামে কথিত।

প্রচলিত ছড়া:

কাক, কাঁকড়, কাঁটা নটে।
তিন নিয়ে কাক্‌টে।

কাটোয়া: বর্ধমান

ভাগীরথী ও অজয় নদের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত এই স্থানের পূর্বনাম ছিল 'কণ্টকনগর' বা 'কাঁটাদ্বীপ'। বৈষ্ণব সাহিত্যে কণ্টকনগর নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু বর্ধমান গেজেটিয়ারের মতে, দুই ক্ষিপ্রগতি নদীর মধ্যবর্তী স্থলে অবস্থিত ব-দ্বীপাকার এই স্থানের নাম ছিল 'কাট' বা 'কাঁটাদ্বীপ', যার অপভ্রংশ 'কাটোয়া' হয়েছে। অন্য মতে 'কাঁটাদিয়া' যা সম্ভবত কাঁটাদ্বীপের অপভ্রংশ, থেকে 'কাটোয়া' নাম হয়েছে। জনশ্রুতি এই যে, এই স্থানে বিশ্বম্ভর মিশ্র ওরফে নিমাই গুরু কেশবভারতীর কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে যৌবনেই সংসারী হয়েও গৃহত্যাগী হলে, জননী এই স্থানকে কণ্টকনগরী বলে অভিহিত করেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর গুরু কেশবভারতী বিশ্বম্ভরের নাম দিলেন

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। সংক্ষেপে শ্রীচৈতন্য নামে তিনি সমগ্র বাংলা এবং ভারতের পূর্বাঞ্চলে ভক্তিমার্গের এক নতুন অধ্যায় রচনা করেন। কথিত আছে, সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীচৈতন্য মাত্র একরাত্রি কাটোয়ায় বাস করেন।

কানামুড়ী: প মেদিনীপুর
স্থানটি 'খানামুড়ী' নামেও পরিচিত। অর্থ, শুকনো 'খানা' বা ক্ষুদ্র জলাশয়। এই নামের উল্লেখ Tipperah Grant of Loke Natha, 7th Century as Kana Motika 'কানা মোটিকা' নাম পাওয়া যায়। কানা মোটিকার অপভ্রংশে 'কানামুড়ী' স্থাননাম হয়েছে বলে অনুমিত।

কানিবামনী: নদিয়া
একমতে, স্থানীয় কোনও অন্ধ ব্রাহ্মণীর নামে স্থাননাম। অন্য মতে, কানিবামনী নামে পরিচিত স্থানীয় দেবী মনসার নামে স্থাননাম।

কামদেবপুর: নদিয়া/উ চব্বিশ পরগনা/দ চব্বিশ পরগনা
একই নামে তিনটি জেলায় তিনটি স্থান। সব ক্ষেত্রেই কামদেব নামক ব্যক্তির দ্বারা স্থাপিত স্থাননাম। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কামদেবপুর সম্বন্ধে জানা যায় যে কথিত কামদেব মেদিনীপুর নিবাসী এবং তিনি এইস্থানে বঙ্গাব্দ ১৩২৯-এ আসেন এবং এই স্থানের জঙ্গল পরিষ্কার করে বসবাসের উপযোগী করে তোলেন বলেই তাঁর নামানুসারে স্থাননাম কামদেবপুর হয়।
হুগলি জেলাতেও কামদেবপুর নামে স্থান আছে।

কামারপুকুর: হুগলি
কামার সম্প্রদায় দ্বারা খনন করা পুকুরের প্রসিদ্ধি থেকে এইরকম স্থাননাম। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের জন্মস্থানরূপে স্থানটি সমধিক প্রসিদ্ধ। বর্তমানে তীর্থভূমি।

কামালপুর: নদিয়া
পূর্বনাম জীতারপুর। কথিত আছে, কৃষকপ্রধান এই গ্রামে কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এসে বসবাস করেন। আগত ব্রাহ্মণদের মধ্যে কমলাকান্ত

ভট্টাচার্য নামে এক ব্রাহ্মণ মুসলমান ধর্মগ্রহণ করে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী হন। তাঁর মুসলমানি নামানুসারে স্থানের নাম হয় কামালপুর। কিছু সময় এই স্থানটিকে 'ভট্টাচার্য-কামালপুর' নামেও অভিহিত করা হত। অন্য মতে, কালিন্দি সর্দার নামে একজন কার্তারী এই গ্রামের নাম কামালপুর রাখেন।

কার্শিয়াং: দার্জিলিং

মূল লেপচা শব্দ 'করসন রিপ' (Kurson-rip) থেকে উদ্ভূত নাম। 'করসন' অর্থে সাদা অর্কিড এবং 'রিপ' অর্থে স্থান। অর্থাৎ সাদা অর্কিডের স্থান। কথিত আছে, একসময় এই অঞ্চলে প্রচুর সাদা অর্কিডের বাগান ছিল। অন্য মতে, লেপচা শব্দ 'কুর' এবং 'সেয়ং' থেকে স্থাননাম কার্শিয়াং হয়েছে। 'কুর' অর্থে একপ্রকার স্থানীয় বেত এবং 'সেয়ং' অর্থে 'ছড়' বা 'ঝাড়'। শোনা যায়, বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে এই অঞ্চলে এইপ্রকার বেতের ঝাড় প্রচুর দেখা যেত। আদিতে সিকিম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত এই অঞ্চলটি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে নেপাল রাজ্যের অধিকারে আসে। ১৮১৭-এর গোর্খা যুদ্ধের পর ইংরেজ সরকার এই অঞ্চলটি পুনরুদ্ধার করে সিকিম রাজ্যকে ফিরিয়ে দেয়। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে এক সন্ধিচুক্তি অনুসারে সিকিমরাজ এই পার্বত্য এলাকা ইংরেজ সরকারের হাতে তুলে দেয়। তখন থেকে কার্শিয়াং সহ সমগ্র পাঙ্খাবাড়ি অঞ্চল ইংরেজ সরকারের অধীনে দার্জিলিং জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮৮০-তে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলপথ কার্শিয়াং পর্যন্ত বিস্তৃত হলে, এই পাহাড়ি গ্রাম ক্রমে একটি বিশিষ্ট পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত হয়।

কালনা: বর্ধমান

স্থানটি অম্বিকা কালনা নামেও পরিচিত। অনেকে মনে করেন, অম্বিকা জৈনধর্মীদের উপাস্যাদেবী। বাংলায় অম্বিকা মা দুর্গাজ্ঞানে পূজিতা।

কালিম্পং: দার্জিলিং

মূল তিব্বতি থেকে উদ্ভূত নাম। কালন + পং; অর্থ, রাজমন্ত্রীদের জন্য সুরক্ষিত স্থান। পূর্বে এই স্থানটি ডালিংকোট নামে ভুটান রাজ্যের অধীন ছিল। অন্য মতে কালিম্পং অর্থে মিলন স্থান। ভারতের সীমান্তবর্তী এই অঞ্চলে

নেপালি, ভুটিয়া, সিকিম, তিব্বতি প্রভৃতি জাতির মিলন হয়েছে বলে এই স্থানটিকে 'মিলনস্থান' বা কালিম্পং বলা হয়। কথিত আছে, এইস্থানে একদা অসংখ্য আখরোট বাগান ছিল বলে লেপচারা এই স্থানকে কলকুণ্ড অর্থাৎ লেপচা ভাষায় 'আখরোট কুণ্ডু' বলে অভিহিত করত।

কালীগঞ্জ: নদিয়া

একদা জীবননগর ও বেড়ী পলতা নামে পরিচিত স্থানদুটি কলকাতা নিবাসী কালীপ্রসন্ন ঘোষের জমিদারির অধিকারে আসার পর ওই স্থানদুটির নাম পরিবর্তন করে 'কালীগঞ্জ' করা হয়।

কালুদিয়ার: মুর্শিদাবাদ

কালু + দিয়ার। 'দিয়ার' অর্থে নদীর গতি পরিবর্তনের জন্য পাড় সংলগ্ন নতুন জমি বা উত্থিত চর বোঝায়। কালু নামক কোনও ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা সেইরূপ কোনও 'দিয়ার'-এ জনবসতি সূচনা করায় 'কালুদিয়ার' স্থাননাম হয়েছে বলে অনুমান করা হয়।

কাশিমবাজার: মুর্শিদাবাদ

কোনও এক সময়ে স্থানটি 'কালকাপুর' নামে পরিচিত ছিল বলে জানা যায়। কথিত আছে, জঙ্গিপুরের প্রাচীন মসজিদের নির্মাতা সৈয়দ কাশিমের নামানুসারে এই স্থানের নাম কাশিমবাজার হয়েছে। মুর্শিদাবাদের অভ্যুদয়ের আগে থেকেই কাশিমবাজার বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এখানে নিকটবর্তী স্থানে তখন রেশমের বিস্তৃত কারবার ছিল। বস্তুত একসময় প্রখ্যাত মুর্শিদাবাদ রেশম শিল্পের প্রধান কেন্দ্র কাশিমবাজারেই ছিল। সেই সময় ভাগীরথী কাশিমবাজারের পাশ দিয়ে বহতা ছিল এবং এই ভাগীরথীর বাঁকের ওপর ইংরেজ, ওলন্দাজ, আর্মেনীয় ও ফরাসিদের বাণিজ্যকুঠি অবস্থিত ছিল। পদ্মা, ভাগীরথী ও জলঙ্গির মধ্যবর্তী এই ভূখণ্ড তখন কাশিমবাজার দ্বীপ (Cossimbazar Island) নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে এই স্থানের ইংরেজকুঠিতে জব চার্নক বাৎসরিক ২০ পাউন্ড অর্থাৎ তখনকার প্রায় ৩০০ টাকা বেতনে একজন সরকারি অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজদের সঙ্গে বিবাদ উপস্থিত হলে নবাব সিরাজউদ্দৌলা

কাশিমবাজার কুঠি আক্রমণ করেন। সেই সময় ওয়াটস কুঠি রেসিডেন্ট এবং ওয়ারেন হেস্টিংস কুঠির একজন সামান্য কর্মচারী ছিলেন। ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে একটি খাল কেটে ভাগীরথীর প্রধান বাঁকের দুই প্রান্ত যুক্ত করে দেওয়ার ফলে সেই খাল দিয়েই নদীর প্রবাহ চলতে আরম্ভ করে এবং বড় বাঁক একটি বদ্ধ জলাশয়ে পরিণত হয়। এই কারণে ক্রমে প্রধান বাঁকের ওপর অবস্থিত ইউরোপীয় বাণিজ্যকুঠিগুলি ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং স্থানটির ব্যবসায়িক প্রাধান্য অবলুপ্তির পথে চলে যায়। কালক্রমে ভাগীরথীর ভৌগোলিক বিকৃতিকরণের জন্য এই স্থানটি মহামারীর কবলে পড়ে এবং একদা স্বাস্থ্যনিবাস (health resort) বলে খ্যাত কাশিমবাজার একটি পরিত্যক্ত স্থানে পরিণত হয়।

কাশিমবাজারের পুরনো ঐতিহ্যের সঙ্গে কাশিমবাজারের রাজার রোমাঞ্চকর ইতিহাসও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বর্ধমান জেলার শীজলা গ্রামের কালী নন্দী নামক এক ব্যক্তি কাশিমবাজারের কাছে শ্রীপুর গ্রামে এসে একটি ছোটখাটো রেশম বেচাকেনার ব্যাবসা আরম্ভ করেন। কৃষ্ণকান্ত নন্দী বা তৎকালীন 'কান্তবাবু' নামে খ্যাত, কালী নন্দীর প্রপৌত্র ওয়ারেন হেস্টিংসের সঙ্গে আনুষঙ্গিক অন্তরঙ্গতার ফলে প্রভূত ধনদৌলতের অধিকারী হন। যৌবনে কৃষ্ণকান্ত তাঁর পিতার রেশম, সুপুরি ও ঘুড়ির ব্যাবসা দেখাশোনা করা ছাড়া স্থানীয় মহলে পারদর্শী ঘুড়ি ওড়ানোর 'খলিফা' নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি বাংলা, ফারসি ছাড়া কিছু কিছু ইংরেজিও জানতেন। সেই সুবাদে সামান্য শিক্ষানবিশ হিসাবে ইংরেজ কুঠিতে তাঁর প্রবেশ এবং পরে পাকাপাকিভাবে কেরানির পদে নিযুক্ত হন। ১৭৫৩-তে ওয়ারেন হেস্টিংস মুর্শিদাবাদে আসেন এবং তার বছর তিনেক পরে এই অজ্ঞাতকুলশীল যুবক ভারতের ভবিষ্যৎ গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পান। কথিত আছে, ওয়ারেন হেস্টিংস সিরাজউদ্দৌলা কর্তৃক মুর্শিদাবাদে বন্দি অবস্থায় থাকার সময় কোনওক্রমে পালিয়ে এসে কাশিমবাজারে আশ্রয়ের সন্ধানে আসেন। নবাবের সৈন্যের ভয়ে যখন কেউই তাঁকে আশ্রয় দেয় না তখন কান্তবাবু নিজ বিপদ উপেক্ষা করে তাঁকে নিজের দোকানে আশ্রয় দেন। নবাবের সৈন্যরা হেস্টিংসকে খুঁজে না পেয়ে চলে গেলে, কান্তবাবু তাঁর পলায়নের ব্যবস্থা করে দেন। শোনা যায়, গোপনীয়তার জন্য কান্তবাবু ওয়ারেন হেস্টিংসের উপযোগী খাবারের আয়োজন করতে না পারায় কেবল মাত্র পান্তাভাত ও চিংড়ি

মাছ দিয়েই অতিথি সৎকার করতে হয়েছিল। উত্তরকালে হেস্টিংস যখন ভাগ্য পরিবর্তনের ফলে ভারতের ভাগ্যবিধাতা হন, তখন পূর্বকৃত উপকারের কথা স্মরণ করে তিনি কান্তবাবুকে উচ্চ রাজকর্মে নিযুক্ত করেন এবং বহু ভূসম্পত্তি প্রদান করেন। ওয়ারেন হেস্টিংস যখন কাশীতে চেতসিংহের প্রাসাদ আক্রমণ করেন তখন কান্তবাবু তাঁর সঙ্গে ছিলেন। কথিত আছে, তিনি হেস্টিংসের সৈন্যদের অত্যাচার থেকে প্রাসাদের মহিলাদের রক্ষা করবার জন্য বিশেষভাবে অগ্রণী হয়েছিলেন যার জন্য তিনি কাশীর রাজমাতার কাছ থেকে বহুমূল্য নানারকম উপহার ও অলংকারাদি পেয়েছিলেন। কাশী থেকে প্রত্যাবর্তনের পর হেস্টিংস কান্তবাবুকে গাজিপুর ও আজিমগঞ্জের জাগিরদারি প্রদান করেন এবং তাঁর পুত্র ও উত্তরাধিকারী লোকনাথের জন্য তৎকালীন বাংলার নবাব নাজিমের কাছ থেকে 'মহারাজ বাহাদুর' উপাধির ব্যবস্থা করে দেন। লোকনাথের পুত্র ও উত্তরাধিকারী হরিনাথ ভাইসরয় লর্ড আমহার্স্ট দ্বারা 'রাজা বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত হন। কাশিমবাজারের রাজবংশের রাজা কৃষ্ণনাথের পত্নী দানশীলা মহারানি স্বর্ণময়ী ও অশেষ গুণমণ্ডিত দানবীর মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর নাম বাংলাদেশে প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে আছে।

কাশীপুর: মুর্শিদাবাদ

নবাবি আমলে কাশীরাম নামে নবাবের এক কর্মচারী এই স্থানে পদ্মার বালুচরে বসতি স্থাপন করে এই গ্রাম পত্তন করেন। কাশীরামের নামানুসারেই স্থাননাম কাশীপুর হয়েছে বলে অনুমিত।

কীর্ণহার: বীরভূম

প্রচলিত ছড়া:

বোলপুরের ধুলো
নানুরের মুলো,
কীর্ণহারের তুলো।

কীর্তনখোলা: দ চব্বিশ পরগনা

কীর্তন গানের খ্যাতির জন্য সম্ভবত এই স্থানের নাম হয়েছে। এই নামে জেলায় দুটি স্থান আছে।

কুইলাপাল: মুর্শিদাবাদ

প্রচলিত ছড়া:

বারোনদী তেরো খাল,
তবে পাবি কুইলাপাল ॥

কুকটি কাটা: কুচবিহার

কুকটি = কুক্কুট, অর্থ— মোরগ। মোরগ কাটা বা বলিদান করার স্থানসূচক নাম।

কুকুরমুড়ী: প মেদিনীপুর

সংস্কৃত শব্দ 'কুক্কুড়' থেকে উদ্ভূত নাম। স্থাননাম 'কুক্কুড়' শব্দের উল্লেখ Inscription of the time of Jaya-naga of Karna Suvarna, 6th-7th century-তে পাওয়া যায়।

কুচবিহার: কোচবিহার

কুচবিহার জেলার প্রধান প্রশাসনিক শহর কুচবিহার একদা পূর্বকালীন কোচবিহার রাজ্যের রাজধানী ছিল। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কোচবিহার এক সম্পূর্ণ স্বাধীন রাজ্য ছিল। ওই সালে এক সন্ধিশর্ত অনুযায়ী কোচবিহার রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ইংরেজ সরকারের ওপর অর্পিত হয় এবং পরিশেষে কোচবিহার রাজ্যটি ইংরেজের অধীনে এক করদ মিত্ররাজ্যে পরিণত হয়। 'বিশ্বকোষ'-এর মতে আদিতে এই অঞ্চল 'বিহার' নামে অভিহিত হত। পরে কোচরাজা লক্ষ্মীনারায়ণের সময় থেকে মুসলমান শাসিত সংলগ্ন 'বিহার' প্রদেশের সঙ্গে এই রাজ্যের নামের ভ্রান্তির আশঙ্কায় ও পার্থক্য বোঝাবার জন্য 'কোচবিহার' নামকরণ করা হয়। কোচবিহার বা অপভ্রংশে কুচবিহার নামকরণের সম্বন্ধে নানারকম মত আছে। স্থানীয় লোকেদের বিশ্বাস শিব এবং শিবজায়া পার্বতী উভয়েই কোচ জাতীয় ছিলেন এবং এই অঞ্চল শিবের অতি প্রিয় 'বিহার'ক্ষেত্র বলে এই অঞ্চলের নাম কোচবিহার হয়েছে। সম্ভবত সেইসূত্রে এই অঞ্চল প্রাচীন গ্রন্থে 'কোচ বধূপুর' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য এক মতে, 'কোচদের 'বিহার'ক্ষেত্র বা বাসস্থান থেকে কোচবিহার নামের উৎপত্তি হয়েছে। 'কোচ' নামের উৎপত্তির পেছনেও অনেক কিংবদন্তি আছে। কথিত আছে, পরশুরামের ভয়ে যেসব ক্ষত্রিয়

ভগবতীর 'ক্রোড়ে' বা 'কোচে' আশ্রয় নেন তাঁরা পরে কোচ নামে পরিচিত হন। অনেকে মনে করেন ভীত ক্ষত্রিয়কুল 'সংকুচিত' হয়ে যাবার ফলে 'সংকোচ' বা 'কোচ' আখ্যা পান। অন্য এক মতে, সঙ্কোষ নদের তীরবর্তী হওয়ায় এই দেশের নাম হয়েছে 'কোষ', যা অপভ্রংশের 'কোচ'। আরও এক মতে, 'কুবচ' বা 'কুবাচক' মন্দ বা খারাপ ভাষাভাষী থেকে 'কোচ' শব্দের ব্যুৎপত্তি হয়েছে। 'কমোচ' বা 'কবোঁচ' অথবা 'কোচক' শব্দ থেকেও 'কোচ' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। 'কোচক' দেশে 'কোচ' অধিবাসীদের উল্লেখ ধ্রুবানন্দ মিশ্রের 'কুলকারিকা'য় পাওয়া যায়।

প্রচলিত ছড়া:

বলরামপুরের বাঁশ
কোচবিহারের রাস ॥

কুড়চা: বর্ধমান

পূর্বনাম 'ক্রোড়াঞ্চি', অপভ্রংশে কুড়চা। ক্রোড়াঞ্চি স্থাননামের উল্লেখ Amagachi Grant of Vigraha-Pala, second half of 11th century-তে পাওয়া যায়।

কুড়মুন পলাশী: বর্ধমান

প্রচলিত ছড়া:

দাঁতে মিসি, কাপড় বাসি
বাড়ি কোথা? না, কুড়মুন পলাশী ॥

কুমারগ্রাম: জলপাইগুড়ি

পূর্বনাম কোঙ্গার গাঁ, অপভ্রংশে কুমারগ্রাম। কথিত আছে, কোনও একসময়ে এই স্থানে হংসদেব কোঙ্গার নামে কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তি বাস করতেন। সেই থেকে স্থানের নাম হয় কোঙ্গার গাঁ, যা পরে অপভ্রংশে কুমারগ্রাম হয়।

কুমারজোল: উ চব্বিশ পরগনা

কোনও জলাভূমি বা জলমগ্ন ভূমির কাছে কুমার অর্থাৎ কুম্ভকার সম্প্রদায়ের জনবসতি সূচক নাম।

প্রচলিত ছড়া:

যে যায় কুমারজোল,
সে ছাড়ে মায়ের কোল ॥

কুমারপুর: হাওড়া

কথিত আছে, গৌড়েশ্বরের বিশিষ্ট কুমার বা কুম্ভকার সম্প্রদায় এই স্থানে বসবাস করত বলে এই স্থানের নাম হয় কুমারপুর।

কুমারহট্ট: উ চব্বিশ পরগনা

স্থানটি হালিশহর কুমারহট্ট নামেও পরিচিত। কথিত আছে, একসময় এই স্থানটি লক্ষ্মণসেনের রাজধানী বিজয়পুর নামে খ্যাত ছিল। মুসলমান আমলে স্থানটি 'হাবেলিশহর' নামে পরিচিত হয়, সম্ভবত যা পরে অপভ্রংশে হালিশহর হয়ে থাকবে। কুমারহট্ট বা হাবেলিশহর সমসাময়িক নাম। হাবেলিশহর সম্ভবত প্রাচীনতম। কুমারহট্ট নামকরণ সম্পর্কে নানা কিংবদন্তি শোনা যায়। কারও কারও মতে 'কুমার' অর্থে টোলের ছাত্র এবং এই স্থানের টোলের কুমারদের একযোগে পাঠাভ্যাসের উচ্চ কলরবে বা হট্টগোলে গ্রাম মুখরিত থাকত বলে গ্রামের নাম হয় কুমারহট্ট। প্রাচীনকালে এই স্থানে অনেকগুলি সংস্কৃত টোল ছিল বলে জানা যায় এবং দেশ-বিদেশ থেকে বহু ছাত্র সেইসব টোলে বিদ্যাচর্চা করতে আসতেন। কথিত আছে, সংস্কৃত শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারে কুমারহট্টের টোলগুলি নবদ্বীপের শাস্ত্রশিক্ষা কেন্দ্রগুলির সমকক্ষ ছিল। কেউ কেউ বলেন, এই স্থানের কুম্ভকারদের তৈরি মাটির হাঁড়ি কলসির বিশেষ খ্যাতি ছিল। গঙ্গার ধারে হাঁড়ি কলসির হাট বসত বলে স্থানের নাম হয় কুমারহাট বা কুমারহট্ট। মতান্তরে, যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যের পুত্র কুমার উদয়াদিত্য সপরিবারে বিভিন্ন স্নানযোগের সময় এই স্থানে গঙ্গা স্নান করতে আসতেন। তাঁদের আগমন উপলক্ষে গঙ্গার ধারে অস্থায়ী দোকানপাট বা হাট বসত বলে, অনেকে অনুমান করেন 'কুমার'-এর সম্মানে বসা হাট থেকে স্থাননাম হয় কুমারহট্ট। আরও এক মতে এই অঞ্চলের কুমার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি একবার নবদ্বীপের এক পণ্ডিতের দলকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করার পর থেকে স্থানের নাম হয় কুমারহট্ট।

কুমিরদহ: মুর্শিদাবাদ
অতীতে স্থানটি ভাগীরথীর চরাভূমি ছিল। ভাগীরথী দূরে সরে গেলে এই স্থানের আশেপাশে অনেকগুলি দহ বা জলাশয় সৃষ্টি হয়। কিংবদন্তি আছে যে, এই নির্জন চরাভূমির জঙ্গলের মধ্যে একজন ধর্মপ্রাণ ব্রাহ্মণ বাস করতেন। কথিত আছে, চাঁদ সওদাগর একবার এই পথে স্বদেশে ফিরছিলেন। যখন তিনি ভাগীরথীর এক দহের কাছে পৌঁছলেন তখন সন্ধ্যা হয়ে আসে। সেইসময় সেই ব্রাহ্মণ নিজের কুটিরে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বেলে শঙ্খ বাজাচ্ছিলেন। এই নির্জন স্থানে শঙ্খধ্বনি শুনে চাঁদ সওদাগর বিস্মিত হন। রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য তিনি তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলে প্রবেশ করেন এবং একটু খোঁজাখুঁজির পর সেই অরণ্যবাসী ব্রাহ্মণের দেখা পান। বিস্মিত ব্রাহ্মণ দৈবাৎ আগত অতিথিদের যথোপযুক্ত আপ্যায়ন করেন। ব্রাহ্মণের আতিথেয়তায় সন্তুষ্ট হয়ে সওদাগর ব্রাহ্মণকে কিছু দান করতে চাইলে ব্রাহ্মণ তাঁকে এই চরায় একটা গ্রামপত্তন করতে অনুরোধ করেন। সওদাগর সেইরূপ ব্যবস্থা করার পর ক্রমে আশেপাশের জনপদ থেকে লোকজন এসে এই চরায় বসবাস আরম্ভ করে এবং পরবর্তীকালে এই গ্রামের উৎপত্তি হয়। গ্রামের নামকরণ সম্বন্ধে কথিত আছে, এই 'চরাভূমির' আশেপাশের দহ থেকে বহু কুমির চরায় উঠে এসে রোদ পোয়াত বলে ভাগীরথীর পথে যাতায়াতকারী বণিকেরা এই স্থানটিকে 'কুমিরদহ' নামে চিহ্নিত করে রেখেছিল। উত্তরকালে এখানে জনবসতি গড়ে উঠলে গ্রামটি 'কুমিরদহ' নামে পরিচিত হয়।

কুলী: মুর্শিদাবাদ
কথিত আছে, একসময় এই গ্রামের পশ্চিমে কলিঙ্গ নামে এক সমৃদ্ধশালী নগর ছিল। শ্রীমন্ত সওদাগরের উপাখ্যানে সেই নগরের উল্লেখ পাওয়া যায়। কোনও কারণে ওই নগরটি ধ্বংস হয়ে যায়। সেই পরিত্যক্ত নগরের পাশে এই গ্রাম গড়ে উঠলে এই স্থানের নাম হয় কুলী। সম্ভবত কলিঙ্গের 'কলি' থেকে কুলী অথবা কুল = আবাস থেকে চলিত কথায় কুলী হয়েছে।

কুলীন গ্রাম: বর্ধমান
কুলীনদের বসতি সূচক স্থাননাম।

প্রচলিত ছড়া:

দত্তপাড়া মদের হাঁড়া
কুলীন গ্রাম লক্ষ্মীছাড়া ॥

* * *

কোলে, বেলে, খাঁ,
তিনে কুলীন গাঁ ॥

কুশদহ: নদিয়া
কুশ-তৃণ পরিবেষ্টিত 'দহ' সূচক স্থাননাম।

প্রচলিত ছড়া:

নদের গদা।
কুশদহের ভদা ॥
(গদা — গদাধর শিরোমণি
ভদা— রামভদ্র ন্যায়লঙ্কার)

কৃষ্ণনগর: নদিয়া
পূর্বনাম রেউই। (রেউই দেখুন) নদিয়ার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ মজুমদারের পৌত্র রাজা রাঘব পূর্ব বাসস্থান মাটিয়ারি ত্যাগ করে এখানে নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। রাজা রাঘবের পুত্র মহারাজা রুদ্র এই স্থানের নাম রাখেন কৃষ্ণনগর। কথিত আছে, সেকালে রেউই-এ অনেক গোপের বসতি ছিল এবং তারা মহাসমারোহে শ্রীকৃষ্ণের পুজো করত। সেই কারণে রুদ্র রেউই-এর নাম পরিবর্তন করে কৃষ্ণনগর রাখেন। কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর লিখেছেন, 'কৃষ্ণের নামে কৃষ্ণনগর, অন্য নামে নয়।' মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নাম থেকে কৃষ্ণনগরের নামকরণ হয়নি।

প্রচলিত ছড়া:

কৃষ্ণনগরের ময়রা ভাল,
মালদহের ভাল আম।
উলোর ভাল বাঁদর-পুরুষ,
মুর্শিদাবাদের জাম।

* * *

কিষ্টনগর ডুবুডুবু,
বেন্দা ভাসে।
সোনার পাত্তোসায়ের (পাত্রসায়ের)।
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসে ॥

কেঁদটাঁড়: পুরুলিয়া

কেঁদ + টাঁড় শব্দযোগে স্থানের নাম কেঁদটাঁড় হয়েছে। কেঁদ বৃক্ষ বিশেষের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অস্ট্রিক শব্দ 'টাঁড়' যার অর্থ পল্লী বা পাড়া। স্থানীয় ভূপ্রকৃতি ও উৎপন্ন দ্রব্যের সঙ্গে জড়িত নাম।

কেঁদুলি: বীরভূম

পূর্বনাম 'কেন্দুবিল্ব'। অপভ্রংশে কেঁদুলি। বর্ধমান বীরভূম সীমান্তে অজয় নদের তীরে অবস্থিত এই স্থানটি গীতগোবিন্দের রচয়িতা জয়দেবের জন্মস্থান ও নিবাসের জন্য জয়দেবকেঁন্দুলি নামে খ্যাত। যদিও তাঁর বাস্তুভিটার সন্ধান এই গ্রামে আজ কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। লোকের বিশ্বাস কবির বাস্তুভিটার উপরেই নাকি বর্তমান রাধামাধব বা রাধাবিনোদের মন্দির নির্মিত হয়েছে। কিছু প্রাচীন গ্রন্থাদি থেকে জানা যায় যে, খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে কবি জয়দেব কিছুকাল রাজা লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ছিলেন। কিংবদন্তি আছে যে, 'গীতগোবিন্দ' রচনাকালে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বহস্তে 'গীতগোবিন্দ'-এর এক অসম্পূর্ণ পদ পূরণ করে দিয়ে যান। জয়দেবের স্মৃতিবিজড়িত কেন্দুবিল্ব বা কেঁদুলি বৈষ্ণবদের কাছে এক বিশিষ্ট তীর্থস্থান।

সুকুমার সেন 'কেন্দুবিল্ব'-এর অর্থ করেছেন— 'যেখানে কেঁদ ও বটগাছ পাশাপাশি অথবা জড়িয়ে আছে।'

কেউটে খলিসা: প মেদিনীপুর

কেউটে + খলিসা শব্দযোগে স্থানের নাম কেউটে খলিসা।। খলিসা অর্থে যেসব জমির রাজস্ব সরাসরি ভাবে সরকারকে দিতে হয় এবং যে-সব জমি জাগির বা ইনামস্বরূপ অপর কাউকে প্রদত্ত নয়, সেই সব সম্পত্তির পরিচায়ক। কেউটে বা কেউট, কেয়ট বা কৈবর্ত সম্প্রদায়ের নির্দেশক স্থান। সম্ভবত কেয়ট সম্প্রদায়ের সঙ্গে খলিসা জমিদারি ব্যবস্থাসূচক স্থাননাম।

কেদার/ কেদারকুণ্ড: প মেদিনীপুর

চপলেশ্বর বা ভুড়ভুড়ি কেদার নামে এক অনাদিলিঙ্গ মহাদেবের নামে এই স্থাননাম।

প্রচলিত ছড়া:

যা নাই ভাণ্ডে (ব্রহ্মাণ্ডে)।
তা কেদার কণ্ডে।

কেশীয়ারী: প মেদিনীপুর

আইন-ই-আকবরিতে এই স্থানটি 'মহল সিয়ারি' নামে উল্লেখ পাওয়া যায়। ইংরেজি নথিপত্রে স্থানটি 'কেশরি' (Casharry) নামে উল্লিখিত আছে। সম্ভবত 'কেসরি' এবং 'সিয়ারি'-এর যোগসূত্রে অপভ্রংশে কেশীয়ারী নাম হয়েছে।

কোগ্রাম: বর্ধমান

স্থানটি উজানি কোগ্রাম নামেও পরিচিত। বৈষ্ণব সাহিত্য ও 'বড়াইবুড়ী' ও 'চৈতন্যমঙ্গল' প্রণেতা লোচনদাসের জন্মস্থানরূপে বিখ্যাত স্থানটির নামকরণ সম্বন্ধে জনশ্রুতি আছে যে, অল্পবয়সেই লোচনের বিয়ে হলেও দাম্পত্য জীবনযাপন করেননি বলে তাঁর স্ত্রী গ্রামের নাম রেখেছিলেন 'কুগ্রাম'। লোচন তাকে 'কোগ্রাম' করেন এবং ক্রমে অপভ্রংশে 'কোঁগাঁ' নামেও অভিহিত হয়। কথিত আছে, বিয়ের পরেই লোচনদাস শ্রীখণ্ড নিবাসী নরহরি ঠাকুর ও রঘুনন্দনের কাছে বিদ্যাভ্যাস করতে যান। চৈতন্যমঙ্গলে লোচনদাসের আত্মপরিচয় পাওয়া যায়—

বৈদ্যকুলের জন্ম মোর কোগ্রাম নিবাস।
মাতা সতী শুদ্ধমতি সদানন্দী নাম।
যাহার উদরে জন্মি করি কৃষ্ণকাম।
কমলাকর দাস নামে মোর জন্মদাতা।
যাহার প্রসাদে কহি গৌর গুণগাথা।...
মাতৃকুল পিতৃকুল বৈসে এক গ্রামে।
ধন্য মাতামহী সে অভয়দাসী নামে।...
মাতৃকুলে পিতৃকুলে কহিল মো কথা।
নরহরি দাস মোর প্রেমভক্তি দাতা ॥

জানা যায়, বর্তমান কোগ্রাম, মঙ্গলকোট (মঙ্গলকোট দেখুন) আড়াল প্রভৃতি গ্রাম একদা উজানিনগর নামক এক জনপদের অন্তর্গত ছিল। বস্তুত বর্তমান কোগ্রাম পূর্বকালীন উজানিনগরের এক অংশ মাত্র। প্রবাদ আছে যে, এখানে বিক্রমকেশরী নামে এক বীর কেশরী রাজা ছিলেন। বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য থেকে জানা যায় যে, উজানি একদা উত্তররাঢ়ের সওদাগরপ্রধান স্থান ছিল। কথিত আছে, বাংলার রূপকথার ধনপতি সওদাগর এই স্থানে বাস করতেন এবং অজয় নদ ও কুনুরের সঙ্গমস্থান থেকেই ধনপতির পুত্র শ্রীমন্ত সদাগর সিংহল যাত্রা করেছিলেন। কিংবদন্তি আছে যে, উজানিতে সতীর দক্ষিণ কনুই পড়েছিল। সেই কারণে স্থানটি পীঠস্থানরূপেও গণ্য। স্থানীয় দেবী সর্বমঙ্গলার মন্দির সেই পীঠস্থানের প্রতীকরূপে বিবেচিত হয়।

প্রচলিত ছড়া :

বলে পরস্পর উজানিনগর
অতি প্রাচীন শহর শুনি,
নয় সামান্য স্থল পরম নির্মল
পূর্বে অজয়ের জল বহিত উজানি।...
চণ্ডীর আভাস তাই করি প্রকাশ,
অত্রস্থানে ছিল শ্রীমন্তের বাস,
সাধুবংশোদ্ভব মঙ্গলারি দাস,
তা'দেরি পূজিতা ঐ মঙ্গল জননী।...
এই ধামের গুণ বর্ণিয়ে বেড়াই
শ্রীবৃন্দাবনে যিনি ছিলেন 'বড়াই'
লোচন রূপে হেথায় অবতীর্ণ তিনি।

কোতরং: হুগলি

সুকুমার সেনের মতে: 'কোতরং ফারসী কোতাহ্ ('ছোট') + বাংলা আড়ং থেকে উদ্ভূত নাম।'

(বর্তমানে হিন্দমোটর নামে পরিচিত।)

প্রচলিত ছড়া:

ইট, টালি, চঙ্
তিনে কোতরং ৷৷
(চঙ্— ছাত ছাওয়ার বিশেষ ধরনের টালি)

কোন্নগর: হুগলি

সুকুমার সেন প্রশ্ন তুলেছেন, 'যে স্থান ডানকুনি বিলের কোণে অবস্থিত?' অবশ্য অন্য মতে বলা হয়, বালি-উত্তরপাড়ার কোণে অবস্থিত বলেই এই জনপদের নাম কোন্নগর।

স্থানটি শ্রীঅরবিন্দের পৈতৃক নিবাস এবং সমাজ সংস্কারক শিবচন্দ্র দেবের জন্মস্থান। বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ উপন্যাসে 'সূর্যমুখীর পিত্রালয় কোন্নগর' উল্লেখ আছে।

প্রচলিত ছড়া :

গাঁজা, গুলি, ছিঁচকে চোর।
তিন নিয়ে কোন্নগর ॥

কোলড়া: হাওড়া

পূর্বে এই গ্রামের পাশ দিয়ে গৌরী নদী প্রবাহিত ছিল। কথিত আছে, নদীর পাড়ে বহু কলুর আড়া অর্থাৎ আড়ত ছিল। কলুর আড়া থেকে অপভ্রংশে এই স্থানের নাম 'কোলড়া' হয়েছে বলে অনুমিত।

কোলসরা: বর্ধমান

নদীর কোল সরে গিয়ে গ্রামের উৎপত্তি বলে গ্রামের নাম কোলসরা হয়েছে বলে অনেকে অনুমান করেন। কথিত আছে, এক সময় এখানকার নদীপথে বড় বড় মহাজনি-নৌকা এবং স্টিমার চলাচল করত।

কোলাঘাট: পূ মেদিনীপুর

সম্ভবত কোল সম্প্রদায় অথবা কয়লার সঙ্গে জড়িত স্থাননাম।

প্রচলিত ছড়া:

কাঠ, কয়লা, পাট,
তিনে কোলাঘাট ॥

ক্যানিং: দ চব্বিশ পরগনা

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লর্ড ক্যানিং-এর সময়ে কলকাতা বন্দরের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নানা আশঙ্কা উপস্থিত হলে মাতলা নদীর তীরে এবং উত্তরে বিদ্যাধরী

নদীর ধারে লর্ড ক্যানিং-এর নামানুসারে ক্যানিং টাউন এবং পোর্ট ক্যানিং-এর সৃষ্টি হয়। পরে আর্থিক কারণে পোর্ট তৈরির কাজ বন্ধ হয়ে যায়। মাতলা নদীর তীরে গড়ে ওঠা ক্যানিং টাউন বর্তমানে ক্যানিং নামে পরিচিত।

ক্ষীরপুলি: নদিয়া
ক্ষীরপুলি নামক গ্রামবাংলার বিশেষ মিষ্টান্নের সঙ্গে জড়িত স্থাননাম।

খড়দহ/ খড়দা: উ চব্বিশ পরগনা
কিংবদন্তি আছে যে, শ্রীচৈতন্যদেবের পরম ভক্ত ও পার্ষদ নিত্যানন্দ চৈতন্যদেবের আদেশে প্রায় চল্লিশ বছর বয়সে আশ্রম ছেড়ে শালিগ্রাম নিবাসী পণ্ডিত সূর্যদাস সরখেলের বসুধা ও জাহ্নবী নাম্নী দুই কন্যাকে বিয়ে করে গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করে নিত্যানন্দ কিছুদিন সস্ত্রীক নবদ্বীপ, শান্তিপুর ও সপ্তগ্রামে বসবাস করার পর আত্মীয়স্বজনের অনুরোধে এই স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করবার উদ্দেশ্যে আসেন। স্থানীয় ভূস্বামীর কাছে তিনি একখণ্ড জমি প্রার্থনা করলে সেই ভূস্বামী বিদ্রূপ করে গঙ্গার দহে একটি খড় ফেলে দিয়ে সেই স্থানে নিত্যানন্দকে তাঁর বাসস্থান নির্মাণ করতে বলেন। নিত্যানন্দের দৈবী প্রভাবে সত্যসত্যই তৎক্ষণাৎ গঙ্গার দহ থেকে একটা চর উঠে আসে এবং তিনি সেইখানে ঘর তৈরি করে বসবাস করতে লাগলেন। সেই থেকে স্থানের নাম হয় খড়দহ বা অপভ্রংশে খড়দা। এই ঘটনার একটা রূপান্তরিত বর্ণনাও পাওয়া যায়। কথিত আছে, নিত্যানন্দ ভাগীরথী তীরবর্তী এই স্থানে তপস্যার জন্য আসেন। একদিন তিনি এক নারী কণ্ঠের উচ্চ স্বরে কান্না শুনে তার কাছে গেলে সেই রমণী বলে যে, তার একমাত্র কন্যার এইমাত্র মৃত্যু হয়েছে। সেই মৃতবৎ কন্যার দিকে তাকিয়ে নিত্যানন্দ জানালেন যে, কন্যার তো মৃত্যু হয়নি, সে ঘুমিয়ে আছে মাত্র। তখন সেই রমণী প্রতিজ্ঞা করলেন যে যদি নিত্যানন্দ মেয়েকে বাঁচিয়ে তোলেন তবে সেই মেয়ের বিয়ে তাঁর সঙ্গেই দেবেন। মুহূর্তেই নিত্যানন্দ তাঁর দৈবীশক্তিতে মেয়েকে জীবিত করে তুললেন এবং সেই রমণীর প্রতিজ্ঞামতো তাকে বিয়ে করলেন। সংসারী হওয়ার পর স্বভাবতই একটি গৃহের প্রয়োজন বোধ করায় তিনি স্থানীয় ভূস্বামীকে একখণ্ড জমির জন্য অনুরোধ করলে সেই ভূস্বামী নিত্যানন্দের দৈবীশক্তির প্রতি বিদ্রূপ করে, এক টুকরো খড় নিকটবর্তী গঙ্গার দহে ফেলে দিয়ে সেখানে ঘর তৈরি করতে

বলেন। নিত্যানন্দের দৈবী গুণবলে তৎক্ষণাৎ সেই দহ ভরে গিয়ে চর উঠে আসে এবং তিনি সেইখানে গৃহ নির্মাণ করলেন। ক্রমে এই স্থানে গ্রাম গড়ে উঠলে স্থাননাম হয় 'খড়দহ'। 'দহে' প্রক্ষেপিত 'খড়' থেকে 'খড়দহ'।

নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র গোস্বামী খড়দহে শ্যামসুন্দর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিগ্রহ সম্বন্ধেও একটি কিংবদন্তি আছে। গঙ্গার পশ্চিম তীরবর্তী বল্লভপুরের জঙ্গলে হুগলি জেলার চাতরা নিবাসী রুদ্রপণ্ডিত তপস্যা করতে আসেন। তিনি একদিন স্বপ্নে দেখেন যে, শ্রীকৃষ্ণ যেন তাঁকে গৌড়ের বাদশার প্রাসাদ থেকে একটি পাথর এনে তাই দিয়ে বিগ্রহ নির্মাণের আদেশ দিচ্ছেন। রুদ্র গৌড়ে উপস্থিত হয়ে স্বপ্ননির্দিষ্ট পাথরখানি বাদশার কাছে প্রার্থনা জানালেন। বাদশা পাথরটি দিতে অসম্মত হলে হঠাৎ পাথরটি থেকে বিন্দু বিন্দু অশ্রুর ধারার মতো জল বেরোতে থাকে। বাদশার জনৈক হিন্দু মন্ত্রী তাঁকে বোঝালেন যে, এটা বিশেষ অশুভ লক্ষণ। অবশেষে পাথরটি রুদ্রকে দান করা হয়। পাথরখানি এত ভারী ছিল যে, নৌকোয় তোলবার সময় জলে পড়ে যায়, কিন্তু দৈবপ্রভাবে গঙ্গার স্রোতে ভাসতে ভাসতে পাথরটি বল্লভপুরের ঘাটে এসে লাগে। এই পাথরখানি থেকে রুদ্র শ্যামসুন্দর, রাধাবল্লভ ও নন্দদুলাল নামে তিনটি সুন্দর বিগ্রহ তৈরি করালেন। এই বিগ্রহ তিনটির মধ্যে শ্যামসুন্দর বিগ্রহের প্রতি বীরভদ্রের বিশেষ আকর্ষণ ছিল। প্রথমে রুদ্র তাঁকে এই বিগ্রহটি দান করতে সম্মত হননি। একদিন রুদ্র নিজভবনে পিতৃশ্রাদ্ধ করছেন এমন সময় ভীষণ মেঘ হয়ে শ্রাদ্ধ পণ্ড হওয়ার উপক্রম হল। নিমন্ত্রিত বীরভদ্র সেখানে উপস্থিত ছিলেন। রুদ্রের বিপদ দেখে তিনি তাঁর অলৌকিক শক্তির প্রভাবে প্রবল বারিবর্ষণ থেকে শ্রাদ্ধমণ্ডপ রক্ষা করলেন। ভাববিহ্বল রুদ্র বীরভদ্রকে তখন শ্যামসুন্দর বিগ্রহটি দান করলেন।

প্রচলিত ছড়া:

শ্রীনিত্যানন্দ নিবাস করিল খড়দহে।
মহাকুল যোগেশ্বর বংশে যাহে রহে ॥

* * *

তবে আইলেন প্রভু খড়দহ গ্রামে।
পুরন্দর পণ্ডিতের দেবালয় স্থানে ॥
খড়দহ গ্রামে প্রভু নিত্যানন্দ রায়।
যত নৃত্য করিলেন—কথন না যায় ॥

কথোদিন থাকি নিত্যানন্দ খড়দহে,
সপ্তগ্রাম আইলেন সর্বজন সহে,
সপ্তগ্রামে যত হৈল কীর্তন বিহার.
শত বৎসরেও তাহা নারি বর্ণিবার ॥

* * *

ঝগড়া, বিবাদ, কলহ,
এ তিন নিয়ে খড়দহ ॥

খড়িকা: প মেদিনীপুর

পূর্বনাম খটিকা, অপভ্রংশে খড়িকা। 'খড়িকা' (Khatika) স্থাননামের উল্লেখ Khalimpur Grant of Dharmapala-এ পাওয়া যায়।

খড়্গপুর: প মেদিনীপুর

খড়গপুর রেল স্টেশনের কাছে ইন্দ্রপল্লীতে খড়্গেশ্বর শিবের এক প্রাচীন মন্দির আছে। ধারেন্দার রাজা খড়্গসিংহ এই মন্দিরের নির্মাতা বলে জানা যায়। কারও কারও মতে বিষ্ণুপুরের রাজা খড়্গমল্ল এই মন্দিরের নির্মাতা। খড়্গসিংহ বা খড়্গমল্ল থেকেই বিগ্রহটি খড়্গেশ্বর শিব নামে পরিচিত। খড়্গেশ্বর থেকেই স্থাননাম খড়্গপুর হয়েছে। স্থানটি অতীতের বেঙ্গল নাগপুর রেলপথ, বর্তমানে ভারতীয় রেলপথের একটি প্রধান জংশন স্টেশন এবং ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত রেল কারখানার জন্য খ্যাত।

খন্যান: হুগলি

খাঁ + নান। সম্ভবত খাঁ পদবিধারী কোনও ব্যক্তির সঙ্গে 'নান' জমিদারি ব্যবস্থাসূচক স্থাননাম। (আলীনান দেখুন)।

খলিসা গোসানীমারি: কোচবিহার

আনুমানিক পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে খ্যেনবংশীয় নীলধ্বজ এই অঞ্চলে কামতা রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। কামদা বা কামতাদেবী তাঁর উপাস্য দেবী ছিলেন। সেই দেবীর নামানুসারে রাজ্যের নাম হয় কামতারাজ। সাধারণ লোকে এই দেবীকে গোস্বামিনী সর্বাধিশ্বরী বা গোসানী নামে অভিহিত করত।

সেই থেকে স্থাননাম গোসানীমারি হয়েছে বলে অনুমিত। 'খলিসা' একটি জমিদারি ব্যবস্থাসূচক শব্দ। অর্থ— সেই সব জমি যার রাজস্ব সরাসরি ভাবে সরকারকে প্রদত্ত এবং এই প্রকার জমি জাগির বা ইনামস্বরূপ অপর কাউকে দেওয়া যেতে পারে না। সম্ভবত এই স্থানে 'খলিসা' জমিদারি ব্যবস্থা প্রচলন থাকায় 'খলিসা গোসানীমারি' স্থাননাম হয়েছে।

খাগড়াবারি: জলপাইগুড়ি
খাগড়া নামক একপ্রকার বড় ঘাসের সঙ্গে জড়িত স্থাননাম। স্থানটি হোসেনবাদ বা হোসেনাবাদ চা বাগান নামেও পরিচিত। নবাব মোশরফ হোসেন এই স্থানটি কিনে এখানে চা বাগান করেন।

খাটুন্দী: বর্ধমান
পূর্বনাম খাণ্ডাইলা। অপভ্রংশে খানরূল এবং পরে খাটুন্দী হয়েছে। 'খাণ্ডাইলা' (Khandayilla) নামের উল্লেখ Naihati copper plate of Vallala-Sena, Uttar Radh of Central Bengal, early 12th century -তে পাওয়া যায়।

খাটুরা: নদিয়া
গ্রামের পাশ দিয়ে বহতা ইছামতী নদী 'খাঁড়ু' অর্থাৎ কঙ্কণ (মেয়েদের বালা) আকারে স্থানটিকে বেষ্টন করে থাকায় স্থানের নাম হয় খাঁড়ুয়া, যা অপভ্রংশে খাটুরা হয়েছে।

খাণ্ডারী: বর্ধমান
গ্রামে অবস্থিত খণ্ডেশ্বর মহাদেবের মন্দির থেকে অপভ্রংশ খাণ্ডারী স্থাননাম।

খাড়গাঁ: বীরভূম
প্রচলিত ছড়া:

জয় কৃষ্ণপুর ডুবুডুবু,
খাড়গাঁ ভাসে।
সোনার গ্রাম বাগপাড়া
চিলেয় (চিলেকোঠায়) বসে হাসে ॥

খাড়ারী: বাঁকুড়া

কিংবদন্তি আছে কোনও এক সময় এই গ্রামের এক প্রান্তে জনৈক কালীসাধক নির্জনে কোনও দেবীর সাধনভজন করতেন কিন্তু কিছু দুষ্কৃতকারী প্রায়ই তাঁর সাধনভজনে বিঘ্ন সৃষ্টি করত। বিরক্ত হয়ে সেই ব্যক্তি একদিন কালীর 'খড়্গ' (খাঁড়া) নিয়ে দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান এবং তাদের সমূলে বিনাশ করেন। এই কারণে গ্রামের নাম 'খাঁড়ারী' হয়। পরে লোকমুখে 'খাঁড়ারী' খাড়ারী নামে উচ্চারিত হতে থাকে।

খাড়িগ্রাম: দ চব্বিশ পরগনা

হিন্দু যুগের 'খাড়ি মণ্ডল' বা 'খাঁড়ি বিষয়ের' ভৌগোলিক স্মৃতি 'খাড়ি'। নামের উৎপত্তির সঙ্গে এই স্থানের ভৌগোলিক অবস্থানের সম্যক যোগসূত্র আছে। ইংরেজি 'এস্টুয়ারি' (estuary) কথার অর্থ 'খাড়ি'। নদীর প্রবাহ সাগরসঙ্গমের কাছে যেখানে ছোট ছোট সংকীর্ণ ধারায় খোলে বা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে সাগরের দিকে এগিয়ে চলে তাকে 'এস্টুয়ারি' বা 'খাড়ি' বলে। সেই বিশেষত্বের জন্যই এই স্থানটির নাম 'খাড়ি'। খাড়িগ্রাম আদিগঙ্গার 'খাড়ি'। স্থানীয় জনশ্রুতি অনুসারে এই স্থানের আদি বাসিন্দারা 'খড়াস'-এর কাজ অর্থাৎ লবণ তৈরির কাজ করত বলে স্থাননাম 'খাড়িগ্রাম' হয়েছে।

খাতড়া: বাঁকুড়া

প্রচলিত ছড়া:

অম্বিকানগর গেছে গানে,
খাতরা গেছে দানে,
রাইপুর গেছে বানে ॥

খানাকুল কৃষ্ণনগর: হুগলি

খানাকুল স্থাননামের উৎপত্তি সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না। তবে সুকুমার সেন লিখছেন, 'খানাকুল < খনা + কুল্যা (= যেখানে জলপ্রণালী কাটা হয়েছে।)' একদা এই স্থানে বহু শিক্ষিত ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তির বাস ছিল বলে জানা যায়। পণ্ডিতকুলের বাসস্থানের সূত্রে স্থাননামের কোনও যোগসূত্র থাকতে পারে। কথিত আছে, সে কালে একমাত্র নবদ্বীপ ছাড়া এত পণ্ডিত ব্যক্তির বাস বাংলায় আর কোথাও ছিল না বলে খানাকুলকে তৎকালে দ্বিতীয়

নবদ্বীপ বলা হত। খানাকুল কৃষ্ণনগর-সংলগ্ন রাধানগর গ্রাম ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ও ভারতের বর্তমান যুগের জাতীয়তাবাদের প্রধান হোতা রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থান।

প্রচলিত ছড়া :

সরাই মেলের কুল,
বেটার বাড়ি খানাকুল
বেটা সর্বনাশের মূল।
ওঁ তৎসৎ বলে বেটা বানিয়েছে ইস্কুল।
ও শালা জেতের দফা করলে রফা,
মজালে মোদের তিন কুল ॥
(রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি বিদ্রূপে এই ছড়া)

খারজুলী: বর্ধমান

পূর্বনাম 'খড্ডজোটিকা'। অপভ্রংশে খারজুলী। 'খড্ডজোটিক'-এর উল্লেখ Malla-Sarul copper plate inscription of Gopa (Chandra) and Vijaya-Sena, 6th century-তে পাওয়া যায়।

খালনা: হাওড়া

প্রচলিত ছড়া:

রায়, বাঁড়ুজ্জ্যে, মোল্লা,
এ তিন নিয়ে খাল্লা (খালনা) ॥

* * *

খাল, নালা, বন্যা,
তিন নিয়ে খালনা ॥

* * *

জয়পুরের চোপা,
খালনার খোঁপা,
আমতার টান,
কোঁদল দেখবি যদি
রামচন্দ্রপুরের মেয়ে আন ॥

খোলটা: কোচবিহার
কিংবদন্তি আছে যে, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য এই স্থানেই প্রথম খোলের প্রথম বোল 'তা' বাজিয়েছিলেন। খোলের 'তা' থেকে খোলতা এবং পরে অপভ্রংশে খোলটা নাম হয়েছে।

গগনপুর: বীরভূম
প্রচলিত ছড়া:

গগনপুরের ধুলো
পারকান্দীর মুলো,
পাইকড়ের বঁটি,
বংশবাটির বেটি,
ধরে ধরে কাটি ॥

গঙ্গাধরপুর: নদিয়া
কথিত আছে, কৃত্তিবাসের অনুজ গঙ্গাধর-এর নামানুসারে স্থাননাম।

গঙ্গাবাস: নদিয়া
(আমঘাটা গঙ্গাবাস দেখুন)।

গঙ্গারামপুর: দ দিনাজপুর
পূর্বনাম দেবীকোট। মুসলমান আমলে স্থানটির নাম ছিল দমদমা বা ডুমডুমা। কথিত আছে এখানে একটি সামরিক ঘাঁটি ছিল এবং সৈন্যদের কুচকাওয়াজের জন্যই স্থাননাম দমদমা ও ডুমডুমা হয় বলে অনুমিত। বর্তমানে স্থানটি গঙ্গারামপুর নামে অভিহিত হয় কিন্তু এই নাম পরিবর্তনের কারণ জানা যায় না।

গঙ্গাসাগর: দ চব্বিশ পরগনা
ভাগীরথী বা গঙ্গার সাগরে মিলনস্থান গঙ্গাসাগর। কপিলমুনির কঠোর তপস্যার পর তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধি লাভে পূত এই স্থানটি হিন্দুদের একটি অতি পবিত্র তীর্থস্থান। প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তির সময় এখানে প্রসিদ্ধ মকর

স্নানের মেলা হয়। ভারতের প্রায় সকল প্রদেশের লোক এই মেলায় আসেন এবং গঙ্গাসাগরে পুণ্যস্নানের সৌভাগ্য অর্জন করেন। স্থান মাহাত্ম্যের সঙ্গে ভগীরথের মর্তে গঙ্গা আনয়নের অলৌকিক কাহিনিও বিজড়িত। (সাগরদ্বীপ দেখুন)।

প্রচলিত ছড়া:

সব তীর্থ বার বার
সাগরতীর্থ / গঙ্গাসাগর এক বার ॥

* * *

বাস করব নগরে,
মরব গিয়ে সাগরে ॥

* * *

কালে কলিকালে আরও কত হবে।
ছুঁচোর মনে সাধ হয়েছে গঙ্গাসাগর যাবে ॥

গজা: হাওড়া

প্রচলিত ছড়া:

গজা ডুবুডুবু
ইটরাই ভাসে
সোনার শিবপুর
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসে ॥

গড়বেতা: প মেদিনীপুর

কিংবদন্তি আছে, উজ্জয়িনীর মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সময় একজন যোগীপুরুষ দেশ ভ্রমণ করতে করতে মেদিনীপুরের বগড়ী প্রদেশে আসেন। সেই যোগীপুরুষ মন্ত্রবলে গভীর জঙ্গলের মধ্যে সর্বমঙ্গলাদেবীর মন্দির নির্মাণ করেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্য লোকের মুখে এই সর্বমঙ্গলা দেবীর মাহাত্ম্যের কথা শুনে নিজে এই স্থানে আসেন এবং শবসাধনা করেন। মহারাজের সাধনায় তুষ্ট হয়ে দেবী তাঁকে অলৌকিক শক্তি প্রদর্শনের ক্ষমতা দেন এবং তাল-বেতালকে তাঁর আজ্ঞাধীন অনুচর করেন। মহারাজ শক্তি পরীক্ষার জন্য তাল-বেতালকে দেবীর মন্দির উত্তরমুখী করার জন্য আদেশ দেন।

তাল-বেতাল মুহূর্তের মধ্যে মন্দির উত্তরমুখী করে দেয়। এই বিক্রমাদিত্য আখ্যানের কোনও প্রামাণিক তথ্য পাওয়া যায় না। তবে এই মন্দিরের দ্বার বস্তুতই উত্তরমুখী যা সচরাচর কোনও হিন্দু মন্দিরে দেখা যায় না। অনেকের মতে এই সর্বমঙ্গলা মন্দির এবং রায়কোটা নামে একটি অধুনা ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন দুর্গ তদানীন্তন বগড়ী রাজাদের দ্বারা নির্মিত হয়। তৎকালে স্থানটি বগড়ী রাজাদের রাজধানী ছিল বলে জানা যায়। অনেকের মতে বগড়ী রাজাদের 'গড়' এবং তাল-বেতালের 'বেতা' শব্দের যোগসূত্রে স্থাননাম গড়বেতা হয়েছে।

প্রচলিত ছড়া:

আম, আঁকড়, আতা
তিন নিয়ে গড়বেতা ॥
(আঁকড়— ওষধি গুণাবলম্বিত লতাপাতা)

গড়মান্দারন: হুগলি

মান্দার নামক এক প্রকার গাছের প্রাচুর্য থেকে এই স্থানের নাম মান্দারন হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। এক সময়ে এখানে কয়েকটি প্রাচীন দুর্গ ছিল বলে জানা যায় এবং মুসলমান আমলে মাটির তৈরি গড়ের অস্তিত্বও পাওয়া যায়। 'বিঠুর গড়' নামেও এই স্থানের উল্লেখ কিছু নথিপত্রে পাওয়া গেছে। সেই কারণে স্থানটি গড়মান্দারন নামে পরিচিত হয় বলে অনেকে মনে করেন। সুদূর অতীত কালে স্থানটি হিন্দু রাজাদের রাজধানী ছিল বলেও জানা যায়।

গড়া গোহালিয়া: নদিয়া

কথিত আছে, জনবসতির সূচনায় এখানে গোশালা স্থাপিত হয়। গোশালার অপভ্রংশে গোহালিয়া হয়েছে বলে অনুমিত। স্থাননামের আদ্যপদে 'গড়া' শব্দের যোগসূত্র অস্পষ্ট।

গদাইপুর: মুর্শিদাবাদ

সম্ভবত কোনও 'গদা' বা 'গদাই' নামক ব্যক্তির সঙ্গে জড়িত স্থাননাম।

প্রচলিত ছড়া:

ঘন বর্ষা, না হয় বান,
তবে হয় গদাইপুরে ধান ॥

গন্তার: বর্ধমান

কথিত আছে, এই স্থানে সতীর কর্ণ বা কান পতিত হয়েছিল বলে আদিতে স্থাননাম হয় 'কন্তার'। পরে অপভ্রংশে 'গন্তার' হয়। স্থানীয় চণ্ডীদেবীর স্থান সতীপীঠ বলে বিবেচিত হয়।

গয়াবাড়ি: দার্জিলিং

নেপালি শব্দ, অর্থ গোয়ালঘর। অন্য মতে 'গেহুবাড়ি' থেকে অপভ্রংশে গয়াবাড়ি স্থাননাম হয়েছে। একদা এই স্থানের আশেপাশে পর্যাপ্ত পরিমাণে গমের চাষ-আবাদ হত বলে জানা যায়।

গরুটি: হুগলি

পূর্বনাম গৌরহাটী। বর্তমানে অপভ্রংশে গরুটি নামে পরিচিত। কিছু ইংরেজি নথিপত্রে স্থানটিকে 'ফরাসগঞ্জ' নামে চিহ্নিত করা আছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে 'গরিটি' বা 'গিরোটা' নামে এই স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়।

গাঁধালে: দ চব্বিশ পরগনা

পূর্বনাম গন্ধবাদুলী, অপভ্রংশে গাঁধালে। প্রচলিত ভাষায় গন্ধবাদুলী অর্থে গাঁদাল পাতা, একপ্রকার খাদ্যযোগ্য ভেষজ ঔষধি।

গিরিয়া: মুর্শিদাবাদ

'গিরি' অর্থাৎ পাহাড়ের সঙ্গে জড়িত স্থাননাম। স্থানটি ঐতিহাসিক। ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে আলিবর্দি খাঁ ও সরফরাজ খাঁয়ের যুদ্ধ এবং ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ ও মীরকাশিমের যুদ্ধ হয় এই গিরিয়ার ময়দানে।

গিলাপোল: উ চব্বিশ পরগনা
গিলা + পোল। পোল অর্থ মাঠ বা ভূখণ্ড। গিলা হিন্দি শব্দ, অর্থ সরস বা নরম কোনও জিনিস বা স্থান। স্থাননামের উল্লেখ Ashrafpur Grants of Deva - Khadgam East Bengal 1st half of the 10th century-তে পাওয়া যায়।

গুড়দহ: উ চব্বিশ পরগনা
সন্নিহিত নদীর আবর্তে গুড় সহ কোনও বাণিজ্যপোতের ডুবে যাবার কিংবদন্তির সঙ্গে জড়িত স্থাননাম।

গুপ্তিপাড়া: হুগলি
পূর্বনাম গুপ্তপল্লী। কথিত আছে, আকবরের রাজত্বকালের শেষার্ধে দশনামী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী সত্যদেব সরস্বতী নামক একজন সিদ্ধপুরুষ ভারতের বিভিন্ন তীর্থস্থান পর্যটনের পর এই স্থানে এসে উপস্থিত হন। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ধর্মীয় পরিবেশ এবং স্থানীয় অধিবাসীগণের সারল্যে মুগ্ধ হয়ে তিনি ভাগীরথী নদীর তীরের বনভূমিতে এক আশ্রম স্থাপন করেন। কিছুকাল পরে তিনি স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে নদিয়া জেলার শান্তিপুর থেকে বৃন্দাবনজিউর মূর্তি এনে তাঁর আশ্রমে স্থাপন করেন। শীঘ্রই শ্রীবৃন্দাবনজিউর দেবমাহাত্ম্য এবং স্থানটির স্বভাব সৌন্দর্য চারিদিকে প্রচারিত হয় এবং দেবতার নামানুসারে গুপ্ত বৃন্দাবনপল্লী নামে খ্যাত হয়। কালক্রমে সংক্ষেপে স্থানটি 'গুপ্তপল্লী' রূপে অভিহিত হতে থাকে এবং পরে অপভ্রংশে 'গুপ্তিপাড়া' হয়।

অন্য মতে, একদা বৈদ্যপ্রধান 'গুপ্ত' পদবিধারী লোকদের প্রাধান্য এবং স্থানীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের গুপ্ত তন্ত্রসাধনার অন্যতম কেন্দ্র বলে স্থানটি 'গুপ্তপল্লী' নামে খ্যাত হয় যা পরে অপভ্রংশে গুপ্তিপাড়া হয়েছে। 'শ্যামাকল্পলতিকা' প্রণেতা মথুরানাথ ভট্টাচার্য, 'বিদ্যোন্মাদ তরঙ্গিণী' প্রণেতা চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য এবং খ্যাতনামা বক্তা ও ধর্মোপদেশক কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন গুপ্তিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন।

প্রচলিত ছড়া:

বাঁদর, শোভাকর, মদের ঘড়া।
তিন নিয়ে গুপ্তিপাড়া ৷৷

পাঠান্তরে :

বাঁদর, পণ্ডিত, মদের ঘড়া।
তিন নিয়ে গুপ্তিপাড়া ॥

শোনা যায় এক সময়ে গুপ্তিপাড়ায় গাছের ডালে ডালে অনেক বাঁদর দেখা যেত। 'শোভাকর' অর্থে গুপ্তিপাড়ার পণ্ডিতদের জন্য প্রসিদ্ধ 'চট্টোশোভাকর বংশ' এবং 'মদের ঘড়া' অর্থে বীরাচারী তান্ত্রিক সাধনার অনুষ্ঠান।

আরও ছড়া:

গুপ্তিপাড়ার ব্রাহ্মণের কি কহিব নীত।
মহাতেজ ধরে তারা বিচারে পণ্ডিত ॥

* * *

গুপ্তিপাড়া গণ্ডগ্রাম বিপরীত পারে,
কুলীন ব্রাহ্মণ কত কে বলিতে পারে।

* * *

গুপ্তিপাড়া-অহঙ্কার অমূল্য ভূষণ,
বিজ্ঞ বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার রতন ॥

বাহ বাহ বল্যা! ঘন ঘন পড়ে গেল সাড়া।
বাম ভাগে শান্তিপুর ডাহিনে গুপ্তিপাড়া ॥
উলা বাহিয়া খিসমার আশেপাশে।
মহেশপুর নিকটে সাধুর ডিঙ্গা ভাসে ॥

* * *

অম্বিকা পশ্চিম পাড়ে,
শান্তিপুর পূর্বপাড়ে।
রাখিলে দক্ষিণে গুপ্তিপাড়া,
উলাসে উলাস গতি,
বটমূলে ভগবতি,
চণ্ডিকা নহেন যথা ছাড়া ॥

* * *

শান্তিপুর ডুবুডুবু
গুপ্তিপাড়া ভাসে।

সোনার সোমড়ার লোক
দেখে দেখে হাসে ॥

* * *

উলোর পাগল,
গুপ্তিপাড়ার বাঁদর,
হালিশহরের ত্যাঁদর ॥

* * *

গুপ্তিপাড়ার মাটি।
বাঁদর গড়ে খাঁটি ॥

* * *

বর্ধমানের চাষি ভাল,
চব্বিশ পরগনার গোপ।
গুপ্তিপাড়ার মেয়ে ভাল,
শীঘ্র বংশ লোপ ॥

* * *

রানাঘাটের হাতনাড়ুনি,
শান্তিপুরের কলকলানি।
নবদ্বীপের খোঁপা,
গুপ্তিপাড়ার চোপা ॥

* * *

গুপ্তিপাড়ার মেয়েরা বাচাল,
শান্তিপুরের মেয়েরা মুখরা,
উলোর মেয়েরা কুলের বড়াই করে,
নদীয়ার মেয়েরা খোঁপার পরিপাট্যের গর্ব করে ॥

* * *

উলোর মেয়ের কুলকুলাজি,
শান্তিপুরের খোঁপা।
অগ্রদ্বীপের হাতনাড়া,
গুপ্তিপাড়ার চোপা ॥

গুমগড়: হাওড়া

প্রচলিত ছড়া:

গুমগড়ের ঠক।
এক কই মাছে তিন টক ॥

গুরুলিয়া: মুর্শিদাবাদ

পূর্বনাম মাড়গ্রাম। গুরুলিয়া নামকরণ সম্বন্ধে দুটি জনশ্রুতি আছে। কথিত হয়, পূর্বে এই স্থানটি জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। শাটি ঘোষ নামে এক ব্যক্তি সেই জঙ্গল পরিষ্কার করে এখানে প্রথম বসতি স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে শাটি ঘোষের বংশধরেরা এই স্থানের জমিদারিস্বত্বের অধিকারী হয়। ঘোষপরিবার বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং এই পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় নিত্যানন্দ প্রভু এই স্থানে গোপীনাথের মন্দির ও বিগ্রহ স্থাপন করেন। ক্রমে স্থানটি গৌরাঙ্গের লীলাভূমিরূপে খ্যাতি লাভ করে এবং 'গুরুলিয়া' নামে পরিচিত হয়। অন্য মতে, বঙ্কিম রায় ঠাকুর নামে এক সাধুপুরুষ এখানে জঙ্গলে সাধনভজন করতেন। তাঁর বহু শিষ্য ও অনুচরবর্গ ছিল। তিনি দেহত্যাগ করবার পূর্বে শিষ্যদের বলেন যে 'হাম হিয়া পর গৌরল্যা'। অর্থাৎ 'আমি এইখানেই সমাধি নেব'। তদনুসারে তাঁর মরদেহ এই স্থানেই সমাধিস্থ করা হয়। এই 'গৌরল্যা' শব্দের সম্ভাব্য বিবর্তিত রূপ 'গৌরলিয়া', যা পরে অপভ্রংশে গুরুলিয়া হয়েছে বলে মনে করা হয়।

গৈপুর: উ চব্বিশ পরগনা

কথিত আছে, একসময়ে এই স্থানে গোপীগণ বাস করতেন বলে স্থানের নাম হয় গোপীপুর, পরে অপভ্রংশে গৈপুর হয়।

গোঁসাইপুর: বাঁকুড়া

জানা যায় প্রায় দুই শতাধিক বৎসর পূর্বে শুকদেব গোস্বামী নামে একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বিষ্ণুপুর মহারাজের কাছ থেকে কিছু ভূসম্পত্তি দানসূত্রে পেয়ে এই স্থানে সপরিবারে বসবাস শুরু করেন। ক্রমে জনবসতি গড়ে উঠলে স্থানটি প্রথমে গোস্বামীপুর নামে অভিহিত হয়, পরে অপভ্রংশে গোঁসাইপুর হয়েছে।

গোক: দার্জিলিং
মূল লেপচা থেকে উদ্ভূত স্থাননাম। অর্থ— দুষ্কর ও সংকীর্ণ পাহাড়ি পথ।

গোকর্ণ: মুর্শিদাবাদ
প্রচলিত ছড়া:

না দেখে চালাই হেঁসো,
গোকর্ণে কে কার মেসো ॥

গোবরডাঙা: উ চব্বিশ পরগনা
জনশ্রুতি আছে, স্থানটি মহাভারতের যুগে শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ ভূমি ছিল। স্থানটি এবং পারিপার্শ্বিক গোরু ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের জন্য প্রখ্যাত। সম্ভবত গোরুর গোবরের সঙ্গে জড়িত স্থাননাম।

গোবিন্দধাম: বাঁকুড়া
পূর্বনাম কানিয়ামারা। জনশ্রুতি আছে, পূর্বে এই স্থানটি জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। কোনও একসময় এক নববিবাহিতা কন্যাকে তার আত্মীয়পরিজন পিত্রালয়ে পাঠানোর সময় এই জঙ্গলের পথে দস্যুদল দ্বারা আক্রান্ত হয়। দস্যুরা নববিবাহিতা কন্যাকে হত্যা করে তার গায়ের অলংকারাদি নিয়ে পালায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানের নাম হয় 'কন্যামারা', অপভ্রংশে 'কানিয়ামারা'। পরবর্তীকালে স্থানীয় কংগ্রেসি নেতা গোবিন্দপ্রসাদ সিংহের নামানুসারে স্থাননাম পরিবর্তন করে গোবিন্দধাম রাখা হয়েছে।

গোপালপুর: কোচবিহার
পূর্বনাম গোপালপাঠ। কোচবিহার রাজবংশ এই স্থানে একটি গোপাল-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করায় স্থানটি গোপালপাঠ নামে অভিহিত হয়। পরে অপভ্রংশে গোপালপুর হয়েছে।

গোপালপুর: বর্ধমান
বাংলার বিখ্যাত পাঁচালি লেখক দেবীপ্রসাদ রায়-এর বংশধর গোপালচন্দ্র রায় এই গ্রামটি পত্তন করেন বলে তাঁর নামানুসারে স্থাননাম হয় গোপালপুর।

গোপালপুর: বাঁকুড়া

পূর্বনাম 'খিলবাইদ'। ছাতনা থানার অন্তর্গত এই স্থানটি সম্বন্ধে জনশ্রুতি আছে, ছাতনা-রাজপরিবারের একজন একবার এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। পুরুলিয়ার মরারডিহি গ্রামের এক বৈদ্য ব্যাধি নিরাময় করেন। সেই কারণে নামমাত্র খাজনায় ছাতনা রাজপরিবার এই স্থানটি সেই বৈদ্যকে বন্দোবস্ত করে দেন। সেই বৈদ্যের কুল-দেবতা গোপাল-বিগ্রহের নামানুসারে এই স্থানের নাম পরিবর্তন করে গোপালপুর নামকরণ করা হয়। গোপালপুর নামে বাঁকুড়া জেলায় আরও উনিশটি স্থান আছে।

গোয়াড়ি: নদিয়া

গোচারণ অথবা গোপ সম্প্রদায়ের সঙ্গে জড়িত স্থাননাম। গোয়াড়ির পূর্বনাম 'গোপবাটিকা', অপভ্রংশে গোয়াড়ি হয়েছে। গোপবাটিকা শব্দের উৎপত্তি সম্ভবত Vappa-Ghosh-Vata appearing in the inscription of Jayanaga of Karna Suvarna, Central Bengal 6th-7th century. 'বাপ্পা-ঘোষ-বট' কথার বিবর্তিত রূপ।

প্রচলিত ছড়া:

গোয়াড়ির বাবু।
ফুলের ভারে কাবু ॥

* * *

মদ, মাগি, জুয়াড়ি,
এই তিনে গোয়াড়ি ॥

* * *

গাড়ি, ঘোড়া, সওয়ারি,
তিন নিয়ে গোয়াড়ি ॥

গোয়াল জান: মুর্শিদাবাদ

গোয়াল অর্থে গোরুর খাটাল সূচক অথবা গোয়ালাদের প্রতিষ্ঠিত স্থান। স্থান নামে 'জান' অন্ত্যপদের প্রয়োগের উল্লেখ Puspabhadra inscription of Dharmapala of Pragjyotisa, 12th century-তে পাওয়া যায়।

গোয়াস: নদিয়া

গোপ + আবাস = গোপবাস, অপভ্রংশে গোয়াস হয়েছে বলে অনুমিত।

গোস্বামী দুর্গাপুর: নদিয়া

কিংবদন্তি আছে যে পূর্বে এই স্থানটি জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। সেই জঙ্গলের মধ্যে কমলাকান্ত গোস্বামী নামে একজন সুদর্শন তরুণ সন্ন্যাসী বাস করতেন। একদিন একদল দস্যু স্থানান্তরে দস্যুবৃত্তি করে এই বনের মধ্যে এসে আশ্রয় নেয়। তৃষ্ণার্ত দস্যুরা সামনে সন্ন্যাসীকে দেখতে পেয়ে তাঁর কাছে জল খেতে চায়। সন্ন্যাসী তাঁর দৈবী ক্ষমতাবলে নিজের ছোট্ট একটি কমণ্ডলু থেকে জল দিয়ে সমস্ত দস্যুদলের তৃষ্ণা নিবারণ করেন। দস্যুদলের লুটের মধ্যে একটি রাধারমণ (কৃষ্ণ) বিগ্রহ ছিল। সন্ন্যাসীর অদ্ভুত ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হয়ে তারা সেই বিগ্রহটি সন্ন্যাসীকে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ দান করে। সন্ন্যাসীও বিগ্রহটি যথাবিধি পুজো করতে থাকেন। এই ঘটনার কিছুকাল পরে জয়দিয়ার রাজা মুকুট রায় নিজের তরুণী কন্যা দুর্গাবতীকে সঙ্গে নিয়ে শিকারে বেরোন এবং এই জঙ্গলে সেই সন্ন্যাসীর দেখা পান। তরুণ সন্ন্যাসীর সুন্দর মূর্তি ও গাম্ভীর্য দেখে রাজা বিশেষ মুগ্ধ হন এবং রাজকন্যাও তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। সন্ন্যাসীও রাজকন্যার রূপে বিমোহিত হয়ে যান। রাজা উভয়ের মনোভাব বুঝতে পেরে তাঁদের বিবাহের আয়োজন করেন এবং সেই জঙ্গলের মধ্যে একটি জনপদ পত্তন করে নাম দেন গোস্বামী দুর্গাপুর। পরবর্তীকালে রাজা মুকুট রায়ের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ রায় এই স্থানে একটি রাধারমণ মন্দির নির্মাণ করেন।

গোস্বামী মালিপাড়া: হুগলি

একসময় এই স্থানটি কেদারমতী নদীর গর্ভগত ছিল। কালক্রমে এই নদীগর্ভ থেকে যে চর উঠে আসে সেখানে স্থানীয় রাজা দ্বারপালের ফুলবাগান তৈরি হয়। প্রথমে রাজার মালিরা এই স্থানে বসবাস আরম্ভ করে এবং ক্রমে জনবসতি গড়ে উঠলে স্থাননাম হয় মালিপাড়া। কথিত আছে, গোস্বামী পদবিধারী কোনও স্থানীয় বাসিন্দার নামানুসারে স্থানটি গোস্বামী মালিপাড়া নামে পরিচিত হয়।

গোহালবেড়ে: হাওড়া

গোয়াল-এর অপভ্রংশে 'গোহাল' হয়েছে বলে অনুমিত। 'বেড়ে' অর্থ

চারিদিকে গাছপালা প্রভৃতির বেষ্টন বা আধিক্য বোঝায়। স্থাননাম গাছপালাবেষ্টিত গোহাল বা গোয়াল নির্দেশক।

প্রচলিত ছড়া:

হাড়ি, শুঁড়ি, নেড়ে,
তিনে গোহালবেড়ে ॥

গৌরডাঙা: বর্ধমান

গ্রাম্যদেবী গৌরচণ্ডীর নামানুসারে স্থাননাম গৌরডাঙা হয়েছে বলে অনুমিত।

গৌরীশাল: নদিয়া

গৌরীশাল এক বিশেষ জাতের ধানের নাম। সম্ভবত এই জাতীয় ধানের উৎপাদন-স্থান হওয়ার জন্য এই স্থাননাম হয়েছে।

ঘাটাল: পূ মেদিনীপুর

'ঘাঁটি' থেকে স্থাননাম ঘাটাল হয়েছে বলে অনুমিত। একসময় এখানে সৈন্যবাহিনীর ছাউনি ছিল বলে জানা যায়। একদা স্থানটি বরদা রাজার জমিদারদের রাজধানী ছিল। সেই সময় স্থানটি নিমতলা ঘাটাল নামে পরিচিত ছিল বলে জানা যায়। ১৭০২ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমানের রাজা চন্দ্রকোনা ও বরদা রাজার সংযুক্ত সৈন্যদলকে পরাজিত করে স্থানটি বর্ধমান রাজের আয়ত্তাধীনে নিয়ে আসেন। ঘাটাল সুতি ও সিল্ক বস্ত্রের জন্য খ্যাত ছিল এবং এখানকার পোড়ামাটির বাসনকোসনেরও সুখ্যাতি ছিল বলে জানা যায়। সুকুমার সেন জানাচ্ছেন, মুকুন্দরাম উল্লেখ করেছেন ঘাটুকাল গাছ থেকে ঘাটাল নামকরণ হয়েছে।

প্রচলিত ছড়া:

কাঠ, পাতা, চাল।
তিন নিয়ে ঘাটাল ॥

ঘাটেশ্বর: নদিয়া

স্থানীয় ঘাটেশ্বর লোকায়ত শিবের নামে স্থাননাম।

প্রচলিত ছড়া:

বাঁশ, বরশে, গাঁজাখোর।
তিন নিয়ে ঘাটেশ্বর ॥

ঘিয়াসাবাদ: মুর্শিদাবাদ

পূর্বনাম বদ্রিহাট। এই স্থানে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্য থেকে জানা যায় একদা এই স্থানে হিন্দুদের আধিপত্য ছিল। পরবর্তীকালে মুসলমান আমলে গৌড়ের নবাব সুলতান গিয়াসুদ্দিনের নামানুসারে স্থানের নাম পরিবর্তন করে ঘিয়াসাবাদ রাখা হয়। স্থানীয় একটি মুসলমান সমাধিস্থল সুলতান গিয়াসুদ্দিনের বলে অনুমিত। কিন্তু স্থানীয় লোকেরা এই সমাধিস্থলটি একজন মুসলমান সন্তের মরদেহের ওপর নির্মিত হয়েছে বলে মনে করেন।

ঘুম: দার্জিলিং

মূল নেপালি থেকে উদ্ভূত শব্দ। ঘাসপাতা ও বাঁশের ফালি দিয়ে তৈরি এক প্রকার ত্রিকোণীয় আচ্ছাদন বিশেষের স্থানীয় নাম 'ঘুম'। দুই পাহাড়ি ঢালের উপরে সরু চূড়ার মতো স্থান হবার জন্য স্থানের নাম 'ঘুম' হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। আর এক মতে এখানে পাহাড়ে এক তীক্ষ্ণ মোড় থাকায় স্থানের নাম 'ঘুম' হয়েছে। নিকটবর্তী প্রায় একশোফুট উঁচু একটি বিচ্ছিন্ন খণ্ডপাহাড় থেকে আদিবাসী রাজত্বকালে কয়েদিদের শাস্তি দেওয়ার জন্য ধাক্কা দিয়ে নীচে ফেলে দেওয়া হত বলে জানা যায়।

ঘূর্ণি: নদিয়া

জলঙ্গী নদীর 'বাঁক' থাকায় স্থাননাম ঘূর্ণি হয়েছে বলে অনুমিত। জলস্রোতে 'ঘূর্ণি' পেতে মাছ ধরার জন্য স্থাননাম 'ঘূর্ণি' হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। স্থানটি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বিখ্যাত বয়স্য গোপাল ভাঁড়-এর জন্মস্থান বলে জানা যায়। পোড়া মাটির মূর্তি ও মৃৎশিল্পের জন্য স্থানটি খ্যাত।

ঘোষপাড়া: নদিয়া

ঘোষ পদবিধারী কোনও স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নামানুসারে স্থাননাম হয়েছে বলে অনুমিত। স্থানটি 'নিত্যধাম' নামেও পরিচিত। একদা অধুনা বিলুপ্ত কর্তাভজা সম্প্রদায়ের কেন্দ্র ছিল। দোল উৎসবের সময় এখানে তিন দিন ব্যাপী আউল-বাউল সম্প্রদায়ের বিরাট মেলা হয়।

প্রচলিত ছড়া:

আয় ঘুম আয় ঘুম ঘোষপাড়া দিয়ে,
আসলে পরে খেতে দেব দই সন্দেশ চিঁড়ে।
দই আমার বায়না দিয়েছি,
খোকার চোখে ঘুম এনেছি।
গগনেতে গোল চাঁদ,
যত পারিস কাঁদ।
চাঁদ আকাশে ডুব দিল,
খোকাবাবুও ঘুমিয়ে পল ॥

* * *

কত দাই এসে ঘোষপাড়ায়,
মায়ের কৃপাবলে অবহেলে মন্দরোগ তাড়ায় ॥
ডুবে হিমসাগরের শীতল জলে,
দূর হয়ে যায় আপদবালাই ॥

চকসাপুর: বাঁকুড়া

জনশ্রুতি আছে, প্রায় চার শতাধিক বছর পূর্বে বাঁকুড়া জেলার পানশিউলি গ্রামে সুন্দর দাসমহন্ত নামে এক সাধু বাস করতেন। গ্রামের পাশের জঙ্গলে তিনি প্রায়ই শিকার করতে বেরোতেন। একবার তিনি ক্ষুধা-পিপাসায় কাতর হয়ে জঙ্গলে বিচরণ করার সময় এক বটগাছের তলায় এই ফকিরের দেখা পান। ফকিরের যত্নে সুন্দরদাস সন্তুষ্ট হয়ে ফকিরকে কিছু ভূ-সম্পত্তি দান করেন। পরবর্তীকালে ওই ফকির শা সাহেব পীর নামে খ্যাতি লাভ করেন এবং ক্রমে দানপ্রাপ্ত ভূখণ্ডে জনবসতি গড়ে উঠলে স্থাননাম হয় 'চক সা-পুর'।

চণ্ডীদাস নানুর: বীরভূম

সাবেক নাম নানুর। চতুর্দশ শতাব্দীর বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাসের জন্মস্থানরূপে খ্যাত স্থানটি বর্তমানে চণ্ডীদাস নানুর নামে পরিচিত। আদিতে বিশালাক্ষী দেবীর পূজারি এবং সাধকসঙ্গিনী 'রজকিনী রামী' ও চণ্ডীদাসের গল্প-গাথা বাংলায় সর্বজনবিদিত। (ছাতনা দেখুন)।

প্রচলিত ছড়া:

নানুরের মাঠে গ্রামের নিকটে
বাসুলী আছয়ে যথা।

তাহার আদেশ   কহে চণ্ডীদাস,
সুখ যে পাইবে কোথা।

চক্ষনজাদি: বর্ধমান
খান সাহেব নামে জনৈক অর্থশালী মুসলমান মৃত্যুকালে তাঁর কন্যাকে এই গ্রামখানি দান করেছিলেন বলে স্থানের নাম হয় 'চক খানজাদী', অর্থাৎ খানের কন্যাকে দেওয়া 'চক' বন্দোবস্ত করা স্থান। কালক্রমে নামটি অপভ্রংশে 'চক্ষনজাদি' হয়ে থাকবে।

চন্দননগর: হুগলি
গঙ্গাবক্ষ থেকে ধনুরাকৃতি ধূর্জটি ললাটে চন্দ্রকলার মতো এই স্থানের আকৃতি থাকায় চন্দ্র থেকে চন্দ্রনগর এবং পরে অপভ্রংশে চন্দননগর নাম হয়েছে বলে অনুমিত। অন্যমতে, চন্দন কাঠের ব্যাবসা বা প্রাচুর্য থেকে চন্দননগর নামের উৎপত্তি হয়েছে। হুগলি নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত এই স্থানটি একদা ফরাসিদের অন্যতম প্রধান উপনিবেশ ছিল। ১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট অওরঙ্গজেবের সময় থেকে লব্ধ সনদের বলে ফরাসিরা চন্দননগরের অধিকার লাভ করে এবং নানা রকম রাজনৈতিক বিপর্যয় সত্ত্বেও স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত চন্দননগর ফরাসিদের অধিকারে থাকে। জগদ্ধাত্রী পুজো এখানকার বিখ্যাত বাৎসরিক উৎসব।

চন্দনবাটী: মুর্শিদাবাদ
কথিত আছে, চন্দন শাহ নামে একজন পীর এই স্থানে বাস করতেন। সেই পীরের নামানুসারে স্থানের নাম চন্দনবাটী হয়েছে বলে জানা যায়।

চন্দ্রকোনা: পূ মেদিনীপুর
পূর্বনাম 'মানা'। অষ্টম শতাব্দীতে জনৈক বগরী রাজা খৈরা মল্ল এই স্থানের অধিপতি ছিলেন। সেই সময় চন্দ্রকেতু নামে এক রাজপুত্র পুরী যাওয়ার পথে নিকটস্থ এক জঙ্গলে আস্তানা গাড়েন। মধ্যযুগীয় বীরধর্মপূর্ণ আবেগে চন্দ্রকোনা রাজ খৈরা মল্লকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেন এবং তাকে পরাজিত করে এই স্থানটি নিজের অধিকারে আনেন। পরে নিজের নামানুসারে স্থানটির

নাম পরিবর্তন করে 'চন্দ্রকেতু' নামকরণ করেন। অন্যমতে মহাভারতের মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেনের সমসাময়িক 'চন্দ্রকেতু' নামে কোনও রাজা এখানে রাজত্ব করতেন এবং তাঁর নাম থেকেই স্থাননাম চন্দ্রকোনা হয়েছে।

প্রচলিত ছড়া:

বাহান্ন বাজার, তিপ্পান্ন গলি,
তবে জানবি চন্দ্রকোনা এলি ॥

চন্দ্রী: প মেদিনীপুর

স্থানীয় চন্দ্রশেখর শিব মন্দিরের নাম থেকে স্থানের নাম চন্দ্রী হয়েছে। মন্দিরটি ঝাড়গ্রামের রাজা কর্তৃক নির্মিত বলে জানা যায়।

চব্বিশ পরগনা

পশ্চিমবঙ্গের প্রেসিডেন্সি বিভাগের অধীনে জেলা। একদা কলিকাতার জমিদারি-র চব্বিশটি রাজস্বসংক্রান্ত বিভাগ সমন্বিত এই অঞ্চল চব্বিশ পরগনা জেলা নামে পরিচিত। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে ২০ ডিসেম্বর এক সন্ধির শর্তানুসারে বঙ্গের তদানীন্তন নবাব নাজিম মীরজাফর ইংরেজদের এই চব্বিশটি পরগনা অর্পণ করেন। পরগনাগুলির নাম (১) আকবরপুর (২) আজিমাবাদ (৩) বলিয়া (৪) বরিধারি (৫) বাসনন্ধরি (৬) কলিকাতা (৭) আমিরপুর (৮) দখিন সাগর (৯) গড় (১০) হাতিগড় (১১) ইখ্‌তিয়ারপুর (১২) খারিজুরি (১৩) খাসপুর (১৪) মৈদানমল অথবা মেদনিমল (১৫) মগুরা (১৬) মনপুর (১৭) মৈদা (১৮) মুড়াগাছা (১৯) পাইকান (২০) পিছাকুলি (২১) সতল (২২) শাহনগর (২৩) শাহপুর (২৪) উত্তর পরগনা।

সেই সময় এই সম্মিলিত অঞ্চল 'কলিকাতার জমিদারি' বা 'চব্বিশ পরগনার জমিদারি' নামে পরিচিত ছিল। তখন ইংরেজ এই অঞ্চলের শুধুমাত্র জমিদারি স্বত্ব প্রাপ্ত হন। ১৭৫৯ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির সম্রাট ক্লাইভকে ব্যক্তিগত ভাবে এই অঞ্চলের মালিকিস্বত্ব প্রদান করেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানি চিরস্থায়ী ভাবে স্বত্বাধিকারী হবে এই শর্তে জায়গির সনদ দান করেন। চব্বিশ পরগনা অঞ্চল পূর্বে মুঘল রাজ্যের শতগাঁও বা সপ্তগ্রাম সরকারভুক্ত ছিল। ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে যে মানচিত্র প্রস্তুত হয় তাতে এই অঞ্চল জলাভূমিরূপে দেখানো হয়। মহাভারত, রঘুবংশ, পুরাণ ইত্যাদি প্রাচীন গ্রন্থাদিতে এই গাঙ্গেয়

ব-দ্বীপাঞ্চলটি 'সুম' রাজ্য হিসেবে উল্লেখ পাওয়া যায়। রঘুবংশের সময় এই অঞ্চল 'বঙ্গ' জাতির অধিকারে আসে এবং তাঁরা গঙ্গার দ্বীপগুলির ওপর বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করেছিলেন বলে জানা যায়। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর টলেমির মানচিত্রে (Ptolemy's map) এই অঞ্চলকে অসংখ্য মোহনা বেষ্টিত ব-দ্বীপাকার দেখানো হয়। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন সাং এই অঞ্চলকে 'সমতট' নামে উল্লেখ করেছেন। 'সমতট' অঞ্চলের উল্লেখ একটি করদ সীমান্ত রাজ্যরূপে সমুদ্রগুপ্তের শিলালেখে (C. 300 AD) পাওয়া যায়। কনৌজের যশোবর্ধন এই অঞ্চলের 'বঙ্গ' রাজাকে পরাজিত করার উল্লেখ (C. 731 AD) প্রাকৃত কাব্য 'গৌড়-বহ'তে পাওয়া যায়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিপ্রদাসের কবিতায় বাংলার রূপকথার চাঁদ সওদাগরের আখ্যান থেকে এই অঞ্চলের বিশেষ ভৌগোলিক বিবরণ জানা যায়। কথিত আছে, চাঁদ সওদাগর আদিগঙ্গা দিয়ে সাগরে পড়ে সাত সমুদ্র অভিযানে যেতেন। আইন-ই-আকবরি থেকে জানা যায় ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে টোডরমল এই অঞ্চলের 'রাজস্ব' তালিকা (rent row) তৈরি করান। বর্তমানে প্রশাসনিক কারণে চব্বিশ পরগনা জেলাকে উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। ভৌগোলিক অবস্থান সত্ত্বেও প্রশাসনিক সুবিধের জন্য কলকাতা শহরকে জেলা শাসনের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে।

চাঁদপাড়া: বীরভূম

প্রচলিত ছড়া:

চাঁদপাড়া না ফাঁদপাড়া।
দেখেশুনে পা বাড়া ॥

চাঁদপুর: পূ মেদিনীপুর

কথিত আছে, পূর্বে এই স্থানে চাঁদরাজা নামে জনৈক ভূস্বামী বাস করতেন। গ্রামের উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে তিনি জনহিতের জন্য দুটি বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করান। চাঁদরাজার নামানুসারেই স্থাননাম চাঁদপুর হয়েছে বলে অনুমিত।

চাঁদমনি: দার্জিলিং

স্থানীয় চা-বাগানের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত একটি পার্বত্য নদীর মধ্যে এক জায়গায় প্রায় কুড়ি-পঁচিশ ফুট গভীর জলের খালের মতো স্থানকে স্থানীয়

অধিবাসীরা ‘মনি’ বলে অভিহিত করে। সম্ভবত এই স্থানে প্রতিফলিত চাঁদের রশ্মি থেকে স্থানের নাম চাঁদমনি হয়েছে।

চাঁপারুই: হুগলি
চাঁপা + রুই। চাঁপা বা চম্পক বৃক্ষ বা ফুলের সঙ্গে রুই বা রোহিত জাতীয় মাছের সঙ্গে স্থাননামের যোগসূত্র অস্পষ্ট। অন্য অর্থে রুই কথাটা বিত্তশালী ও প্রতিপত্তিশালী সম্প্রদায় বোঝায়। সে ক্ষেত্রেও ‘চাঁপা’-র সঙ্গে ‘রুই’-এর যোগাযোগের তাৎপর্য বোঝা যায় না।

চাকদহ/চাকদা: নদিয়া
প্রবাদ আছে যে, ভগীরথ যখন স্বর্গ থেকে কপিলমুনির শাপদগ্ধ তাঁর পিতৃপুরুষের অস্থি ও আত্মার মুক্তির জন্য গঙ্গাকে মর্তে আনয়ন করেন তখন তাঁর রথের চাকা এই স্থানে প্রোথিত হয়ে একটি গভীর খাদ সৃষ্টি হয় এবং সেই খাদ গঙ্গাজলে পূর্ণ হয়ে একটা ঘূর্ণাবর্ত ‘দহে’ পরিণত হয়। ‘চক্র’ দ্বারা সৃষ্ট খাদ বা ‘দহ’ থেকে স্থাননাম হয় ‘চক্রদহ’ যা পরে অপভ্রংশে চাকদহ বা চাকদা হয়েছে। কথিত আছে, প্রাচীনকালে এই স্থানের নাম ছিল ‘চক্রদ্বীপ’। একসময় এই স্থানের পাশ দিয়ে গঙ্গা প্রবাহিত ছিল। সেই সময় এখানে জলপথে একটি উন্নত বন্দর ছিল বলে জানা যায়। এখানকার স্থানমাহাত্ম্য সম্বন্ধে জানা যায় যে, গঙ্গাসাগরের মতো লোকে এখানেও গঙ্গাপ্রবাহে শিশু সন্তান নিক্ষেপ করত এবং মুক্তিপ্রাপ্তির আশায় চক্রদহে জলে ডুবে প্রাণ বিসর্জন দিত। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে মহারাজ মানসিংহ যখন মহারাজ প্রতাপাদিত্যকে দমন করার জন্য বাংলায় আসেন তখন তাঁর সৈন্যদলকে ঝড়বৃষ্টির জন্য কয়েকদিন এই স্থানে অপেক্ষা করতে হয়েছিল বলে জানা যায়।

প্রচলিত ছড়া:

চূর্ণী মৌনা হোলো গঙ্গা চলিতে লাগিল,
স্রোতভরে চক্রদহে আসি উত্তরিল।
ভগীরথ রথচক্র বালুকায় পশি,
অচল হইয়ে রহে চক্রদহে বসি।
সেই হেতু এই স্থানের চক্রদহ নাম,

গর্জনীয় জনমাঝে ভোগ মোক্ষধাম ॥
(সুরধুনী কাব্য, দীনবন্ধু মিত্র)

* * *

নগদা কড়ি।
চাকদা বাড়ি ॥

চাতরা: মুর্শিদাবাদ

শোনা যায় গ্রামের পশ্চিম দিকে প্রবাহিত ভৈরব নদীর তীরে চাঁইমণ্ডল সম্প্রদায়ের পূর্বপুরুষেরা বসবাস করতেন। এই চাঁইমণ্ডল সম্প্রদায় এই অঞ্চলে 'চাতরা' নামে অভিহিত হতেন। অনেকে মনে করেন 'চাতরা' সম্প্রদায় থেকে স্থাননাম চাতরা হয়েছে। শোনা যায় আদি চাতরা নামক স্থানটি প্রায় শতাধিক বৎসর পূর্বে ভৈরব নদীর ভাঙনে বিলুপ্ত হয়ে যায়। বর্তমানে পুরাতন চাতরা 'চর চাতরা' নামে অভিহিত হয়।

চাতরা: হুগলি

শ্রীরামপুরের পশ্চিমে অবস্থিত চাতরা গ্রামের পূর্বনাম ছিল 'ছত্রপুর'। অপভ্রংশে চাতরা হয়েছে। জনৈক বাসুদেব ভট্টাচার্যের নামানুসারে স্থানটি বাসুদেব নামেও উল্লিখিত হয়। কথিত আছে, এই বাসুদেব ভট্টাচার্য এখানকার একটি মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁর পুত্র পিতার প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের সঙ্গে মন্দির নির্মাণ করে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। কিংবদন্তি আছে, চাতরার রুদ্র পণ্ডিত সংসার ত্যাগ করে বল্লভপুরের অরণ্যময় অঞ্চলে গিয়ে তপস্যা করার সময় স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে গৌড়ের সুলতানের শয়নকক্ষ থেকে একটি প্রস্তরখণ্ড এনে শ্যামসুন্দর, রাধাবল্লভ ও নন্দদুলাল নামে তিনটি বিগ্রহ তৈরি করিয়েছিলেন। বল্লভপুরের প্রাচীন রাধাবল্লভ মন্দিরে রাধাবল্লভ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে বলে জানা যায়। খড়দহ খ্যাত নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরভদ্র গোস্বামীর আগ্রহে শ্যামসুন্দর বিগ্রহ খড়দহে প্রতিষ্ঠিত হয়। (খড়দহ দেখুন)।

চান্না: বর্ধমান

প্রচলিত ছড়া:

গেলি যদি চান্না,
তো ঘরে উঠলো কান্না ॥

চাপাইটাঁড়: পুরুলিয়া

শব্দটি অস্ট্রিক। স্থানীয় ভূ-প্রকৃতি ও উৎপন্ন দ্রব্যের সঙ্গে জড়িত স্থাননাম। টাঁড় অর্থ পল্লী বা পাড়া।

চামটা: কুচবিহার

এই স্থানের অপর নাম গুঞ্জরীর চাওরা। কথিত আছে, প্রাচীন কালে এই গ্রামের পাশ দিয়ে প্রবাহিত মালদা নদীতীরে সাধ্বী স্ত্রীলোকগণ স্বামীর মৃত্যুর পর একই চিতায় সহমরণ বরণ করতেন। সতীঘাট নামে পরিচিত এই স্থানে গুঞ্জরী নাম্নী জনৈকা সাধ্বীর সহমরণ উপলক্ষে স্থানের নাম হয় গুঞ্জরীর চাওরা। স্থানীয় ভাষায় নদীর উপকূলবর্তী উঁচু স্থানকে 'চাওরা' বলে। সম্ভবত 'চাওরা'র অপভ্রংশে স্থাননাম 'চামটা' হয়েছে।

চামটা: নদিয়া

নদিয়া জেলার এই স্থানটির নাম সম্ভবত 'চামুণ্ডা'র অপভ্রংশে 'চামটা' হয়েছে। অন্যমতে 'চর্মট' নামক একপ্রকার গাছের নাম অথবা 'চর্মবর্ত', অর্থ শুষ্ক স্থান, থেকে অপভ্রংশে 'চামটা' হয়েছে।

চারকল গ্রাম: বীরভূম

পূর্বনাম কলগ্রাম। কথিত আছে, পূর্বে এই স্থানে কলিঙ্গ নামক জনৈক রাজার রাজধানী ছিল। তাঁর নামানুসারে স্থাননাম কলগ্রাম হয়। অজয় নদের চরাভূমিতে অবস্থিত বলে পরবর্তীকালে স্থানটি চরকলগ্রাম নামে পরিচিত হয়। পরে অপভ্রংশে চারকলগ্রাম হয়েছে।

চালানী পাক: জলপাইগুড়ি

ধান পরিষ্কার করবার গোলাকৃতি 'চালানি'র মতো দেখতে বলে স্থাননাম 'চালানী পাক' হয়েছে বলে অনুমান করা হয়।

চিঁচুড়িয়া: নদিয়া

'চঞ্চট' নামক এক প্রকার আগাছার সঙ্গে জড়িত স্থাননাম। 'চঞ্চট'-এর অপভ্রংশে চিঁচুড়িয়া হয়েছে বলে মনে হয়।

চিতুরী: বীরভূম
পূর্বনাম চিতড়ি খতা, অপভ্রংশে 'চিতুরী' হয়েছে। 'চিতুড়ি-খতা' (Citaḍi-khata) নামের উল্লেখ Sundarban copper plate of Laksmana-Sena, Central Bengal, 12th century-তে পাওয়া যায়।

চিনিদানা: হুগলি
প্রচলিত ছড়া:

পুণ্ডুয়াতে তাড়ি ভালো, চিনিদানার ছুঁড়ি।
চ্যাংনাতে হাঁড়ি ভালো, দিনাজপুরের মুড়ি ॥

চিলকিগড়: প মেদিনীপুর
চিলকিগড়ে গাজন উপলক্ষে ছৌনাচ হয়।
প্রচলিত ছড়া:

ছিঁড়া জালে মাছ ধরে ধলভূয়্যানী।
চুন-দকতায় ভুলাই রাখে চিলকিগড়্যানী ॥
ঘরে ভাত নাই পান খায় ঝড়গাঁগড়্যানী।
উঁচু কপালে সিঁদুর পরে বেল্যাবেড়ানী ॥

চুঁচুড়া: হুগলি
পূর্বনাম 'কুলিহাণ্ডা'। পরবর্তীকালে ধরমপুর বা ধর্মপুর নামেও পরিচিত হয়। ওলন্দাজগণের সঙ্গে সংশ্রবের জন্যই এই স্থানের প্রসিদ্ধি। পূর্বের ইতিহাস কিছু জানা যায় না। ১৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে ওলন্দাজেরা এই স্থানে ব্যাবসাবাণিজ্য করবার জন্য একটি ছোটখাটো উপনিবেশ স্থাপন করে। তারা জায়গার নাম দেয় চিনসুরা যা পরে অপভ্রংশে চুঁচুড়া হয়। এই নামকরণের কোনও সম্ভাব্য কারণ জানা যায় না। এক মতে 'ক্ষুদ্র' কথা থেকে 'চুঁচুড়া' উদ্ভূত হয়েছে, কিন্তু এই যুক্তির কোনও ন্যায়সংগত কারণ বোঝা যায় না। ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে যখন ইউরোপে ভীষণ যুদ্ধ শুরু হয় তখন একদল ইংরেজ সৈন্য চুঁচুড়া অধিকার করে। ১৮১৪ সালে ইউরোপে সন্ধিস্থাপন হলে স্থানটি ওলন্দাজদের প্রত্যার্পণ করা হয়। পরের বছর ওলন্দাজরাজ সুমাত্রার বিনিময়ে ইংরেজকে চুঁচুড়া প্রদান করেন। চুঁচুড়ায় ভাগীরথী তীরে ষণ্ডেশ্বর নামে এক প্রাচীন শিবলিঙ্গ

আছে। জনৈক শিবভক্তিপরায়ণ ব্যক্তি স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে ভাগীরথীতে জাল ফেলে যণ্ডেশ্বর শিব সহ ভৈরব বিগ্রহ্ নামে খ্যাত সাতটি গোলাকৃতি শিলা একটি ত্রিশূল এবং পূজাপদ্ধতির বিবরণ লিখিত একটি তাম্রপাত্র উদ্ধার করেন।

প্রচলিত ছড়া:

গুলিখোর কিবা ঢঙ,
দেখতে যেন চুঁচুড়োর সঙ ॥

চুমুল হরি: দার্জিলিং
তিব্বতি নাম। অর্থ দেবীর পাহাড়ি আবাস।

চুয়াপাল: প মেদিনীপুর
চয়া - চুহা - ইঁদুরের সঙ্গে জড়িত স্থাননাম। স্থাননামের অন্ত্যপদে 'পাল' শব্দের প্রয়োগের উল্লেখ Puspabhadra inscription of Dharmapala of Pragjyotisa, 12th century-এ পাওয়া যায়।

চেঙ্গমারী: জলপাইগুড়ি
কথিত আছে, চেঙদাস নামে কোনও বিত্তবান ব্যক্তি এই স্থানে এসে প্রথম বসবাস আরম্ভ করেন, সেই কারণে স্থাননাম চেঙ্গমারী হয়েছে। অন্য মতে, এই স্থানের জলা ডোবায় চ্যাং নামে এক রকম মাছের আধিক্য থেকে চেঙ্গমারী স্থাননাম হয়েছে।

চৈতন্যপুর: বর্ধমান
কথিত আছে, চৈতন্যদেব দেশ পরিভ্রমণ কালে পার্শ্ববর্তী গ্রামে অচৈতন্য হয়ে পড়েন। তাঁর শিষ্যগণ যখন চৈতন্যদেবকে এই গ্রামে নিয়ে আসেন তখন তাঁর চৈতন্য ফিরে আসে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গ্রামের নামকরণ চৈতন্যপুর হয় বলে অনুমিত।

চৈতা: মালদহ

প্রচলিত ছড়া:

চৈতা, মস্তাপুর,
মুখ চড়চড়,
পুকুর দূর ॥

চোংটং: দার্জিলিং
মূল লেপচা থেকে উদ্ভূত শব্দ। অর্থ— দুই জলধারার সংমিশ্রণ স্থান।

চোপানী: জলপাইগুড়ি
চম্পা বা স্থানীয় ভাষায় 'ছাপা' গাছের আধিক্য বা বাগান সূচক স্থাননাম।

চোরপুনি: বর্ধমান
চোরের সঙ্গে জড়িত স্থাননাম। কিন্তু অন্ত্যপদে 'পুনি' শব্দের অর্থ বা যোগসূত্র অস্পষ্ট। স্থাননামে 'পুনি' অন্ত্যপদের ব্যবহারের উল্লেখ Puspabhadra inscription of Dharmapala of Pragjyotish, 12th century-এ পাওয়া যায়।

চোরপোতা: নদিয়া
জনশ্রুতি আছে, এক সময় এখানে এক চোর ধরা পড়ে এবং মারধর করে তাকে খালের ধারে পুঁতে ফেলা হয়। তাই থেকে স্থাননাম চোরপোতা হয়েছে বলে অনুমিত।

চোলা: দার্জিলিং
তিব্বতি থেকে উদ্ভূত স্থাননাম। চোলা অর্থে জাঁকালো গিরিপথ। উচ্চতা এবং কষ্টকর গিরিপথের জন্য এইরূপ স্থাননাম হয়ে থাকবে। অন্য মতে চোলা অর্থ হ্রদবহুল গিরিপথ। এই স্থানে একত্রে অনেকগুলি ছোট ছোট হ্রদ ছিল বলে জানা যায়।

চৌদ্দচূলী: পূ মেদিনীপুর
প্রায় তিন শতাধিক বছর আগে জঙ্গলাকীর্ণ এই স্থানে স্থানীয় 'মাইতি' ও 'কর' বংশের পূর্বপুরুষেরা তদানীন্তন রাজার কাছ থেকে জমিদারি 'বন্দোবস্ত' নিয়ে এখানে বসবাস আরম্ভ করেন। লবণ ব্যবসায়ের উপযোগী স্থান হিসাবে বহু লবণ ব্যবসায়ীও এখানে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করে। কথিত আছে, এখানে লবণ তৈরি করার জন্য চৌদ্দটা চুল্লী ছিল বলে স্থানের নাম হয় চৌদ্দচূলী।

ছাতনা: বাঁকুড়া
ক্ষত্রিয় অর্থাৎ ছত্রিদের নগর ছত্রিনগর অপভ্রংশে ছাতনা হয়েছে বলে অনেকে

মনে করেন। অন্য মতে এই অঞ্চলে পূর্বে বহু ছাতিম গাছের বন ছিল বলে স্থাননাম ছাতনা হয়েছে। কথিত আছে, সতীর কোনও অঙ্গ পড়েছিল বলে প্রাচীন কালে এই স্থানের নাম ছিল বাসুলী বা বাহুল্যনগর। ছাতনা একদা প্রাচীন সামন্তভূমের রাজধানী ছিল বলে জানা যায়। কিংবদন্তি বিজড়িত সামন্তভূমের সঠিক ইতিহাস অন্ধকারে আচ্ছন্ন। বারোজন দুর্ধর্ষ সামন্ত সামন্তভূমের প্রতিষ্ঠাতা বলে জানা যায়। সামন্তদের আরাধ্যাদেবী ছিলেন বাসুলী এবং তাঁদের রাজধানী ছিল বাহুল্যনগর। কথিত আছে, বাসুলীদেবীর অনুগ্রহলাভেই সামন্তেরা স্থানীয় ব্রাহ্মণ রাজাকে হত্যা করে রাজ্য স্থাপনে সক্ষম হন। আরও শোনা যায় যে এই বারো জন সামন্ত সর্দারের একজন মাত্র পত্নী ছিলেন এবং তাঁর গর্ভে একটি মাত্র কন্যা জন্মগ্রহণ করে। সেই কন্যাকে তাঁরা এক শ্রীক্ষেত্র তীর্থযাত্রী রাজপুত যুবকের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তার ওপর রাজ্যের ভার অর্পণ করেন। সেই রাজপুত বাহুল্যনগর বা বর্তমান ছাতনায় রাজধানী স্থাপন করে রাজকার্য পরিচালনা করতেন।

ছাতনার গ্রামদেবী বাসুলীদেবীর মন্দির এবং তার সঙ্গে বিজড়িত কবি চণ্ডীদাসের এক রোমাঞ্চকর আখ্যান আছে। কথিত আছে, স্থানীয় হাটতলার কাছে বোলপুকুর নামে একটি জলাশয়ের পাড়ে বাসুলীদেবী শিলারূপে দীর্ঘ দিন ধরে পড়ে ছিলেন। একদা ব্যাবসা উপলক্ষে হাটে আগত কিছু ব্যবসায়ী সেই শিলার ওপর মশলা পিষে রন্ধনাদি করে এবং পরে শিলাটি তাদের কাজে লাগবে ভেবে ফেরার সময় নিজেদের গোরুর গাড়িতে তুলে যাত্রা করে। সেই রাত্রেই তদানীন্তন ছাতনার ক্ষত্রিয় রাজা হামীরউত্তর স্বপ্নে জানতে পারেন যে দেবী বাসুলী ওই শিলায় নিহিত আছেন এবং তাঁর পুজোর ব্যবস্থা করতে হবে। স্বপ্নাদেশ পেয়ে রাজা হামীরউত্তর তৎক্ষণাৎ ব্যবসায়ীদের গাড়ি থেকে ওই শিলাখণ্ড উদ্ধার করেন এবং দেবীর প্রতিষ্ঠার আয়োজন করেন। কিন্তু সমস্যা উপস্থিত হয় দেবীর পূজারি নিয়োগে। বাসুলীদেবীর আদেশ চণ্ডীদাস তাঁর পূজারি হবেন। কিন্তু সেই সময় চণ্ডীদাস রজকিনি রামীর সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ের জন্য নিন্দিত দেশত্যাগী। দ্বিতীয়ত, এই ব্যভিচারী ব্যক্তিকে কীভাবে রাজা দেবীর পূজারি নিযুক্ত করেন। সেই সমস্যার নিরসন স্বয়ং বাসুলীদেবীই করেন। দেবী রাজাকে নির্দেশ দিলেন 'যেই রামী সেই আমি।' এই নির্দেশ পেয়ে রাজা চণ্ডীদাসকে পূজারি নিযুক্ত করেন। বাসুলীদেবীর কৃপায় ধন্য চণ্ডীদাস পদাবলী কীর্তন রচনা করে যশস্বী হন।

প্রচলিত ছড়া:

চলহ বিয়াই ছাতনা
ছাতনাতে দেখে অ্যালাম ছেলেক
ডুডুম বাজনা ৷৷

ছাতিন্দা: পূ মেদিনীপুর

প্রচলিত ছড়া:

ধা, ধিন, ধিনধা।
এই নিয়ে ছাতিন্দা ৷৷

ছোট কলিকাতা: হাওড়া

(কলিকাতা দেখুন)।

জগৎপুর: বর্ধমান

প্রচলিত ছড়া:

মোঘল, মুগরো, জগৎপুর,
বানের জলে ভাসে।
সোনার মাদানগর
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসে ৷৷

জঙ্গল: নদিয়া

এই স্থান কখনও বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল কি না জানা যায় না, যা থেকে সম্ভবত স্থানের নাম জঙ্গল হয়ে থাকবে। অনেকের মতে এই স্থানের ছোট ছোট কৃষিজমিতে বেশি আল থাকায় 'জঙ্গাল' নাম হতে পারে। পরে 'জঙ্গাল' থেকে অপভ্রংশে জঙ্গল হয়েছে বলে মনে করা হয়।

জঙ্গলীটোলা: মালদহ

কথিত আছে, এখানকার জঙ্গলে জঙ্গলীপীর নামে এক মুসলমান সন্তের আবাস ছিল বলে স্থানের নাম জঙ্গলীটোলা হয়েছে। অন্য মতে স্থানটি একদা 'সখীভাব বৈষ্ণব' সম্প্রদায়ের কেন্দ্রস্থল ছিল। এই সম্প্রদায়ের সদস্যরা

সকলেই অবিবাহিত থাকার শপথ নিয়ে স্ত্রীবেশে নেচে গেয়ে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করতেন। এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা জঙ্গালীর নামেই এই স্থানের নাম জঙ্গলীটোলা হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।

জঙ্গিপুর: মুর্শিদাবাদ
কিংবদন্তি অনুসারে স্থানটি জাহাঙ্গীর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাঁর নামের অপভ্রংশে জঙ্গিপুর নাম হয়। এই স্থানের বালিঘাটা পাড়াটি মহাকবি বাল্মীকির নাম থেকে হয়েছে বলে জনপ্রবাদ আছে। নদীর ধারে একটি প্রাচীন বটগাছ দেখিয়ে লোকে বলে ওই স্থানে কবি স্নান করতেন।

জজান: মুর্শিদাবাদ
প্রচলিত ছড়া:

জজান, পাঁছথুপী, মহাস্থান
পেটে ভাত নাই, মুখে পান ॥

* * *

পোঁদে মাছি
জজান যেচ্ছি (যাচ্ছি) ॥

জটেশ্বর: জলপাইগুড়ি
গ্রামে প্রতিষ্ঠিত জটেশ্বর শিবের নামানুসারে স্থাননাম। কথিত আছে, এক জটাধারী সন্ন্যাসী এই শিবের শিলামূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন বলেই শিবের জটেশ্বর নাম হয়।

জনাই: হুগলি
প্রচলিত ছড়া:

বাগবাজারের রসগোল্লা, মোল্লাচকের দই,
জনাই-এর মনোহরা, যশোরের কই ॥

জয়কৃষ্ণপুর: বীরভূম
প্রচলিত ছড়া:

জয়কৃষ্ণপুর ডুবুডুবু
খাঁড়গা ভাসে।

সোনার গ্রাম বাগপাড়া
চিলেয় (চিলেকোঠায়) বসে বসে হাসে।

জয়কৃষ্ণপুর: মুর্শিদাবাদ

প্রচলিত ছড়া:

গাঁজা গুলি খ্যাপা কুকুর
এ তিন নিয়ে জয়কৃষ্ণপুর ॥

জয়নগর মজিলপুর: দ চব্বিশ পরগনা

বর্তমানে লুপ্তস্রোতা আদি গঙ্গার পশ্চিমে জয়নগর নামে প্রাচীন স্থান ছিল। মজে যাওয়া আদি গঙ্গার ভূখণ্ডের ওপর নতুন গ্রামের পত্তন হলে স্থানের নাম হয় মাজিলপুর এবং ক্রমে ক্রমে জয়নগর মজিলপুর নামে পরিচিত হয়।

প্রচলিত ছড়া:

কাশীর মালাই খ্যাত, জয়নগরের মোয়া!
রানাঘাটের পানতুয়া, নবদ্বীপের খোয়া ॥

জয়পুর: নদিয়া

প্রচলিত ছড়া :

টোল আছে জয়পুরে
দিনরাত টিকি নড়ে।
দশ গাঁয়ের ছেলে পড়ে ॥

জয়পুর: পুরুলিয়া

প্রচলিত ছড়া:

চোর, ছিনাল (গণিকা), কুকুর,
তিন নিয়ে জয়পুর ॥

জয়পুর: মুর্শিদাবাদ

কথিত আছে, আকবরের সময় এই স্থানে জয়বর্ধন বা জয়রায় নামে এক

জায়গিরদার বাস করতেন। সেই জায়গিরদারের নামানুসারে স্থাননাম জয়পুর হয়েছে বলে অনুমিত।

জরুল: বর্ধমান
জাতালি অর্থাৎ জারুল গাছের নাম থেকে উদ্ভূত স্থাননাম। এই স্থানের উল্লেখ Nidhanpur copper plate of Bhaskara-Varman of Kamrup, Central Bengal 7th century-তে পাওয়া যায়।

জলপাইগুড়ি: জলপাইগুড়ি
কথিত আছে, একসময় এই স্থানে প্রচুর জলপাই গাছের বন ছিল বলে স্থাননাম জলপাইগুড়ি হয়েছে।

প্রচলিত ছড়া:

'কাটা' 'মারি' 'গুড়ি'
তিনে জলপাইগুড়ি ॥

জলাপাহাড়: দার্জিলিং
নেপালি থেকে উদ্ভূত স্থাননাম অর্থে আগুনে জ্বলা পাহাড়। লেপচারা এই স্থানকে 'কুঙ্গ-গোল হ্লো' (Kung-gol-hlo) নামে অভিহিত করে। অর্থ— ভূপতিত জঙ্গলের পাহাড়। একদা এই পাহাড়ি এলাকার সমস্ত জঙ্গল আগুন লেগে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। তা থেকে জলাপাহাড় স্থাননাম হয়েছে।

জলাহারি: প মেদিনীপুর
বলা হয় যে, এই স্থানের দুটি বাঁধ সারা বছর জলে ভরা থাকত এবং গ্রামবাসীদের কখনওই প্রয়োজনীয় জলের অভাব হয়নি। সেই কারণে স্থানের নাম জলাহারি হয়েছে বলে অনুমিত।

জলুইডাঙা: বর্ধমান
জনশ্রুতি আছে, গ্রামটি পূর্বে ভাগীরথী নদীর চরাভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রথম দিকে এখানে জেলেরা বাস করত বলে স্থানের নাম হয় 'জেলেডাঙা', যা পরে 'জলুইডাঙা' হয়েছে।

জয়পুর: হাওড়া

প্রচলিত ছড়া :

জয়পুরের চোপা, খালনার খোঁপা,
আমতার টান।
কোঁদল দেখবি যদি
রামচন্দ্রপুরের মেয়ে আন ॥

জহরাতলা: মালদহ

কথিত আছে, সেন রাজাদের আমলে এই অঞ্চলটি ঘন জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। মালদহ জেলার সংলগ্ন বিহারে কিছু কিছু দুর্দান্ত প্রকৃতির দস্যু বিভিন্ন স্থান থেকে লুঠপাট করে যে সমস্ত ধনরত্ন পেত তা এই বনের মধ্যে জড়ো হয়ে নিজেদের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করে নিত। এই দস্যুদলই বনের মধ্যে এক চণ্ডীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে তাঁকে পুজো করত এবং মন্দিরের আশেপাশে মাটির নীচে লুণ্ঠিত ধনরত্ন পুঁতে রাখত। ধনরত্নের হিন্দি শব্দ জওহর থেকেই সম্ভবত দেবী চণ্ডীর নাম হয় জওহর বা অপভ্রংশে জহরা মা এবং জহরা মায়ের স্থান বলে কালক্রমে স্থাননাম হয় জহরাতলা।

জাগুলী: নদিয়া

প্রচলিত নাম জাগুলিয়া। কথিত আছে, এই স্থানে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের বসবাস হেতু একদা যাগযজ্ঞাদি হত। যজ্ঞস্থল থেকে প্রথমে স্থাননাম হয় যজ্ঞস্থলী। যা পরে অপভ্রংশে জাগুলী হয় বলে অনুমিত। অন্য মতে, জাঙ্গলিক থেকে জাগুলী নাম হয়েছে। জাঙ্গলিক মানে বেদে। বেদে বা জাঙ্গলিকদের আবাসস্থল থেকে স্থাননাম হয় 'জাঙ্গুলী', যা থেকে অপভ্রংশে জাগুলী হয়েছে। অন্য আর এক মতে জাগুলিয়া অর্থে 'জাঙ্গলী' যার অর্থ— মনসার অবস্থান এবং জাঙ্গলিক অর্থে সাপেকাটার রোজাদেরও বোঝায়। এখানে একসময় রোজাদের বসবাস ছিল বলেও জানা যায়। জাঙ্গাল অর্থে বাঁধ বা সেতুও বোঝায়। জাঙ্গাল থেকে জাগুলী স্থাননাম হওয়াও সম্ভব।

জানো: দার্জিলিং

তিব্বতি থেকে উদ্ভূত স্থাননাম। তিব্বতি ভাষায় স্থানটিকে 'জা-ও-পুং-রি'

(Ja-o-Pung-ri) বলে, অর্থ পাহাড়ে রামধনুর মেলা। সংক্ষেপে 'জা-ও' যা কথিত ভাষায় 'জানো'-তে রূপান্তরিত হয়।

জামতারা: বাঁকুড়া

অসমান ও অনুর্বর জমিকে স্থানীয় লোকেরা 'তড়' বলে। একটি ঢলের ওপর অবস্থিত 'তড়' ভূখণ্ডে একদা এখানে কিছু জামগাছ থাকায় স্থাননাম জামতারা হয়েছে বলে অনুমিত।

জামালপুর: বর্ধমান

মুঘল সম্রাট শাহজাহানের সম্রাজ্ঞী মমতাজ। পূর্বনাম আর্জুমন্দ বানু। তাঁর পূর্ব স্বামী ওমরাহ জামাল খাঁর নামানুসারে স্থাননাম জামালপুর হয়েছে বলে অনেকে অনুমান করেন। অন্য মতে শাস্ত্রে শিব ও রুদ্রের যুগল মূর্তিকে 'যামাল' বলে। স্থানীয় প্রখ্যাত 'বুড়রাজ ঠাকুর' শিব ও রুদ্রের প্রতীকরূপে পূজিত হয় বলে স্থানটি আদিতে 'যামালপুর' নামে পরিচিত ছিল, যা পরে অপভ্রংশে জামালপুর হয়েছে। কথিত আছে, বহু বছর আগে এই স্থানের গভীর জঙ্গলে পার্শ্ববর্তী নিমদা গ্রামের যাদু ঘোষালের শ্যামলী গাই নির্বিবাদে কাঁটাবনের মধ্যে গিয়ে একটি মাটির ঢিবির ওপর দুগ্ধ বর্ষণ করত। সেই স্থানেই 'বুড়রাজ ঠাকুরের' আবির্ভাব হয়। শিবজ্ঞানে পূজিত এবং সর্বরোগহারী বাবা নামে মহিমান্বিত বুড়রাজ ঠাকুর অলৌকিক ক্ষমতার জন্য বিশেষ খ্যাত। জাতিধর্ম নির্বিশেষে তাঁর দরবারে ধরনা দেওয়া এবং রোগ নিরাময়ের অনেক চমকপ্রদ কাহিনি শোনা যায়।

জালালপুর: মালদহ

সুলতান সামসুদ্দিনের পুত্র নাসিরুদ্দিন দিল্লির সম্রাট হওয়ার পর কুত্তলু খাঁ ওরফে জালালুদ্দিন খাঁকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। সম্ভবত তাঁর নামানুসারে স্থাননাম জালালপুর হয়েছে।

জাহান্নগর: বর্ধমান

কথিত আছে, একদা এখানে জাহ্নুমুনির আশ্রম ছিল বলে স্থানের নাম হয় জহ্নুনগর। পরে অপভ্রংশে জাহান্নগর হয়।

জিনতপুর: উ দিনাজপুর

শোনা যায় বহুকাল পূর্বে এখানকার জঙ্গলের মধ্যে জিনপরিদের আড্ডা ছিল। সম্ভবত জিনপরি থেকে স্থাননাম জিনতপুর হয়ে থাকবে। কেউ কেউ অনুমান করেন, পরবর্তীকালে জমজম খাঁ নামে এক পীর এই জঙ্গলে সাধনভজন করতেন বলে তাঁর নামানুসারে স্থানের নাম জিনতপুর হয়েছে।

জিরাট: হুগলি

ফারসি শব্দ 'জীরায়ৎ' থেকে 'জিরাৎ' এবং পরে অপভ্রংশে জিরাট হয়েছে বলে অনুমিত। 'জীরায়ৎ' অর্থে আবাদি জমি বা ফসল ক্ষেত্র। গ্রামটি আনুমানিক পাঠান যুগে পত্তন হয়েছে বলে জানা যায়। অন্য মতে, এই স্থানের গোপীনাথজিউর মন্দিরের জন্য স্থানটি বৈষ্ণবতীর্থে পরিণত হয় এবং গোপীনাথজীউর 'জীউ' থেকে জীরট নাম হয়েছে বলে অনেকে অনুমান করেন। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পৈতৃক বাস ছিল জিরাট গ্রামে।

সুকুমার সেন 'বাংলার স্থান নাম', বইয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, 'জিরাট < জিরেট = হাট যাবার পথে বিশ্রাম স্থান?'।

জিয়াগঞ্জ: মুর্শিদাবাদ

প্রাচীন নাম গাম্ভীলা। শোনা যায় বিন্ধ্যাচলের প্রধান পাণ্ডা গোঁসাইবংশীয়া 'জয়া' নামক জনৈক বৃদ্ধা এখানে এসে ভাগীরথীর তীরে বাস করেন। তাঁর অনুরক্ত স্থানীয় বাসিন্দাগণ সেই বৃদ্ধার নামানুসারে এই স্থানের নাম পরিবর্তন করে জিয়াগঞ্জ রাখেন। একদা গাম্ভীলা বৈষ্ণবদের প্রিয়স্থান ছিল। খেতুরিয়া রাজবংশোদ্ভব নরোত্তমদাস ঠাকুরের শিষ্য পণ্ডিত গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী এখানে বাস করতেন। প্রবাদ আছে যে, এই স্থানেই নরোত্তম ঠাকুর মহাপণ্ডিত গঙ্গানারায়ণের অনুরোধে চিতাশয্যা থেকে উঠে আসেন এবং তারপরে অতি অদ্ভুত ভাবে তাঁর অন্তর্ধান ঘটে। এই প্রসঙ্গে 'নরোত্তমবিলাসে' পাওয়া যায়:

বুধরি হইতে শীঘ্র চলিলা গাম্ভীলে।
গঙ্গা স্নান করিয়া বসিলা গঙ্গাকূলে ॥
আজ্ঞা কৈল রামকৃষ্ণ গঙ্গানারায়ণে।
মোর অঙ্গ মার্জন করহ দুই জনে ॥
দোহে কিবা মার্জন করিব পরশিতে।
দুগ্ধ প্রায় মিশাইল গঙ্গার জলেতে ॥

জীয়ৎকুণ্ড: মুর্শিদাবাদ

এই স্থানে একটি প্রাচীন জলাশয়ের নাম 'জীয়ৎকুণ্ড'। সেই থেকেই স্থাননাম জীয়ৎকুণ্ড হয়েছে। স্থানটি জীয়ৎকুঁড়ি নামেও পরিচিত। জীয়ৎকুণ্ড সম্বন্ধে কিংবদন্তি আছে, স্থানীয় অত্যাচারী তিয়র রাজকে দমন করবার জন্য বাদশা হোসেন শাহ একদল সৈন্য পাঠান। কিন্তু তিয়র রাজার দুর্গের মধ্যে একটা কুণ্ড ছিল যার জল মৃত সৈনিকদের শরীরে ছিটিয়ে দিলে তারা পুনর্জীবন লাভ করত। তিয়র রাজার জনৈক অনুচর বিশ্বাসঘাতকতা করায় হোসেন শাহ-এর সেনাদলের একজন গোপনে দুর্গে ঢুকে গিয়ে ওই কুণ্ডে গোমাংস ফেলে কুণ্ডের জল অপবিত্র করে দিলে সেই জলের সঞ্জীবনী শক্তি লোপ পায় এবং অবশেষে তিয়র রাজের পতন ঘটে।

জোর পোখারি: দার্জিলিং

মূল নেপালি থেকে উদ্ভূত স্থাননাম, অর্থ এক জোড়া পুকুর বা জলাশয়।

জোরপুকুরিয়া: মুর্শিদাবাদ

কথিত আছে, একদা এই স্থানটি একটি প্রকাণ্ড বিলের দ্বারা বেষ্টিত ছিল। বর্ষাকালে বন্যার জলে জায়গাটি ডুবে যেত। এই বন্যার প্রকোপ থেকে রক্ষা পাবার জন্য স্থানীয় বাসিন্দারা চারপাশে জোড়া জোড়া পুকুর খনন করে বলে সম্ভবত স্থানের নাম জোরপুকুরিয়া হয়েছে।

জোরবাংলা: দার্জিলিং

মূল নেপালি থেকে উদ্ভূত স্থাননাম। কথিত আছে, পূর্বে এখানে মাত্র এক জোড়া বাংলো ছিল। সেইজন্য এই প্রকার নাম।

জৌগ্রাম: বর্ধমান

অতীতে এই গ্রামের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত দামোদরের কোনও শাখা নদী গ্রামটিকে দু'ভাগে বিভক্ত করে রাখত। কালক্রমে নদীটি মজে গেলে দু'ভাগ একজোট হয়ে যায় বলে স্থানীয় লোকেরা গ্রামটিকে 'যোগগ্রাম' নামে অভিহিত করত। ক্রমে 'যোগগ্রাম' অপভ্রংশে জৌগ্রাম হয়েছে বলে অনুমিত।

ঝাড়গ্রাম: প মেদিনীপুর

এই স্থাননামের উৎপত্তি সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না। একদা এই অঞ্চল জঙ্গলাকীর্ণ ছিল এবং এখানে পাইক ও চুয়াড় প্রভৃতি দস্যুবৃত্তিধারী জাতি বাস করত। একদা দস্যুঅধ্যুষিত এই অঞ্চল প্রাচীন মল্লভূম রাজের অধিকারে আসে বলে জানা যায়। ঝাড়গ্রামের গড়ে রাজবংশের অধিষ্ঠাত্রী সাবিত্রীদেবীর একটি প্রাচীন মন্দির আছে। সাবিত্রীদেবী ও তাঁর মন্দির সম্বন্ধে একটি রোমাঞ্চকর কাহিনি জানা যায়। কথিত আছে, সাবিত্রীদেবী মানবী ছিলেন। পিতামাতার সঙ্গে ওড়িশা যাবার পথে ঝাড়গ্রামের কাছে তৎকালীন এক দস্যুসর্দার দ্বারা লুণ্ঠিত হয়ে বাল্যকাল থেকে তিনি তার গৃহে লালিত পালিত হন। নিজেকে তিনি 'সবিতার দাসী সাবিত্রী' নামে পরিচয় দিতেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তাঁর অপরূপ রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে দস্যুসর্দারের পুত্র তাঁকে বলপূর্বক আয়ত্ত করার চেষ্টা করে। কিন্তু দৈব প্রেরিত খড়্গের সাহায্যে তিনি আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হন। ইতিমধ্যে ঝাড়গ্রাম রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দস্যুদের পরাজিত করে ঝাড়গ্রাম অধিকার করে নেন। ঝাড়গ্রামের নবীন রাজাও সাবিত্রীদেবীর সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে তাঁকে বিয়ে করতে চান। অনেক পীড়াপীড়ির পর সাবিত্রী এই প্রস্তাবে সম্মত হন। কিন্তু বিয়ের দিন অপরাহ্নে তিনি সমস্ত অলংকার ত্যাগ করে একাকিনী অদূরবর্তী শালবনের দিকে চলতে আরম্ভ করেন। রাজা এই খবর পাওয়া মাত্র তাঁর অনুসরণ করেন। সাবিত্রীদেবী শালবন পার হয়ে এক বালুকা-প্রান্তরে পৌঁছলে রাজা শশব্যস্তে তাঁর দীর্ঘ কেশগুচ্ছ ধরে ফেলেন। সেইসময় হঠাৎ চারদিক থেকে বালুকা রাশি এসে সাবিত্রীদেবীকে ঢেকে ফেলে। রাজাও বালুর মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছেন দেখে তাঁর অনুচরেরা রাজাকে জোর করে সরিয়ে নিয়ে আসে। সাবিত্রীদেবীর একগুচ্ছ কেশ রাজার হাতে থেকে যায়। তারপর স্বপ্নাদেশ পেয়ে রাজা সাবিত্রীদেবীর কেশগুচ্ছ ও খড়্গ মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে নিত্যপূজার ব্যবস্থা করেন।

ঝাড়বড়গিলা: জলপাইগুড়ি

'ঝাড়' অর্থে জঙ্গল এবং 'বড়' এক প্রকার লতাগাছের ফলের শক্ত এবং মোটা বীজ যার সাহায্যে ধোপারা জামা-কাপড় গিলে করার কাজ করে। সেই রকম লতাগাছের জঙ্গল সূচক স্থাননাম।

ঝান্টিপাহাড়ি: বাঁকুড়া

এই স্থানের পার্বত্য অঞ্চলের ঘন দুর্গম ঝাঁন্টি বন পরিষ্কার করে রেলস্টেশন ও জনবসতি গড়ে উঠলে স্থাননাম হয় ঝান্টিপাহাড়ি। কথিত আছে, একসময় এখানকার ঝাঁন্টি বনে চিতাবাঘ দেখা যেত।

ঝালদা: পুরুলিয়া

এই স্থানে প্রবাহিত 'সালদা' নদীর নাম থেকে স্থাননাম ঝালদা হয়েছে বলে অনুমিত। অন্য মতে স্থানীয় আদিবাসীদের কাঁচা মাংস খাওয়ার অভ্যাস, যাকে সাঁওতালি ভাষায় 'ঝিল্লিম' (Ghillim) বলে তা থেকে স্থাননাম 'ঝালদা' হয়েছে।

প্রচলিত ছড়া:

গো-গাড়ি বলদা-বেলদা
দুই নিয়ে ঝালদা।

টাঁকশালী: নদিয়া

কথিত আছে, মুগগিসউদ্দিন উজবক বাংলা বিজয়ের স্মারক হিসেবে একটি টাঁকশালা স্থাপন করে এক বিশেষ শ্রেণির মুদ্রা প্রচলন করেন। সেই টাঁকশালা সম্ভবত এই স্থানে স্থাপিত ছিল। টাঁকশাল থেকে স্থাননাম টাঁকশালী হয়েছে বলে অনুমিত।

টাকবার: দার্জিলিং

মূল লেপচা থেকে উদ্ভূত স্থাননাম। টাক + বার। 'টাক' অর্থে মাছ ধরার ছিপের সুতো এবং 'বার' অর্থে বড়শি। বড়শির মতো আকারের জন্য এই প্রকার স্থাননাম হয়েছে বলে অনুমিত।

টাকি: উ চব্বিশ পরগনা

প্রচলিত ছড়া :

টাকির মেয়ের টকটকানি,
উলপুরের মেয়ের ঘরভাঙানী ॥

টানাদিঘি: নদিয়া

সন্নিহিত জলাশয়ের একটানা দৈর্ঘ্য বেশি থাকার জন্য এইরকম স্থাননাম হয়েছে বলে অনুমিত।

টুঙ্গী: নদিয়া

এখানকার জলাভূমি অঞ্চলে এক সময় টোং বেঁধে মানুষ বাস করত। ক্রমে জনপদ গড়ে ওঠে। টোং থেকে স্থাননাম হয়েছে টুঙ্গী।

টেন্ডং: দার্জিলিং

লেপচা থেকে উদ্ভূত স্থাননাম। অর্থ **উর্ধ্ব**গামী শিংরূপী পাহাড়। লেপচা সম্প্রদায়ের এক পবিত্র স্থান। কিংবদন্তি আছে, আদিতে যখন এক ভয়াবহ বন্যায় সবকিছু ভেসে যাচ্ছিল তখন লেপচা জাতির লোকেরা এই পাহাড়ের ওপর আশ্রয় নেয়। বন্যার জল যতই বাড়তে থাকে এই পাহাড় চূড়াও ততই উপরে উঠতে থাকে। এইভাবে এই পাহাড়ে আশ্রিত লেপচা জাতির প্রাণ রক্ষা পায়।

টোপলা: নদিয়া

বড়শিতে গাঁথা মাছের টোপ থেকে স্থাননাম 'টোপলা' হয়েছে বলে অনুমিত। যদিও যোগসূত্র অস্পষ্ট।

ট্যাংরা: নদিয়া

এক সময় নিকটবর্তী জলাশয়ে প্রচুর ট্যাংরা মাছ পাওয়া যেত বলে 'ট্যাংরা' স্থাননাম হয়েছে। নদিয়া জেলায় ট্যাংরা নামে চারটি স্থান আছে। কলকাতাতেও 'ট্যাংরা' স্থাননাম আছে।

ঠাকুরবাড়ি: বীরভূম

প্রচলিত ছড়া:

কাজে কম ভোজন ভারী,
বাস তার ঠাকুরবাড়ি ॥

ডাকাতগাড়ির মাঠ: নদিয়া

এক প্রবীণ কৃষকনেতা বিশ্বনাথের নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের স্মৃতিবিজড়িত স্থান। ইংরেজদের দ্বারা 'ডাকাত' বলে আখ্যাত বিশ্বনাথের নামানুসারে স্থানটি ডাকাতগাড়ির মাঠ নামে পরিচিত।

প্রচলিত ছড়া:

মেট্টেরির রুদ্রনাথ।
ডাকাতগাড়ির বিশ্বনাথ ॥

(রুদ্রনাথ- · নদিয়ার রাঘব রায় প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ ও মন্দির)
(বিশ্বনাথ- · নীল বিদ্রোহের সংগ্রামী নেতা বিশ্বনাথ)

ডানকুনি: হুগলি
বসতির দক্ষিণ কোণের পল্লী বা অংশের বর্ধিতাকার স্থান হিসাবে স্থাননাম ডানকুনি হয়েছে বলে অনুমিত। সুকুমার সেন জানিয়েছেন, একরকম আগাছা, সংস্কৃতে শঙ্খপুঞ্জিকা থেকে ডানকুনির উদ্ভব।

ডাবুক: বীরভূম
স্থানীয় ডাবুকেশ্বর নামে খ্যাত অনাদি শিবলিঙ্গ থেকে স্থাননাম 'ডাবুক' হয়েছে। অন্য মতে ডাবুক নাম থেকেই স্থানীয় শিবের নাম ডাবুকেশ্বর হয়েছে।

ডালিং: দার্জিলিং
তিব্বতি থেকে উদ্ভূত স্থাননাম। অর্থ, 'তির্যক স্থান' অথবা তিরের মাথার মতো স্থান। এই পাহাড়ি স্থানটি তির্যকাকারে একটি পাহাড়ের ওপর অবস্থিত বলে এই প্রকার নাম হয়েছে।

ডালিংকোট: দার্জিলিং
কালিম্পং-এর দক্ষিণ-পূর্বে ভুটান সীমান্তের সংলগ্ন ভুটানি দুর্গ 'ডালিং' থেকে স্থাননাম ডালিংকোট হয়েছে বলে অনুমিত।

ডায়মন্ডহারবার: দ চব্বিশ পরগনা
স্থানীয় নাম হাজিপুর। বাণিজ্যজাহাজ নোঙর করার সুবিধাজনক স্থানের জন্য ইংরেজরা এই স্থানের ডায়মন্ডহারবার নামকরণ করেন।

প্রচলিত ছড়া:

যত আছে মামলাবাজ।
তারা যায় বন্দের ঘাট (ডায়মন্ডহারবার) ॥

ডিঙ্গেল: নদিয়া

ডোঙ্গল থেকে ডিঙ্গেল হয়েছে বলে অনুমিত। 'ডোঙ্গল' অর্থে উঁচু নলখাগড়া। সম্ভবত কোনও সময় এখানে উঁচু নলখাগড়ার জঙ্গল ছিল।

ডিছু: দার্জিলিং

ডি + ছু। 'ডি' বোডো শব্দ। অর্থ সম্ভবত 'ঢাকা' এবং 'ছু' ভুটিয়া শব্দ— অর্থ 'জল'। স্থানটি জলঢাকা নামেও পরিচিত।

ডেভিস আবাদ: দ চব্বিশ পরগনা

শোনা যায় ইংরেজ রাজত্বের প্রথম দিকে ডেভিস নামে একজন ইংরেজ এখানকার জঙ্গল কেটে প্রথম গ্রাম পত্তন করেন। তাঁর নামানুসারেই স্থানের নাম ডেভিস আবাদ হয়েছে।

ডোংগকা-লা: দার্জিলিং

মূল তিব্বতি থেকে উদ্ভূত নাম। লা অর্থ হিমায়িত গিরিপথ। কথিত আছে, প্রায় ১৮০০০ ফুট উঁচু এই গিরিপথে রাতের বেলায় একটি ইয়াক-এর দল প্রচণ্ড ঠান্ডায় জমে বরফ হয়ে গিয়েছিল।

ঢনঢনিয়া: নদিয়া

প্রবাদ আছে যে, এখানকার মাঠে একদা তরবারি যুদ্ধ হয়েছিল। অসির ঝনঝনিয়া থেকে সম্ভবত স্থাননাম হয় ঝনঝনিয়া, যা পরে অপভ্রংশে 'ঢনঢনিয়া' হয়েছে।

তমলুক: পূ মেদিনীপুর

তমলুক নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানারকম তথ্য পাওয়া যায়। মহাভারতে স্থানটি 'তাম্রলিপ্ত' নামে উল্লিখিত হয়েছে। ভারতকোষে 'তাম্রলিপ্ত', ত্রিকাণ্ডকোষে 'বেলাকূল', 'তাম্রলিপ্ত', 'তাম্রলিপ্তি' ও 'তমলিকা', হেমচন্দ্র অভিধানে 'দামলিপ্ত', 'তমালিনী' ও 'বিষ্ণুগৃহ', শব্দরত্নাবলীতে 'তমোলিপ্ত' এবং শব্দকল্পদ্রুমে 'তমোলিপ্ত', নাম দেখতে পাওয়া যায়। চিন দেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজকদের গ্রন্থে স্থানটি 'তমোলিপি' এবং 'তম্নোলিতি' নামে অভিহিত

হয়েছে। এইসব নামের অপভ্রংশে পরে 'তমলুক' নাম হয়েছে। তৎকালীন বাংলার রাজধানী তমোলিপ্ত বা তাম্রলিপ্ত থেকেই দক্ষিণ ভারতের তামিল জাতির পত্তন ও নামকরণ হয়েছিল বলে পণ্ডিতজনেরা মনে করেন। দ্রাবিড় দামল বা তামিল জাতির আদি আবাসস্থল তাম্রলিপ্তির আদি নাম সম্ভবত 'দামলিপ্ত' ছিল। এক মতে দ্রাবিড় সভ্যতার প্রাধান্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে আর্যগণ এই নগরকে 'তমোলিপ্ত' বা 'অন্ধকারাচ্ছন্ন' বা 'পাপেজড়িত' স্থাননামে অভিহিত করত। আর্যরা দ্রাবিড় বা দামল জাতিকে 'অসুর' বলে গণ্য করতেন। সম্ভবত তাদের পরাজয়ের পরেই আর্যরা এই স্থানকে তাম্রলিপ্ত বা তাম্রলিপ্তি নামে অভিহিত করে। কথিত আছে, অসুরগণকে নিধনকালে কল্কি রূপধারী বিষ্ণুর দেহ থেকে ঘর্ম নির্গত হয়ে এই স্থানে পতিত হওয়ায় এই স্থানটিকে পবিত্র স্থান বলে মনে করে অনেকেই। সেইজন্য একদা স্থানটি 'বিষ্ণুগৃহ' নামেও পরিচিত হয়। অনেকের মতে মহাভারতোক্ত তাম্রধ্বজ রাজার রাজধানী এই তাম্রলিপ্ততে ছিল। বৌদ্ধ গ্রন্থ মহাবংশে পাওয়া যায় যে খ্রিস্টপূর্ব ৩০৭ অব্দে তাম্রলিপ্ত প্রসিদ্ধ সামুদ্রিক বন্দর ছিল এবং এখান থেকেই পবিত্র বোধিদ্রুম সিংহলে পাঠানো হয়েছিল। কথিত আছে, যে বছর বুদ্ধদেব মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন সেই বছর বাংলার রাজা সিংহবাহুর পুত্র বিজয় সিংহ তামলিপ্তে তৈরি জাহাজ নিয়ে সিংহল দ্বীপ জয় করেন। বিজয় সিংহের নাম থেকেই সিংহল নামের উৎপত্তি বলে অনেকে মনে করেন। জৈন, বৌদ্ধ এবং সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে এই স্থানের বারবার উল্লেখ পাওয়া যায়। টলেমির (Ptolemy) বিবরণে (C 150 AD) এই স্থানটি 'টামালাইটিস' (Tamalites) নামে উল্লিখিত হয়েছে এবং সমুদ্রের সন্নিকটবর্তী হওয়ার জন্য চিন, জাপান ইত্যাদি জায়গায় যাবার জন্য তদানীন্তন কালের প্রধান বন্দররূপে বর্ণিত হয়েছে। একদা গৌরবান্বিত আদি তাম্রলিপ্ত নদীগর্ভে বিলুপ্ত হয়ে গেছে বলে অনেকে মনে করেন।

প্রচলিত ছড়া:

খায় দায় থাকে সুখে,
বাড়ি তার তমলুকে ৷৷

* * *

বারো বাসন তেরে দা।
যে বলতে পারে সে তমলুকের ছা ৷৷

তাজপুর: উ দিনাজপুর
গ্রামে তাজ ও বাজ নামে দুই পীরের সমাধি আছে। বৈশাখ মাসে একদিনের জন্য এখানে বহু প্রাচীন একটি মেলা বসে— যা, তাজবাজ পীরের মেলা নামে প্রসিদ্ধ। স্থানটির নাম তাজবাজ না হয়ে শুধু তাজপুর কেন হল তা অস্পষ্ট।

তাজপুর: হাওড়া
তাজ খাঁ মসলন্দসাহেব নামে এক পীরের নামানুসারে এই স্থানের নাম তাজপুর হয়েছে বলে অনুমিত।

তাজপুর: হুগলি
হুগলি জেলায় দুটো তাজপুর আছে। যা বড় তাজপুর ও ছোট তাজপুর নামে পরিচিত। বড় তাজপুর 'ভারতবর্ষ' গল্পখ্যাত সাহিত্যিক এস ওয়াজেদ আলির জন্মস্থান।

তামাজুড়ি: প মেদিনীপুর
তামা বা তাম্রখনি সম্বন্ধিত স্থাননাম। এই স্থানে তাম্রযুগের নিদর্শন হিসাবে একখানি তামার কুঠার ফলক খনন করে পাওয়া গিয়েছিল বলে জানা যায়। সম্ভবত সেই কারণে তামাজুড়ি নাম হয়েছে।

তাম্বূলদহ: দ চব্বিশ পরগনা
স্থাননামের অর্থ পানপাতা পূর্ণ দহ বা জলাশয়। সম্ভবত তাম্বূলহ্রদ-এর অপভ্রংশে তাম্বূলদহ হয়েছে।

তারকেশ্বর: হুগলি
তারকনাথ অনাদি স্বয়ম্ভূ শিবলিঙ্গ থেকে স্থাননাম তারকেশ্বর হয়েছে। বর্তমানে যে জায়গায় মন্দিরটি অবস্থিত, আগে সেখানে জঙ্গলে আবৃত একটি উঁচু ভূখণ্ড এবং চারদিকের নিচু জমিতে নলখাগড়ার বন ছিল। উঁচু ভূভাগ সিংহদ্বীপ নামে পরিচিত ছিল। তারকনাথের প্রকাশ সম্বন্ধে একটি প্রচলিত কাহিনি আছে। নিকটবর্তী রামনগর রাজবাড়ির গোরক্ষক মুকুন্দ ঘোষ একদিন লক্ষ করলেন, তাঁর পালের একটি গাভি গভীর অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করে একটি শিলাস্তম্ভের

কাছে দাঁড়ালে তার বাঁট থেকে আপনি দুধ ঝরে শিলার ওপর পড়ছে। তিনি এই সংবাদ রামনগরের রাজা বিষ্ণুদাসের ভ্রাতা সাধক ভারমল্লকে জানালে তিনিও গোপনে এই অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন এবং ঘটনাটি রাজার কর্ণগোচর করেন। রাজা এই শিলাটি তুলে এনে রামনগরে প্রতিষ্ঠা করার আয়োজন করেন। কিন্তু সেইসময় ভারমল্ল স্বপ্নাদেশে জানতে পারেন যে ওই শিলা সামান্য শিলা নয়। স্বয়ং তারকনাথ অনাদি স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গ। সুতরাং ওই শিলাকে তোলবার বৃথা চেষ্টা না করে উভয় ভ্রাতা ওই স্থানেই মন্দির নির্মাণ করে তারকনাথের নিত্যসেবার জন্য ভূসম্পত্তি দেবোত্তর করে দেন এবং মুকুন্দ ঘোষ থেকেই তারকনাথের প্রথম প্রকাশ বলে তাঁকেই তারকনাথের প্রথম সেবক নিযুক্ত করেন। শোনা যায় মন্দির প্রতিষ্ঠার পূর্বে গভীর বনজঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত এই অনাদি শিবলিঙ্গকে সামান্য পাথর জ্ঞানে গ্রাম্য স্ত্রীলোকগণ বহু বছর যাবৎ শিবলিঙ্গের ওপর ধান ভানতেন। যার ফলে শিবলিঙ্গের উপরি ভাগে গর্ত হয়ে যায়, যা আজও বিদ্যমান। বর্তমান শিবলিঙ্গের ওপরে মধ্যস্থলে রুপোর চাকতি (পূজারিরা বলেন ডেক) দ্বারা ঢাকা যে গর্তটি দেখা যায় তা ওই ধান ভানবার জন্য হয়েছে বলে প্রবাদ আছে। তারকেশ্বর বিশেষ জাগ্রত বলে খ্যাত। তারকেশ্বরের মন্দিরে 'ধরনা' বা 'হত্যে' দিয়ে লোকে বহু দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভ করেছে বলে শোনা যায়। পশ্চিমবাংলার অন্যতম প্রধান শৈবতীর্থ তারকেশ্বরে প্রত্যহ বহু যাত্রীর সমাগম হয়। তবে সর্বাপেক্ষা অধিক জনসমাগম হয় শিবরাত্রি ও পাঁচ দিন ব্যাপী মূল চৈত্রসংক্রান্তি উৎসবের সময়।

তারাগুনিয়া: উ চব্বিশ পরগনা

কিংবদন্তি আছে, রওশন বিবি নাম্নী এক ধর্মপ্রাণ মহিলা বহুকাল পূর্বে সুদূর বাগদাদ থেকে বাংলাদেশে আসেন। একবার নৌকাযাত্রাকালে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং বুঝতে পারেন যে তাঁর অন্তিম সময় এসে গেছে। তিনি তাঁর অনুচরদের বলেন, যে স্থানে দিনান্তে পশ্চিম আকাশে তারা দেখা যাবে সেই স্থানেই তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করবেন এবং তখন যেন তাঁকে সেইখানেই সমাধিস্থ করা হয়। এক সন্ধ্যায় রওশন বিবি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন এবং তাঁর অনুচরগণ এই স্থানে নদীর ধারে কবর খুঁড়ে সেই ধর্মপ্রাণ মহিলার দেহ সমাহিত করে। সেই সময় থেকে স্থাননাম হয় তারাগুনিয়া।

অন্য মতে, এক সময় এই গ্রামের পূর্বদিক দিয়ে ইছামতী নদী প্রবাহিত ছিল। নদী এতই চওড়া ছিল যে সারাদিনে একবারের বেশি খেয়া নৌকা পারাপার করা সম্ভব হত না। খেয়ার পাটুনি ভোরে কাকের ডাক শুনে নৌকা ছাড়ত এবং সন্ধ্যায় আকাশে তারা দেখা দিলে এপারে ফিরে আসত। জনশ্রুতি আছে, এই কারণেই নাকি নদীর অপর পারের নাম হয় কাকডাকা বা কাকডাঙা আর এপারের নাম হয় তারাগোনা বা অপভ্রংশে তারাগুনিয়া।

তারাজুলি: হুগলি

প্রচলিত ছড়া:

যদি পেরুলি তারাজুলি,
তবে বুঝবি ঘরকে এলি ॥

তারাপীঠ: বীরভূম

পূর্বনাম চণ্ডীপুর এবং স্থানটি আগে শ্বাপদসংকুল জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। কিংবদন্তি আছে মুর্শিদাবাদের এক ব্যবসায়ী ব্যাবসা উপলক্ষে এই জঙ্গল পার হওয়ার সময় পথ হারিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে থাকেন। ক্রমে রাত্রি হয়ে গেলে সেই ব্যক্তি জঙ্গলের জন্তু-জানোয়ার ভূত-প্রেতের ভয়ে অচেতন হয়ে পড়েন। কিন্তু একনিষ্ঠ শক্তির উপাসক হওয়ার জন্য অরণ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সেই ব্যক্তিকে জঙ্গলের হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের হাত থেকে রক্ষা করেন। পরদিন সকালে সেই ব্যক্তি জ্ঞান ফিরে পেয়ে 'তারা' 'তারা' বলে জেগে ওঠেন। ইতিমধ্যে দেবী সেই জঙ্গলের জমিদার প্রখ্যাত পুঁটিয়ার রানি ভবানীকে স্বপ্নাদেশ দেন যে, এই জঙ্গলের মধ্যে আমবাগানে তাঁর স্মৃতিতে একটি মন্দির নির্মাণ করা হোক। এক বছরের মধ্যেই মন্দির তৈরি হয় এবং সেই একনিষ্ঠ শাক্ত ব্যবসায়ীর উচ্চারিত 'তারা' শব্দ থেকে স্থাননাম হয় 'তারাপুর', যা পরে 'তারাপীঠ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। স্থানমাহাত্ম্য সম্বন্ধে কিংবদন্তি আছে, দক্ষযজ্ঞকালে বিষ্ণুচক্রে ছিন্ন হয়ে সতীর নেত্রমণি বত্রিশযোজন অন্তর ত্রিভুজাকৃতিকারে তিনটি স্থানে পড়েছিল। সতীর বাম নেত্রমণি মিথিলার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ভাগীরথীর উত্তরে ত্রিযুগী নদীর পূর্বতীরে, দক্ষিণ নেত্রমণি করতোয়া নদীর পশ্চিম তীরে বগুড়ায় এবং উর্ধ্বনেত্রমণি বীরভূম জেলার দ্বারকা নদীর পূর্বতীরে পতিত হয়েছিল। ত্রিযুগী নদীর তীরে 'নীল সরস্বতী'

তারা, করোতোয়া নদীর তীরে 'একজটা' তারা আর বীরভূমে দ্বারকা নদীর তীরে 'উগ্রতারা' নামে পরিচিত। এই কারণে বীরভূমের তারাপুর একটি পীঠস্থানরূপে গণ্য হয়। কারও কারও মতে বশিষ্ঠমুনি এই স্থানে 'তারা'রূপে সতীর আরাধনা করেছিলেন বলেই স্থানমাহাত্ম্য। কিন্তু অনেকের ধারণা বশিষ্ঠমুনি সতীর পীঠস্থানরূপে গণ্য বলেই এই স্থানে সতীর আরাধনা করা মনস্থ করেন। বাংলায় 'তারা'-কে শক্তির প্রতিমূর্তি দুর্গা, কালী, চণ্ডী, অথবা চামুণ্ডারূপে পূজা করা হয়। সাধক কবি রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত এবং বামদেব (বামাখ্যাপা)-র সঙ্গে তারাপীঠের যোগসূত্র বাংলায় সর্বজনবিদিত।

প্রচলিত ছড়া:

নলহাটিতে মা ললাটেশ্বরী,
লাভপুরে মা ফুল্লরা।
সাঁইথিয়ায় মা নন্দেশ্বরী,
তারাপীঠে মা জয় তারা ॥
বোলপুরে কঙ্কালীতলা,
বক্রেশ্বরে মা'র পায়ের তলা।
এই ছয় পীঠ নিয়ে বীরভূমের বড় গলা ॥

তারাবাঁধা: দার্জিলিং

এই অঞ্চলের অধিবাসীরা ফাঁকা জায়গায় দু'প্রান্তে দুটি বাঁশের খুঁটি পুঁতে তার ওপরে বাঁশ পেতে অথবা দড়ি বেঁধে ভিজে কাপড় শুকোনোর ব্যবস্থা করে। স্থানীয় অধিবাসীদের এই ব্যবস্থাকে তারবাঁধা বলে। সেই থেকে স্থানের নাম তারাবাঁধা হয়েছে।

তালড়ী: বর্ধমান

তলাড়ী থেকে তালড়ী হয়েছে। 'তলাড়ী' নামের উল্লেখ Naihati copper-plate Of Vallala-Sena early 12th century-তে পাওয়া যায়।

তালদি: দ চব্বিশ পরগনা

তালদ্বীপ থেকে অপভ্রংশে তালদি হয়েছে। তাল বা খেজুর বনের দ্বীপ সূচক স্থাননাম।

তালেশ্বরগুড়ি: জলপাইগুড়ি
গ্রামদেবতা তালেশ্বরের নামানুসারে স্থাননাম। অন্য মতে, বিশালকায় তালগাছ থেকে স্থাননাম তালেশ্বর হয়েছে।

তিওড়খালি: নদিয়া
মূল নেপালি থেকে উদ্ভূত স্থাননাম। অর্থ তিন পাহাড় বিশিষ্ট স্থান।

তিনধারিয়া: নদিয়া
তিওড় বা তীর সম্প্রদায় বিশেষের স্থানসূচক নাম। এক মতে তিন সংখ্যাবাচক স্থাননাম। আবার কারও কারও মতে তিয়ড় জাতীয় একপ্রকার আগাছার সঙ্গে জড়িত স্থানের নাম।

তিরিহানা: দার্জিলিং
মূল নেপালি থেকে উদ্ভূত নাম। অর্থ, জলজ লতাগুল্ম পূর্ণ জলাভূমি বা তরাই জলাভূমি।

তুঙ্গভূম: বাঁকুড়া [অধুনা লুপ্ত]
রাইপুর থানার দক্ষিণাঞ্চল একদা তুঙ্গভূম নামে পরিচিত ছিল। প্রায় সাত-আটশো বছর আগে এই স্থানে নকুর টুঙ্গ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর নামেই অঞ্চলটি তুঙ্গভূম নামে পরিচিত হয়। কিংবদন্তি আছে, তদানীন্তন ওড়িশা দেশের পুরীর রাজা তুঙ্গ দেও জগন্নাথদেবের স্বপ্নাদেশ পান যে, তাঁর বংশধরেরা পুরীর রাজত্ব থেকে বঞ্চিত হবেন। কিন্তু যদি তাঁর প্রজন্ম অন্য কোনও নাম নিয়ে অন্য কোনও প্রদেশে প্রস্থান করে তা হলে সেখানকার রাজত্ব লাভ করতে পারবে। স্বপ্নাদেশ অনুসারে তুঙ্গ দেও-এর নাতি গঙ্গাধন তুঙ্গ-এর পুত্র নকুর তুঙ্গ নাম নিয়ে কিছু সৈন্যদল এবং ধনরত্ন সঙ্গে নিয়ে নতুন রাজত্বের সন্ধানে দেশ ভ্রমণে বেড়িয়ে পড়েন। প্রায় দশ বৎসর যাবৎ নানাদিকে ঘোরাঘুরি করার পর তিনি বাংলায় বর্তমান বাঁকুড়া জেলার টিকারাপড়া নামক এক স্থানে বসতি স্থাপন করেন। ক্রমে তিনি এই অঞ্চলের রাজা বলে মান্যতা পান। তাঁর নামানুসারেই এই অঞ্চলের নাম হয় তুঙ্গভূম।

তুরোয়া: প মেদিনীপুর

'তুরকোয়া' থেকে অপভ্রংশে তুরোয়া হয়েছে। 'তুরকোয়া' নামের উল্লেখ 'আইন-ই-আকবরি'তে পাওয়া যায়। এই স্থানে জঙ্গলের মধ্যে একসময় একটি কেল্লা ছিল বলে আইন-ই-আকবরি থেকে জানা যায়।

তুলসীবেড়িয়া: হাওড়া

কথিত আছে, বহু পূর্বে এখানে বহু বিষ্ণু-উপাসক বাস করতেন। বিষ্ণু পুজোর জন্য গ্রামের সর্বত্রই তুলসী গাছ দেখা যেত বলে, অনুমান করা হয় তুলসী বাগান থেকে স্থানের নাম তুলসীবেড়িয়া হয়েছে।

তেকোনা: মুর্শিদাবাদ

এই জনপদের আদি আকার সম্ভবত জ্যামিতিক ত্রিকোণের মতো ছিল বলে এই প্রকার স্থাননাম হয়েছে।

তেলকুপি: পুরুলিয়া

মূল 'তৈলকম্প': অপভ্রংশে তেলকুপি হয়েছে বলে মনে করা হয়। তেলকুপি অর্থে ছোট আকার তেলের দীপদান বোঝায়, কিন্তু স্থাননামের সঙ্গে যোগসূত্র অস্পষ্ট।

তেলাড়া: বর্ধমান

'তৈলঢাকা' অপভ্রংশ তেলাড়া হয়েছে। 'তৈলঢাকা' নামের উল্লেখ Baladitya inscripition of the time of Mahipala, 11th century-তে পাওয়া যায়।

তৈলকোপা: হুগলি

এই স্থানের উল্লেখ Syhlet Bhatera copper inscription of Govinda-Kesava-Deva, 11th century A. D-তে পাওয়া যায়।

ত্রিবেণী: হুগলি

বিভিন্ন লেখক এই স্থানটিকে 'ত্রিপানি', 'তারবানি', 'ত্রিবেণী', 'তিরপূর্ণী', 'ত্রিপিলা' প্রভৃতি নামে উল্লেখ করেছেন। 'তিরপূণী' নামের উল্লেখ

রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাযাত্রা' কবিতায় পাওয়া যায়। দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত ধোয়ী কবির 'পবনদূতম' কাব্যেও এই স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ এই স্থানকে 'তিরপানি' নামে উল্লেখ করেছেন। বঙ্গাধীশ ফিরোজ শাহ কিছুকাল এখানে বাস করেছিলেন বলে মুসলমান ঐতিহাসিকগণ স্থানটিকে 'ফিরোজবাদ' নামেও উল্লেখ করেছেন। এলাহাবাদ বা প্রয়াগে গঙ্গা, যমুনা এবং সরস্বতী এক ধারায় মিলিত হয়ে এই স্থানে এসে পুনরায় পৃথক ধারায় প্রবাহিত হয় বলে এই স্থানটি 'মুক্তবেণী' নামেও প্রখ্যাত। স্থানটি এক কালে একটি প্রসিদ্ধ বন্দর ও সংস্কৃত চর্চার কেন্দ্রস্থল ছিল। ত্রিবেণীর অতীত গৌরব আজ আর নেই, কিন্তু এখানকার তীর্থমাহাত্ম্য আজও বিদ্যমান। পৌষ সংক্রান্তি তিথিতে মুক্তবেণীতে পুণ্যস্নান ও পরলোকগত পিতৃপুরুষের আত্মার তৃপ্তি কামনায় প্রতি বছর এখানে বহু জনসমাগম হয়। শ্রুতিধর পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ত্রিবেণীর অধিবাসী ছিলেন। সত্যেন দত্ত লিখেছেন,

মুক্তবেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে
আমরা বাঙালী বাস করি সেই তীর্থে বরদ বঙ্গে ॥

প্রচলিত ছড়া:

বামদিকে হালিশহর দক্ষিণে ত্রিবেণী
যাত্রীদের কোলাহলে কিছুই না শুনি ॥
(কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম)

* * *

দক্ষিণ প্রয়াগ উন্মুক্তবেণী সপ্তগ্রামোখ্যা।
দক্ষিণ দেশে ত্রিবেণীতি খ্যাত ॥

ত্রিমোহনী: মুর্শিদাবাদ

পূর্বনাম মনছুরনগর। এই গ্রামের কাছে দুটি নদী একত্র হয়ে মোহনার সৃষ্টি হওয়ায় স্থাননাম ত্রিমোহনী হয়েছে বলে অনুমিত।

থানাপাড়া: নদিয়া

নবাবি আমলে এখানে একটি চৌকি বা থানা থাকায় স্থাননাম থানাপাড়া হয়েছে। স্থানটি জলঙ্গী পীরের দরগার জন্য বিখ্যাত।

দওপাড়া: বর্ধমান

প্রচলিত ছড়া :

দওপাড়া মদের হাঁড়া।
কুলীন গ্রাম লক্ষ্মী ছাড়া ॥

দমদম: উ চব্বিশ পরগনা

এই স্থানের চলিত নাম ঘুঘুডাঙা। 'দমদম' শব্দটি দমদমা শব্দের অপভ্রংশ, অর্থ উঁচু টিলা। কথিত আছে, এখানে একটি টিলা ছিল। সেই টিলার ওপর একটি অট্টালিকা ছিল বলে জানা যায়। স্থানীয় লোকেরা টিলাটিকে 'কেল্লা' বলে অভিহিত করত। টিলার ওপরের অট্টালিকাটি একদা ওলন্দাজদের ফ্যাক্টরি ছিল বলে অনেকে অনুমান করেন। ১৭৫৬ সালে সিরাজউদ্দৌলার সৈন্যরা যখন কলকাতা আক্রমণ করে তখন সেই 'কেল্লা'রূপী অট্টালিকা ধ্বংস হয়ে যায়। স্থানীয় লোকেরা মনে করে কোনও দৈববলে এক রাতের মধ্যেই এই অট্টালিকা উবে যায়। পলাশী যুদ্ধের পর লর্ড ক্লাইভ এই টিলার ওপর নতুন করে একটি বাগানবাড়ি তৈরি করেছিলেন বলে জানা যায়। বিশপ হেবারের ভ্রমণ বিবরণীতে এই বাগানবাড়ির উল্লেখ আছে। কিন্তু সেই বাগানবাড়িরও কোনও চিহ্ন এখন আর নেই। ১৭৫৭ সালে এই দমদমেই ইংরেজদের সঙ্গে বাংলার নবাবের যে সন্ধিচুক্তি হয় তার ফলে বাংলার ওপরে ইংরেজদের একাধিপত্য কায়েম হয়। ১৭৮৩ সালে দমদম ক্যান্টনমেন্টের পত্তন হয় এবং ১৮৫৩ পর্যন্ত বেঙ্গল আর্টিলারির হেড কোয়ার্টার এখানেই ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত দমদম ইংরেজ রাজকর্মচারীদের একটি জনপ্রিয় প্রমোদ-ভ্রমণের জায়গা ছিল বলে জানা যায়।

তখনকার দিনের বহুল প্রচলিত ছড়ায় বলে :

দেখো মেরী জান
কম্পানী নিশান,
বিবি গিয়া দম-দমা,
উড়ি হ্যায় নিশান।
বড়া সাহিব, ছোটা সাহিব,
বাঁকা কাপিতান
দেখো মেরী জান
লিয়া হ্যায় নিশান।

পরবর্তী কালের প্রচলিত ছড়া :

মশা, মাছি, নর্দমা।
এ তিন নিয়ে দমদমা ॥

দয়াবাড়ি: নদিয়া

ইংরেজ শাসনকালের প্রথম দিকে এই স্থানে খ্রিস্টান মিশনারিদের জনকল্যাণকারী কাজকর্মের জন্য স্থাননাম দয়াবাড়ি হয়েছে বলে অনুমিত।

দর্পশীল: বীরভূম

প্রচলিত ছড়া :

যার নাই মাগ-ছেলে।
সে যায় দর্পশীলে ॥

দলুয়া: মুর্শিদাবাদ

পূর্বনাম দেউলখণ্ড, অপভ্রংশে দলুয়া হয়েছে। কথিত আছে, আদিতে জিয়াগঞ্জ নিবাসী বাংলার শেষ নবাবের সিংহরায় পদবিধারী এক কর্মচারী তাঁর কুলদেবীর স্বপ্নাদেশে পৈতৃক স্থান ত্যাগ করে সপরিবারে এবং সপরিজনে এই স্থানে এসে এক নতুন গ্রাম পত্তন করেন এবং তাঁদের কুলদেবীর সম্মানে স্থাননাম রাখেন দেউলখণ্ড।

দশঘরা: মুর্শিদাবাদ

দশটি পল্লী নিয়ে গঠিত স্থান-সুবাদে আদিতে স্থানের নাম হয় দশপল্লী। পরে অপভ্রংশে দশঘরা হয়েছে। স্থানটি একসময় বারোদুয়ারি রাজার রাজধানী ছিল বলে শোনা যায়।

দশঘরা নামে বাংলায় বহু জেলায় বহুগ্রামের নাম পাওয়া যায়।

দাঁতন: প মেদিনীপুর

কিংবদন্তি আছে, মহাপ্রভু চৈতন্য পুরী যাওয়ার সময় এই স্থানে দন্তকাষ্ঠ বা দাঁতন দিয়ে দাঁত মেজে ছিলেন বলে স্থাননাম দাঁতন হয়েছে। অন্য মতে, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের অনেক আগে থেকেই এই স্থান 'দন্তপুর' নামে পরিচিত ছিল, যা পরে

অপভ্রংশে দাঁতন হয়। 'দাঠাবংশ' নামক বৌদ্ধ গ্রন্থ থেকে জানা যায়, ক্ষেম নামে বুদ্ধদেবের এক শিষ্য বুদ্ধের চিতা থেকে একটি দাঁত সংগ্রহ করে কলিঙ্গ রাজ ব্রহ্মদত্তকে দান করেন। ব্রহ্মদত্ত মন্দির নির্মাণ করে সেই দাঁতটিকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং স্থাননাম দেন দন্তপুর। শোনা যায় ওই বংশের এক রাজা শিবগুহ শত্রু আক্রমণে নিহত হলে নানারকম সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে রাজকুমারী হেমমালা এবং রাজমাতা উজ্জয়িনী ছদ্মবেশে বুদ্ধদেবের দাঁতটি নিয়ে তাম্রলিপ্তের পথে সিংহল চলে যান। সিংহলরাজ মেঘবাহন পরম ভক্তিভরে ধর্ম মন্দিরে দাঁতটি প্রতিষ্ঠা করেন। সিংহলে এখনও ওই বুদ্ধ-দন্ত নিয়মিত পূজিত হয় বলে জানা যায়। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ফা-হিয়েন সিংহলে মহাসমারোহে বুদ্ধ-দন্ত প্রতিষ্ঠার বার্ষিক উৎসব দর্শন করেছিলেন বলেও জানা যায়। কিছু চৈতন্য-অনুরাগী পণ্ডিতের চৈতন্যের দন্ত-ধাবন-এর কাহিনির বিশ্বাসযোগ্যতার দাবি সত্ত্বেও চৈতন্য সাহিত্য থেকে জানা যায় যে, শ্রীচৈতন্য পুরী যাত্রাকালে দাঁতন নামে এক বিত্তশালী জনপদের মধ্য দিয়ে পার হয়ে গিয়েছিলেন।

দামপাল: বর্ধমান

দাম + পাল। স্থাননামের ব্যুৎপত্তি অস্পষ্ট, কিন্তু অন্ত্যপদে পাল শব্দের ব্যবহারের উল্লেখ Puspabhadra inscription of Pragjyotisa, 12th century-তে পাওয়া যায়

প্রচলিত ছড়া:

পাটুলি ডুবুডুবু,
দামপাল হাসে (বা ভাসে),
সোনার নারায়ণপুর
খিলখিলিয়ে হাসে ॥

দামুন্যা: বর্ধমান

কবিকঙ্কণ-তীর্থরূপে খ্যাত। এখানে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য-প্রণেতা কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী জন্মগ্রহণ করেন।

প্রচলিত ছড়া:

ধনি ধনি কলিকালে। রত্না নদীর কূলে
অবতার করিল শঙ্কর।

ধরি চক্রাদিত্য নাম দামুন্যা করিল ধাম
তীর্থ কৈলা সেই ত নগর ॥

দারাপুর: বাঁকুড়া
প্রচলিত ছড়া :

কড়ড়ের ত্যাঁদর।
আউস গাঁয়ের বাঁদর।
গুসকারার ঢেমন (লম্পট)।
দারাপুরের বামন ॥

দার্জিলিং: দার্জিলিং
দোর্জী + লিং = দার্জিলিং। কথাটা তিব্বতি থেকে উদ্ভূত। দোর্জী— বজ্র এবং লিং— স্থান। স্থানটি তিব্বতি লামাদের পূজনীয় আদি ভৌতিক 'বজ্র' দেবতার স্থান বলে গণ্য। অবজারভেটরি হিল-এর ওপর একদা যে বৌদ্ধ মঠ ছিল তাকে তিব্বতি ভাষায় 'দোর্জে' বলা হত। সেই থেকেই দার্জিলিং নাম হয়েছে। কেউ কেউ বলে অবজারভেটরি হিলের ওপর একদা দুর্জয়লিঙ্গ নামে এক মহাদেবের মন্দির ছিল। এখন সেই মহাদেব একটি দুর্ভেদ্য পাহাড়ের গহ্বরে বিরাজ করছেন বলে অনুমিত। দুর্জয়লিঙ্গ থেকেই দার্জিলিং নাম হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। দার্জিলিং জেলার অধিকাংশ ক্ষেত্র একসময় সিকিম রাজ্যের সেনানিবাস ছিল। ১৮৩৪-৩৫ সালে প্রতিনিয়ত গোর্খা আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ইংরেজ সরকারের সঙ্গে এক সন্ধিচুক্তি হিসেবে সিকিমরাজ এই এলাকাকে ইংরেজদের হাতে তুলে দেন।

দিগনগর: নদিয়া
দিঘি থেকে দীর্ঘিকানগর বা দীঘনগর, যা পরে অপভ্রংশে দিগনগর হয়েছে। দিঘি সম্বন্ধে কিংবদন্তি আছে, নদিয়ার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ মজুমদারের পৌত্র রাজা রাঘব সপরিবারে যখন শান্তিপুর যাচ্ছিলেন, তখন এই গ্রামে দুই মহিলা জল ধার করা নিয়ে ঝগড়া করছিলেন। রাজা রাঘব ঝগড়ার কারণ অনুসন্ধান করে জানতে পারলেন যে, এখানে কোনও পানীয় জলের ব্যবস্থা না থাকায় এক মহিলা অপর এক মহিলার কাছ থেকে পানীয়

জল ধার করে, কিন্তু অন্য মহিলাটি পরের দিন সেই জল ফেরত দিতে না পারায় এই ঝগড়ার সৃষ্টি। মহারাজ সেইদিনই সেখানে জলাশয় খনন করার আদেশ দেন এবং দৈর্ঘ্য নির্ধারণ করার জন্য স্থির হয় যে, ঘোড়ার পিঠে সহিস উঠে এক চাবুক মারলে এক দমে সেই ঘোড়া যতদূর যাবে ততদূর পর্যন্ত জলাশয়ের দৈর্ঘ্য হবে। রাজার আদেশে অল্প দিনের মধ্যেই এক বিরাট দিঘি খনন করা হল। রাজা রাঘবের আদেশে এই জলাশয়ের তীরে একটি বৃহৎ ঘাট, এক রম্য অট্টালিকা এবং শিবমন্দির তৈরি করা হয় বলে জানা যায়। কালের গতিতে সেই ঘাট, অট্টালিকা ভেঙেচুরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে কিন্তু জলাশয়টি এখনও জলপূর্ণ আছে বলে জানা যায়। এই দিঘি থেকেই স্থাননাম।

অন্য এক মতে, দীর্ঘনগর থেকে দিগনগর হয়েছে; কারণ, নদিয়ায় সেকালে এত বড় সুদীর্ঘ জনপদ আর ছিল না।

দিগনগর নামে বর্ধমানেও স্থাননাম আছে।

প্রচলিত ছড়া:

আজ সুবলের অধিবাস কাল সুবলের বিয়ে
সুবলকে নিয়ে যাব আমি দিগনগর দিয়ে।
দিগনগরের মেয়েগুলি নাইতে নেমেছে
চিকন চিকন চুলগুলি ঝাড়তে লেগেছে।
গলায় তাদের তক্তিমালা রক্ত ফুটেছে
পরনেতে ডুরে শাড়ি ঘুরে পরেছে।
দুই দিকে দুই কাতলা মাছ ভেসে উঠেছে
একটি নিলেন গুরুঠাকুর, একটি নিলেন টিঁয়ে।
টিঁয়ের মায়ের বিয়ে লাল গামছা দিয়ে।
অশথের পাতা ধনে গৌরী বেটী কনে
নকা বেটা বর
ঢ্যাম-কুড় কুড় বাদ্যি বাজে চরকডাঙায় ঘর ॥

* * *

হাতিশালা বাথানগাছি
দিগনগরের কাছাকাছি ॥

দিগম্বরপুর: দ চব্বিশ পরগনা
এই স্থানের প্রথম 'লাঠদার' দিগম্বর নন্দী বিদ্যানিধির নামানুসারে স্থাননাম দিগম্বরপুর হয়েছে।

দুবদা: পূ মেদিনীপুর
মূল ওড়িয়া থেকে উদ্ভূত স্থাননাম। ওড়িয়া ভাষায় জঙ্গলাকীর্ণ স্থানকে বুদা বলে। কথিত আছে, এই স্থানটি একদা ঝোপজঙ্গলে পূর্ণ ছিল বলে স্থানটিকে বুদা বলা হত। বুদা থেকেই দুবদা স্থাননাম হয়েছে বলে অনুমিত।

দুবরাজপুর: প মেদিনীপুর
দুবরাজ বা দরেজ সাঁওতালি শব্দ, অর্থ এক জাতীয় ধান। এই বিশেষ প্রকার ধানের ফসলের সঙ্গে জড়িত স্থাননাম। এই নামে মেদিনীপুরেই ষোলোটি স্থান আছে।

দেউলপাড়া: হুগলি
এখানে কিছু স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি প্রাচীন মন্দির বা দেউল দেখতে পাওয়া যায়। সম্ভবত সেই কারণেই স্থানের নাম দেউলপাড়া হয়েছে।

দেউলী: বীরভূম
প্রবাদ আছে, সীমান্তবর্তী পুরুষোত্তমপুরে এক সময়ে এক বর্ধিষ্ণু পালবংশের বসবাস ছিল। অজয় নদীর প্রবল বন্যায় সমগ্র পুরুষোত্তমপুর জলমগ্ন হয়ে পড়লে পালেরা নিঃস্ব অবস্থায় এই গ্রামে এসে আশ্রয় নেন। দেউলিয়াগ্রস্ত পালবংশকে কেন্দ্র করেই সম্ভবত আদিতে স্থানের নাম হয় দেউলিয়া, যা পরে অপভ্রংশে দেউলী হয়েছে।

দেওআস: হুগলি
পূর্বনাম দেবভাস। অপভ্রংশে দেওআস হয়েছে। দেবভাস বা দেওআস অর্থ দেবতাদের আবাসস্থল।

দেগঙ্গা/দ্বিগঙ্গা: উ চব্বিশ পরগনা

দুই গঙ্গার দ্বারা পরিবেষ্টিত স্থানসূচক নাম। দেগঙ্গা শব্দটি দেওগঙ্গা বা দ্বীপগঙ্গা অথবা দীর্ঘগঙ্গা শব্দের অপভ্রংশ বলে অনুমিত। অনেকে অনুমান করেন যে প্রাচীন গ্রিক ইতিহাস পেরিপ্লাসে উল্লিখিত 'গঙ্গে' বা 'গঙ্গোরোডিয়া' নগরী এইখানেই অবস্থিত ছিল। কথিত আছে, একসময় এই স্থানটি দেউলিয়ার রাজা চন্দ্রকেতুর রাজধানী ছিল। কিংবদন্তি অনুসারে ইসলাম ধর্ম প্রচারক গোরাচাঁদপীর ওরফে গোড়াই গাজি রাজা চন্দ্রকেতুকে মুসলমান হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু চন্দ্রকেতুকে স্বমতে আনতে পারেন না। বলপ্রয়োগ করেও কোনও ফল না হলে গোড়াই গাজি গৌড়ের বাদশাহের সাহায্য প্রার্থনা করেন। বাদশাহ পীরশাহ নামক জনৈক ব্যক্তিকে এই এলাকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠান। গোড়াই গাজির পরামর্শমতো পীরশাহ চন্দ্রকেতুকে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকে। কিন্তু চন্দ্রকেতু এই প্রস্তাব উপেক্ষা করলে পীরশাহের সঙ্গে তাঁর তুমুল যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে চন্দ্রকেতু জয়লাভ করেন, কিন্তু ঘটনাক্রমে তাঁর বিজয়ের বার্তাবাহী সাদা পায়রার বদলে পরাজয়ের নিদর্শনস্বরূপ কালো পায়রা উড়ে গিয়ে রাজবাড়ির অন্দরমহলে পৌঁছলে রাজা পরাস্ত হয়েছেন মনে করে রাজবাড়ির অন্তঃপুরবাসিনীরা দিঘিতে ডুবে আত্মবিসর্জন করেন। বিজয়ী চন্দ্রকেতু রাজধানীতে ফিরে এলে এই শোচনীয় দুর্ঘটনায় বিহ্বল হয়ে নিজেও আত্মহত্যা করেন। এইভাবে চন্দ্রকেতুর রাজবংশ ধ্বংস হয়ে যায় এবং পরবর্তীকালে এই অঞ্চল মুসলমানদের আয়ত্তে আসে।

প্রচলিত ছড়া:

বালি, দ্বিগঙ্গা, আর মুড়াগাছা।
আর যত সব কাদা খোঁচা ॥

দেনুই: নদিয়া

'দেনো' থেকে দেনুই স্থাননাম হয়েছে। চলতি কথায় দেনো অর্থে দান করা অথবা দানে প্রাপ্ত জমি বোঝায়। দান করা জমিকে দেনোই জমিও বলে। প্রায় চারশো বছর আগে এই এলাকার সমস্ত জমি তদানীন্তন নদিয়ার রাজা রাঘব রায় এক দানপত্রে জনৈক গোবিন্দ ন্যায়াধীশকে দান করেন। সেই দান করা বা দেনোই জমি থেকে স্থাননাম দেনুই হয়েছে বলে অনুমিত।

দেনুড়: বর্ধমান

পূর্বনাম 'দেন্দুড়' অপভ্রংশে দেনুড় হয়েছে। বৈষ্ণব কবি বৃন্দাবন দাসের বাসস্থান বলে খ্যাত। সুকুমার সেন প্রশ্ন করেছেন, দেবন-পুট (জুয়ার গোপন আড্ডা?) থেকে দেনুড় হয়েছে।

প্রচলিত ছড়া:

বাল্যকালে কেশবের দেন্দুরাতে স্থিতি,
বৃন্দাবন দাসের হয় হেথায় বসতি ॥

* * * *

হালিশহর নতি গ্রামে নারায়ণী সুত।
দাস বৃন্দাবন নামে জগতে বিদত ॥
নতি গ্রামে জন্ম তায় দেন্দুড়াতে স্থিতি।
শ্রীচৈতন্য ভাগবত রচিলেন তথি ॥

—পাঠ পর্যটন

দেপাড়া: নদিয়া

স্থানীয় প্রাচীন নৃসিংহদেবের মন্দির থেকে স্থাননাম হয় দেবপল্লী যা পরে অপভ্রংশে দেপাড়া হয়েছে। নৃসিংহদেবের বৃহৎ কষ্টিপাথরের মূর্তিটি কিন্তু বহুলাংশে অঙ্গহীন। সাধারণত অঙ্গহীন বিগ্রহের পুজো হয় না। কিন্তু লোকে এই বিগ্রহকে 'অনাদি' বা স্বয়ং প্রকাশ বলে বিশ্বাস করে বলে এখনও এর পুজো যথানিয়মে চলে আসছে। জনশ্রুতি আছে এই মূর্তির অঙ্গে একখানি পরশপাথর ছিল। কোনও লোভী সন্ন্যাসী সেই পরশপাথরের লোভে মূর্তিটির অঙ্গহানি ঘটিয়েছে।

এই মূর্তিটির আবির্ভাব সম্বন্ধে একটি কাহিনি প্রচলিত আছে। বহুদিন আগে গোয়ালাদের একটি গোরুর দুধ কম হচ্ছে দেখে গোয়ালা গোরুটির প্রতি নজর রাখতে শুরু করে। গোরুটি গোরুর পালে চরতে চরতে হঠাৎ কোথায় চলে যায় আর একটু পরেই ফিরে আসে। কয়েক দিন লক্ষ করে গোরুটির পিছু পিছু গোয়ালা গিয়ে দেখে যে, একটি জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে গোরুটি গিয়ে একটি অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গায় দাঁড়ায় এবং তার বাঁট থেকে আপনা-আপনি দুধ সেই উঁচু স্থানটির ওপর পড়ছে। কয়েক দিন লক্ষ করার পর গোরুর মালিক সেই স্থানটি খনন করে নৃসিংহদেবের এই মূর্তিটি পায়।

দেবানন্দপুর: হুগলি
স্থানটি প্রাচীন সপ্তগ্রামের সাতটি স্থানের অন্যতম। (সপ্তগ্রাম দেখুন।) কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের জন্মস্থান। জন্ম ৩১ ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১২৮৯।

প্রচলিত ছড়া:

দেবানন্দপুর গ্রাম
দেবের আনন্দ ধাম ॥

দেবীপুর: হুগলি
গ্রামদেবী বিষহরি দেবীর নামে স্থাননাম দেবীপুর হয়েছে বলে অনুমিত।

দেহাটী: নদিয়া
পূর্বনাম দ্বীপহাট্টিকা। অপভ্রংশে দেহাটী হয়েছে। দ্বীপের ওপর ব্যাবসা-বাণিজ্যের স্থান সূচক নাম।

দৈয়েরবাজার: নদিয়া
দৈয়ড় থেকে দৈববট যার অর্থ দেবতা অধিষ্ঠিত বটগাছ। দৈয়ড়ের নীচে বাজার দৈয়ড়বাজার, পরে লোকমুখে দৈয়েরবাজার হয়েছে বলে অনুমিত। চলতি কথায় 'দৈ' বা 'দই'-এর সঙ্গে স্থাননামের কোনও যোগসূত্র জানা যায় না।

দোগাছিয়া: হুগলি
বহুপূর্বে এই গ্রামটি দুটি পাড়ায় বিভক্ত ছিল এবং দু' পাড়াতেই স্বতন্ত্রভাবে সাড়ম্বরে চড়ক পুজো হত। লোকেরা কথায় বলত দোগাছাচড়ক। সেই থেকে স্থানের নাম প্রথমে দেগাছা হয়। পরে দোগাছিয়া হয়েছে।

দোমহানি: জলপাইগুড়ি
চেল নদীর তিস্তার সঙ্গে সংগমস্থল হিসাবে স্থাননাম দোমোহানী থেকে দোমহানি হয়েছে বলে অনুমিত।

দোসতীনা: নদিয়া
দুই সতীনের গ্রাম থেকে দোসতীনা স্থাননাম হয়েছে। এখানে এক সময় দু'সতীনের নানা কাহিনি জনশ্রুতিতে শোনা যেত।

দ্বারবাসিনী: হুগলি
এই স্থানের রাজাদ্বার পালের নাম থেকে স্থাননাম দ্বারবাসিনী হয়েছে। অন্য মতে গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী দ্বারবাসিনী থেকে স্থাননাম দ্বারবাসিনী হয়েছে।

দ্বারহাট্টা: হুগলি
স্থানীয় প্রাচীন দ্বারিকাচণ্ডী দ্বিভুজা দুর্গা মন্দির থেকে স্থাননাম দ্বারহাট্টা হয়েছে।

সুকুমার সেনের প্রশ্ন, 'কাছের হাট' থেকেই কি দ্বারহাট্টা হয়েছে?

দ্বীপা: হুগলি
পূর্বে এই স্থানে জঙ্গল ছিল এবং কৌশিকী, বিমলা নদী ও দামোদর নদ তিন দিক বেষ্টন করে প্রবাহিত ছিল বলে স্থানটি দ্বীপের ন্যায় দেখায়। সেইজন্য স্থানের নাম হয় দ্বীপ, যা পরে দ্বীপা হয়েছে। তদানীন্তন সরকারি নথিপত্রে স্থানটি 'ডিপা' নামে উল্লিখিত হয়েছে।

প্রচলিত ছড়া:

ভাঙ্গামোড়াতে বাস সুন্দরানন্দ নাম।
পরম বিদ্যান বিপ্র পণ্ডিত আখ্যান ॥
দ্বীপ গ্রামে স্থিতি কৃষ্ণানন্দ অবধূত।
সোনাতলা রঙ্গাদেশে রঙ্গন কৃষ্ণদাস নিশ্চিত ॥

ধবনী: বাঁকুড়া
'ধ' নামক এক প্রকার বন্য গাছের বন থেকে 'ধ-বন' যা পরে ধবনী হয়েছে বলে অনুমিত। সুকুমার সেন জানিয়েছেন, ধব গাছের বন। একই নামে এই জেলায় ন'টি স্থান আছে।

ধলদিঘি: দ দিনাজপুর
কিংবদন্তি আছে, অতি প্রাচীন কালে এই অঞ্চলে ধল রাজার রাজত্ব ছিল। রাজার দু'রানি কালারানি ও ধলরানি প্রজাদের সুবিধার জন্য দুটো দিঘি খনন করান। রানিদের নামানুসারে দিঘিদুটো যথাক্রমে কালাদিঘি ও ধলদিঘি নামে পরিচিত হয়। খনন করার সঙ্গে সঙ্গে কালাদিঘিতে জল উঠে আসে, কিন্তু ধলদিঘিতে জল ওঠে

না। সেইসময় মৌলানা আতাউল্লা শাহ নামে একজন দরবেশ নানাস্থানে পরিভ্রমণান্তে এখানে এসে হাজির হন। ধলদিঘির বিষয় জানতে পেরে তিনি রাজারানির অনুমতি নিয়ে তাঁর অলৌকিক ক্ষমতাবলে রাতারাতি ধলদিঘিকে পূর্ব-পশ্চিমে ঘুরিয়ে দিলে দিঘিটি জলপূর্ণ হয়ে যায়। এই ঘটনার পর রাজারানি আতাউল্লাকে দিঘিটি দান করে দেন। আতাউল্লা এই দিঘির পাড়ে নিজের আস্তানা গড়েন এবং ক্রমে এখানে জনবসতি গড়ে উঠলে দিঘির নামানুসারে স্থানটির নাম হয় ধলদিঘি। দিঘির পাড়ে আতাউল্লা শাহর সমাধি আজও বিদ্যমান।

ধাওয়াপাড়া: নদিয়া
পূর্বনাম কৃষ্ণচন্দ্রপুর। শোনা যায় প্রতি বছর বন্যার জলে এই এলাকা প্লাবিত হত বা ধুয়ে যেত বলে স্থাননাম ধাওয়াপাড়া হয়েছে।

ধাপগঞ্জ: জলপাইগুড়ি
প্রায় পাঁচশতাধিক বছর আগে এই অঞ্চলে ধপচন্দ্র দাস নামে এক ধার্মিক ধনী ব্যক্তি বাস করতেন। তাঁর গৃহে নিত্য চণ্ডীপুজো হত। একবার দেবী তাঁকে নরবলি দিতে স্বপ্নাদেশ দেন। নতুবা তিনি নির্বংশ হবেন বলে ভয় দেখান। কিন্তু দাসমশায় শত চেষ্টা করেও নরবলি দিতে সমর্থ হলেন না। ক্রমে তাঁর সাত ছেলে, চার মেয়ে এবং দুই স্ত্রীর মৃত্যু হল। সমস্ত বিষয়সম্পত্তিও নষ্ট হয়ে তিনি একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেলেন। দুঃখ-দুর্দশার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে তিনি চণ্ডীর দরজায় নিজেকেই বলি দিলেন। তখন চণ্ডীর মন্দিরটি ভেঙে গিয়ে মাটির স্তূপে বা 'ধাপ'-এ পরিণত হল। এই ঘটনা থেকে দেবীর নাম হল ধাপচণ্ডী এবং স্থানের নাম হয় ধাপগঞ্জ।

ধামাস: বর্ধমান
পূর্বনাম ধর্মবাস। অপভ্রংশে ধামাস হয়েছে বলে অনুমিত।

ধামুয়া: দ চব্বিশ পরগনা।
প্রচলিত ছড়া:

হাজিপুরের তাল-পাঠালি।
বাসুলডাঙ্গার খই ॥

ধামুয়ার রাঙ্গা মুলো।
উলুবেড়ের দই ॥

ধুলিয়াখলিসা: কুচবিহার

ধুলিয়া + খলিসা। খলিসা বা খলসে একপ্রকার বহুল পরিচিত মাছের নাম। কিন্তু জমিদারি বন্দোবস্ত ক্ষেত্রে খলিসা অর্থে সেইসব জমি বোঝায় যার খাজনা সরাসরি ভাবে সরকারকে দেয়। ধুলিয়া নামক গ্রামে খালিসা ব্যবস্থা থাকার জন্য স্থাননাম ধুলিয়াখলিসা হয়েছে। এই নামে এই জেলায় ছ'টি স্থান আছে।

ধেং বাহারা: প মেদিনীপুর

বাহারা মূল মরাঠি শব্দ। অর্থ জলাভূমি বা বন্যায় প্লাবিত জমি। ধেং কথার অর্থ অস্পষ্ট। ধেং বাহারা নামে এই জেলায় তিনটি স্থান আছে।

ধোড়াদহ: নদিয়া

ধোড়া নামক এক জাতীয় সাপের সঙ্গে জড়িত স্থাননাম।

ধোবার গ্রাম: বাঁকুড়া

কথিত আছে, এখানে একসময়ে ছাতনা রাজবাড়ির ধোপাদের বাস ছিল। সেই কারণে সম্ভবত স্থাননাম ধোবার গ্রাম হয়েছে।

নওদাবাস: হাওড়া

পূর্বনাম নওকুবাসলা (Naukubasala) অপভ্রংশে নওদাবাস হয়েছে। নওকুবাসলা নামের উল্লেখ Tejpur copper-plate of Banamala, middle of the 9th century, North-Central Bengal-এ পাওয়া যায়।

নওপুকুরিয়া: মুর্শিদাবাদ

শোনা যায়, অতীতে কোনও এক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি গ্রামবাসীদের জলকষ্ট নিবারণ করবার জন্য একটি পুকুর খনন করেন। এই নতুন পুকুর থেকে স্থাননাম নওপুকুরিয়া হয়েছে বলে অনুমিত। এখানকার ন'টি পুকুর থেকে স্থাননাম

নওপুকুরিয়া হয়েছে বলেও অনেকে অনুমান করেন। এই নামে নদিয়া জেলায় ন'টি স্থান আছে।

ন'কড়ি: নদিয়া

নয় সংখ্যাবাচক স্থাননাম। সাধারণত মানুষের ক্ষেত্রে এক কড়ি, দু'কড়ি ইত্যাদি সংখ্যাবাচক নাম দেখা যায়। কড়ি সংখ্যাবাচক স্থাননাম সচরাচর দেখা যায় না। এ ক্ষেত্রে সম্ভবত কোনও সময়ে ন'কড়ি মূল্য দিয়ে হয়তো বা কেউ এই স্থানটি ক্রয় করে, তাই এই প্রকার স্থাননাম হয়ে থাকবে।

নন্দীগ্রাম: পূ মেদিনীপুর

প্রচলিত ছড়া:

খায় দায় দেয় না দাম।
বাড়ি কোথা, না, নন্দীগ্রাম ॥

নবদ্বীপ/ নদিয়া: নদিয়া

নবদ্বীপ নামকরণ সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত আছে। এক মতে পূর্বকালে এখানে গঙ্গামধ্যবর্তী চরভূমি ছিল। কালে নদীর গতি পরিবর্তিত হওয়ায় ওই চরভূমি ক্রমশ দ্বীপাকারে বিস্তৃত হয়ে যায় এবং বাসোপযোগী হয়ে ওঠে। গঙ্গার গর্ভ থেকে নতুন উত্থিত হওয়ায় এই স্থানের নাম হয় নতুন দ্বীপ বা নবদ্বীপ।

কথিত আছে, প্রায় পনেরো মাইল উত্তরে অবস্থিত স্থান অগ্রদ্বীপ থেকে পৃথক করে চিহ্নিত করার জন্য এই নতুন দ্বীপকে নবদ্বীপ নামে অভিহিত করা হয়। বৈষ্ণবদের মতে গঙ্গা গর্ভোত্থিত ন'টি দ্বীপের সমষ্টি নিয়ে গঠিত বলে স্থাননাম হয় নয়দ্বীপ বা নবদ্বীপ। বর্তমান নবদ্বীপের আশেপাশের ও গঙ্গার পূর্বতীরে অবস্থিত কয়েকটি গ্রামকে প্রাচীন ন'টি দ্বীপের সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করা হয় এবং এইসব স্থান প্রদক্ষিণ করে ভক্ত বৈষ্ণবগণ নবদ্বীপ পরিক্রমা সম্পন্ন করেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে বর্ণিত ন'টি দ্বীপের নাম অন্তর্দ্বীপ, সীমান্তদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, মোদ্রুমদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ এবং রুদ্রদ্বীপ।

নবদ্বীপ পরিক্রমা পদ্ধতি রচয়িতা বৈষ্ণব নরহরি চক্রবর্তী (বৈষ্ণব নাম ঘনশ্যাম দাস) লিখেছেন—

নদীয়া পৃথক গ্রাম নয়।
নবদ্বীপে নবদ্বীপ বেষ্টিত যে হয় ॥
নয় দ্বীপে নবদ্বীপ নাম।
পৃথক পৃথক কিন্তু হয় এক গ্রাম ॥

* * *

গঙ্গা পূর্ব পশ্চিম তীরেতে দ্বীপ নয়।
পূর্বে অন্তর্দ্বীপ শ্রীসীমন্ত দ্বীপ চতুষ্টয় ॥
কোলদ্বীপ ঋতু জহ্নু মোদ্রুম আর।
রুদ্রদ্বীপ এই পঞ্চ পশ্চিমে প্রচার ॥

একমতে গোদ্রুমদ্বীপের অন্তর্গত স্থানটির প্রকৃত নাম স্বরূপগঞ্জ।

কারও কারও মতে গঙ্গামধ্যস্থিত সুবিস্তীর্ণ চরে যখন প্রথম মানুষ যাতায়াত করতে আরম্ভ করে তখন সেখানে এক সন্ন্যাসী প্রতিরাত্রে ন'টি দীপ জ্বেলে কোনও তান্ত্রিক সাধনা করতেন। লোকে দূর থেকে সেই ন'টি দীপ বা দিয়াকে দেখে চরটিকে নয় দিয়ার চর বলে অভিহিত করত। ক্রমে চরে জনপদ গড়ে উঠলে স্থানটি 'ন অদিয়া' নদীআ এবং পরে নদিয়া নামে পরিচিত হয়। মিনহাজ উস-সিরাজ প্রণীত 'তবকৎ-ই-নাসিরী' (১২৬০ খ্রি.) গ্রন্থে প্রথম লিখিত ভাবে 'নূদীয়া' বা 'নোদিয়াহ' নাম দেখতে পাওয়া যায়। নূদীয়া বা নোদিয়াহ নদীআ'র বিবর্তিত রূপ বলে মনে হয়। অনেকের মতে নবদ্বীপের অপভ্রংশেই নদিয়া হয়েছে। খ্রিস্টীয় একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে বাংলার সেনরাজাদের গঙ্গাবাসের স্থান হিসাবে নবদ্বীপের পরিচয় পাওয়া যায়। জানা যায় খ্রিস্টীয় ১০৬৩ অব্দে তদানীন্তন সেনরাজা গঙ্গার তীরে অবস্থিত এই পবিত্র স্থান মুসলমান আক্রমণ থেকে দূরে থাকার জন্য যোগ্য মনে করায় গৌড় থেকে রাজধানী নবদ্বীপে স্থানান্তরিত করেন। নবদ্বীপ নগরীর প্রতিষ্ঠা তখন থেকেই হয়। এই ঐতিহাসিক তথ্য সম্বন্ধে মতভেদ থাকলেও নদীর পূর্বপাড়ে বামনপুকুর গ্রামে অবস্থিত বল্লালঢিবি নামে পরিচিত এক উচ্চ টিলা এবং বল্লালদিঘি নামে এক জলাশয় এ অঞ্চলে বল্লালসেন ও সেনরাজাদের আধিপত্যের যোগসূত্রের নির্দেশ দেয়। ইতিহাস বলে, লব্ধ প্রতিষ্ঠিত বাংলার রাজা লক্ষ্মণসেনের রাজধানী নদিয়া বা নবদ্বীপে ছিল। আইন-ই-আকবরি থেকে জানা যায় লক্ষ্মণসেনের সময়ে 'নদিয়া বাংলার রাজধানী ছিল এবং

স্থানটি বিদ্যাবত্তার জন্য খ্যাত ছিল।' সেন রাজত্বকালে নদিয়া রাজ্য বলতে সমগ্র বাংলা রাজ্য বোঝাত। একদা উত্তরে রাজশাহী, পূর্বে পাবনা ও যশোহর, দক্ষিণে চব্বিশ পরগনা ও পশ্চিমে বীরভূম, বর্ধমান ও হুগলি এবং উত্তর-পশ্চিমে মুর্শিদাবাদ এই চতুঃসীমান্তর্গত সমগ্র ভূখণ্ড নদিয়া নামে অভিহিত হত। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময় সমগ্র পলাশী, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে ধুলিয়াপুর ও পশ্চিমে ভাগীরথী এই চতুর্সীমান্তর্গত সুবৃহৎ চৌরাশী পরগনা নদিয়া নামে পরিচিত ছিল। সম্ভবত এই ঐতিহাসিক সূত্রে বর্তমান জেলার নাম নদিয়া হয়েছে।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ও বাংলায় বৈষ্ণবধর্মের নবজাগরণ এবং শাস্ত্র অধ্যয়নের সঙ্গে জড়িত নবদ্বীপ ও নদিয়ার স্থানমাহাত্ম্য সর্বজনবিদিত। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবকালে নবদ্বীপ অতি সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। চৈতন্যভাগবতকার বৃন্দাবন দাস লিখেছেন—

নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাই।
যঁহি অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য গোঁসাই ॥
নবদ্বীপের ঐশ্বর্য কে বর্ণিবারে পারে।
একো গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে ॥

বহু পণ্ডিত, ভক্ত ও পুরাতত্ত্ববিদের মতে মায়াপুরই প্রাচীন নবদ্বীপ এবং এই স্থানই শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকৃত জন্মস্থান। প্রাচীন ইতিহাস ও বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রভৃতিতে উল্লেখ পাওয়া যায় যে নবদ্বীপ গঙ্গার পূর্ব তটে অবস্থিত। গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত নবদ্বীপকে তাঁরা প্রাচীন মণ্ডলের অন্তর্গত কোলদ্বীপ বা কুলিয়া পাহাড়পুর থেকে অভিন্ন বলে মনে করেন। তাঁদের মতে প্রাচীন নবদ্বীপ গঙ্গার ভাঙনে নদীসাৎ হবার উপক্রম হলে এই জায়গার অধিবাসীরা পশ্চিম পারের কুলিয়া চরে গিয়ে বসবাস আরম্ভ করে এবং সেই স্থানেই কালক্রমে বর্তমান নবদ্বীপ জনপদ গড়ে ওঠে। চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল ইত্যাদি গ্রন্থে নবদ্বীপই শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান বলে উল্লিখিত আছে। এইসব গ্রন্থে মায়াপুরের কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে প্রাচীন নবদ্বীপ যে বিভিন্ন নামে পরিচিত বহু পল্লীতে বিভক্ত ছিল তার উল্লেখ পাওয়া যায়। নরহরি চক্রবর্তী প্রণীত 'ভক্তি রত্নাকর' গ্রন্থে নবদ্বীপ

মধ্যবর্তী মায়াপুরই চৈতন্যদেবের জন্মস্থান বলে বর্ণিত হয়েছে। তিনি লিখেছেন—

নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর নামে স্থান।
যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান ॥
যৈছে বৃন্দাবনে যোগপীঠ সুমধুর।
তৈছে নবদ্বীপে যোগপীঠ মায়াপুর ॥

প্রচলিত ছড়া:

চতুর্দিক হইতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায় ॥

* * *

কোষা, কুষি, চন্দনের টিপ।
এ তিন নিয়ে নবদ্বীপ ॥

* * *

রানাঘাটের হাতনাড়ুনি।
শান্তিপুরের কলকলানি ॥
নবদ্বীপের খোঁপা।
গুপ্তিপাড়ার চোপা ॥

* * *

কাশীর মালাই খ্যাত, জয়নগরের মোয়া।
রানাঘাটের পানতুয়া, নবদ্বীপের খোয়া ॥

* * *

বাঁশ, বাসক, ডোবা।
তিন নদের শোভা ॥
(বাসক— এক প্রকার গাছ।)

* * *

কাঙাল, বাঙাল, খদ্যে।
তিন নিয়ে নদ্যে ॥
(খদ্যে— খই।)

আমি যাব নদিয়া
গাই বাছুর বাঁধিয়া।
আমি যাব বঙ্গে
বেলগাছটি সঙ্গে ॥

* * *

নারী, হিজরে, পুরুষ খোজা।
তবে হয় নদের কর্তাভজা ॥

* * *

নদের গদা।
কুশদহের ভদা ॥

(গদা— গদাধর শিরোমণি
ভদা— রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার)

* * *

নুনের ভাঁড় তেলের ভাঁড়
তারে কি বলে ভাঁড়।
ভাঁড়ের মধ্যে ভাঁড় ছিল
নদের গোপাল ভাঁড় ॥

* * *

আছে নদের বদে বিশে,
মেয়ের বাপের ভয় কিসে ॥

বদে— বৈদ্যনাথ সর্দার
বিশে— বিশ্বনাথ সর্দার
(নীল বিদ্রোহের কৃষক নেতৃদ্বয়; এঁরা
গরিব পরিবারের মেয়েদের বিয়ের খরচ দিতেন।)

* * *

রাঢ়ের রাঁধুনী বামুন বদ্যিদের পৈতে।
নদিয়ার নবীন নাগর, কে পারে গো সইতে ॥

খাটো কোঁচা, কাছা ঢিলা।
বাড়ি কোথা, না নদে জিলা ॥

* * *

উলোর মেয়ের কলকলানি, শান্তিপুরের খোঁপা।
নদের মেয়ের নথ নাড়া, কলিকাতার চোপা ॥

নরজা: বর্ধমান

প্রচলিত ছড়া:

যদি পেরুলি নরজা।
তো নেয়ে ধুয়ে ঘর যা ॥

নরসিং: দার্জিলিং

তিব্বতি শব্দ নরসেঙ থেকে উদ্ভূত স্থাননাম। নরসেঙ অর্থ উঁচু নাকের মতো পাহাড়ি স্থান।

নলহাটি: বীরভূম

পীঠস্থান রূপে গণ্য এখানকার স্থাননাম এবং স্থানমাহাত্ম্য সম্বন্ধে কিংবদন্তি আছে, বিষ্ণুচক্রে সতীদেহ ছিন্ন হয়ে সতীর ললাটের এক অংশ এখানে পড়েছিল। অন্য মতে, সতীর দেহাংশ নলা অর্থাৎ কনুয়ের নিম্নভাগ পড়েছিল বলে আদিতে স্থানীয় গ্রামদেবী নলহট্টেশ্বরী নামে খ্যাত ছিলেন, যা পরে অপভ্রংশে ললাটেশ্বরী হয়।

নলহাটি স্থাননাম সম্ভবত নলহট্টেশ্বরী থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। কারও কারও মতে এখানে সতীর কণ্ঠনালী পড়েছিল বলে আদিতে দেবী নলহট্টেশ্বরী নামে পরিচিত হন। আরও এক মতানুসারে, নল নামক জনৈক নরপতির রাজধানী এখানে ছিল, তাই তাঁর নামানুসারে স্থাননাম হয় নলহাটি। স্থানীয় ললাটেশ্বরী মন্দিরের অদূরে অবস্থিত একটি ভগ্নস্তূপ সেই নলরাজার প্রাসাদের অবশেষ বলে অনেকে মনে করেন।

প্রচলিত ছড়া:

বাঁকুড়ার রামগতি।
সিউড়ির কালিগতি।

নলহাটির জনজ্যোতি ॥

* * *

নলহাটিতে মা ললাটেশ্বরী
লাভপুরে মা ফুল্লরা।
সাঁইথিয়ায় মা নন্দেশ্বরী,
তারাপীঠে মা জয় তারা।
বোলপুরে কঙ্কালীতলা
বক্রেশ্বরে মা'র পায়ের তলা,
এই ছয় পীঠ নিয়ে বীরভূমের বড়গলা ॥

নাউপালা: হাওড়া

প্রচলিত ছড়া:

নাউপালার মাটি।
চলবে গুটি গুটি ॥
যাও যদি ছুটে।
মরবে কাঁটা ফুটে ॥

নাকাশীপাড়া: নদিয়া

পূর্বনাম 'নাগর কি পাড়া', পরে নাকাশীপাড়া হয়। অন্য মতে, একসময় গঙ্গাতীরবর্তী এই অঞ্চলে 'নকাশি' অলংকারযুক্ত নৌকা তৈরি হত বলে স্থাননাম হয় নাকাশীপাড়া; পরে অপভ্রংশে নাকাশীপাড়া হয়।

প্রচলিত ছড়া:

নদীয়ার নিকটে নাকাশীপাড়া নাম,
দরশনে নবীন কৈলাস গণ্ডগ্রাম ॥

* * *

নাকাশীপাড়ার দীঘি প্রসিদ্ধ সংসার,
মনোহর সরোবর কিবা শোভা তার ॥

* * *

গ্রামের নাম নাকাশী,
প্রতিবার পুজোয় আসি।

আগে পেতাম একশো আশি,
এবার পেলাম শুধু আশি।
আসছে বার আসি কি না আসি ॥

(কথিত আছে, পাঁচালি গায়ক এক স্থানীয় জমিদারবাড়িতে পাওনা কম পাওয়ায় এই গান রচনা।)

নাগরী: দার্জিলিং

মূল লেপচা কথা নাক্-গ্রী থেকে অপভ্রংশে নাগরী হয়েছে। নাক্-গ্রী অর্থ শক্তিশালী কেল্লা।

নাচনজাম: প মেদিনীপুর

পূর্বনাম জামনগর। এই স্থানের একটি শালগাছের নীচে প্রতিষ্ঠিত বনদেবী নাচনজামসিনী দেবীর থান আছে, তাই থেকে স্থাননাম নাচনজাম হয়েছে বলে অনুমিত।

নানুর: বীরভূম

স্থানটির আদিনাম 'নানোর', চলতি কথায় নানুর হয়েছে। কথিত আছে, গুপ্তযুগের 'নলরাজা' নামে খ্যাত নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্য রায় এই জনপদ পত্তন করেন। চতুর্দশ শতাব্দীর গীতিকবি চণ্ডীদাসের জন্মস্থান হিসাবে স্থানটি বর্তমানে চণ্ডীদাস-নানুর নামে খ্যাত। (চণ্ডীদাস-নানুর দেখুন)।

প্রচলিত ছড়া:

বোলপুরের ধুলো।
নানুরের মুলো।
কীর্ণহারের তুলো ॥

নান্দার: বীরভূম

প্রচলিত ছড়া:

কতদূর নান্দার?
নান্দার যেতে আন্ধার ॥

নামটিকারি: মালদহ

নাম + টিকারি। টিকরি অর্থে উঁচু ভূমি। এই স্থাননামের উল্লেখ Sylhet Bhatera inscription of Govinda Kesava-Deva, 11th century, C.1049 AD.-তে পাওয়া যায়।

নারাথলী: জলপাইগুড়ি

নরদাস বৈরাগ্য নামক এক স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তির নামে স্থাননাম নারাথলী হয়েছে বলে অনুমিত।

নারায়ণপুর: বর্ধমান

বিষ্ণুর অপর নাম নারায়ণ থেকে স্থাননাম নারায়ণপুর হয়েছে। এই নামে এই জেলায় দশটি স্থান আছে। পশ্চিমবঙ্গের অন্য জেলাতেও এই নামে একাধিক স্থান আছে।

প্রচলিত ছড়া:

পুটুটি ডুবুডুবু
দামপাল ভাসে।
সোনার নারায়ণপুর
খিলখিলিয়ে হাসে ॥

নাহিনা: বীরভূম

পূর্বনাম হেয়াতপুর। কথিত আছে, প্রায় দুই শতাধিক বৎসর পূর্বে এক অগ্নিকাণ্ডে এই গ্রামটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়। পরে নতুন বসতি গড়ে উঠলে স্থাননাম হয় নাহিনা।

নিমতা: উ চব্বিশ পরগনা

সম্ভবত নিমগাছের সঙ্গে জড়িত স্থাননাম। স্থানটি ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণরায়ের মাহাত্ম্যসূচক রায়মঙ্গলকাব্য এবং 'ষষ্ঠী মঙ্গল', 'অশ্বমেধ পর্ব' ও 'কালিকামঙ্গল' কাব্য প্রণেতা কবি কৃষ্ণরাম দাসের জন্মস্থান রূপে খ্যাত।

নিমতোড়ী: পূ মেদিনীপুর
পূর্বনাম নিমাইনগরী। বর্তমানে নিমতোড়ী নামে পরিচিত। এই নাম বিবর্তনের কারণ জানা যায় না।

নিমদহ: বর্ধমান
পূর্বনাম নিম্নহ্রদ, অপভ্রংশে নিমদহ হয়েছে।

নেউলিয়া: নদিয়া
বেজির অপর নাম নেউল। নেউলের সঙ্গে জড়িত স্থাননাম বলে অনুমিত।
প্রচলিত ছড়া:

কপাল ছাড়া পথ নাই।
নেউলে ছাড়া রথ নাই ॥

নেড়া দেউল: প মেদিনীপুর
কথিত আছে, রাজা উমাপতি দেবভট্ট নামে জনৈক ভূস্বামী এখানে কামেশ্বরনাথ জীউর মন্দির নির্মাণ করতে শুরু করেন, কিন্তু কোনও অজ্ঞাত কারণে মন্দিরের চূড়াটি অসমাপ্ত থেকে যায়। সেই কারণে স্থাননাম হয় নেড়া দেউল।

নেহালপুর: উ চব্বিশ পরগনা
জনশ্রুতি আছে, বহুকালপূর্বে সুদূর বাগদাদ থেকে দু'জন মুসলমান ভ্রাতা ধর্ম প্রচারের জন্য এই স্থানে এসে বসতি স্থাপন করেন। ক্রমে তাঁরা এই স্থানের জমিদার হয়ে বসেন। উক্ত ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে একজনের নাম নেহালান্দন ছিল বলে জানা যায়। কথিত আছে, তাঁরই নামানুসারে স্থাননাম নেহালপুর হয়। নথিপত্রে 'নেহালান্দন' নাম পাওয়া গেলেও নামটি মুসলমানি বলে মনে হয় না।

নৈপুর: পূ মেদিনীপুর
কথিত আছে, প্রায় চারশো বৎসর আগে জ্ঞানানন্দ দেব নামক এক ব্যক্তি রাজপুতানা থেকে এই স্থানে এসে বসতি গড়ে তোলেন এবং স্থাননাম দেন নয়াপুর। নয়াপুর পরে অপভ্রংশে নৈপুর হয়েছে।

নৈহাটি: উ চব্বিশ পরগনা

পূর্বনাম নদীহট্টিকা, অর্থ নদীর তীরবর্তী হাট বা বাজার। অপভ্রংশে নৈহাটি হয়েছে। এক মতে নয়া হাট থেকে নৈহাটি হয়েছে। আরও এক মতে 'নটীর হাট' থেকে অপভ্রংশে নৈহাটি হয়েছে। কারও কারও মতে এটা নয় সংখ্যাবাচক নাম। নয় বা ন'টি হাট বা হাটি থেকে নৈহাটি নাম হয়ে থাকবে।

নৈহাটি উত্তর চব্বিশ পরগনার একটি প্রাচীন সমৃদ্ধ জনপদ। রেলওয়ে জংশন। নৈহাটির কাঁঠালপাড়ায় সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মস্থান। তা ছাড়া নৈহাটির টোল বিখ্যাত।

নৈহাটি নামে বর্ধমান জেলায় একটি স্থান আছে।

প্রচলিত ছড়া:

কলা, মুলো, শাকের আটি,
এ তিন নিয়ে নৈহাটি ॥

নোহারী: প মেদিনীপুর

পূর্বনাম লোহারী, অপভ্রংশে নোহারী হয়েছে। শোনা যায় পূর্বে এখানে বগড়ী রাজাদের অস্ত্র তৈরির কারখানা ছিল। লৌহজাত অস্ত্র-শস্ত্র তৈরি হত বলে স্থানের নাম হয় লোহারী, পরে নোহারী হয়েছে।

নোয়াশা: নদিয়া

শোনা যায় সেনরাজ লক্ষ্মণসেন গঙ্গানদী-পথে পালিয়ে যাওয়ার সময় এই জায়গায় কিছুদিন আত্মগোপন করে ছিলেন। কেউ যাতে তাঁর 'হুঁশ' (ফরাসি 'হোস' শব্দের বিবর্তিত রূপ) না পায় তার জন্য তিনি সতর্ক থাকতেন। সেই থেকে নাম হয় না-হুঁশ'। ক্রমে 'না-হুঁশ' 'নাহুঁশা' এবং 'নাহ্শা'-এ বিবর্তিত হয় এবং পরবর্তীকালে অপভ্রংশে নোয়াশা হয়।

নৃসিংহপুর: নদিয়া

কবি কৃত্তিবাসের আদিপুরুষ নরসিংহ ওঝার নামানুসারে স্থাননাম।

ন্যাজাট: উ চব্বিশ পরগনা।

স্থানটির আকৃতি অনেকটা গোরুর ল্যাজের মতো দেখতে হওয়ায় স্থানের নাম প্রথমে ল্যাজহাট হয়, পরে অপভ্রংশে ন্যাজাট হয়েছে।

মেদিনীপুরেও ন্যাজাট নামে স্থান পাওয়া যায়।

পঞ্চানন্দপুর: মালদহ

পঞ্চানন মণ্ডল নামে এক বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রথম এখানে বাস করতে আসেন। তাঁর নাম থেকেই স্থাননাম পঞ্চানন্দপুর হয়েছে বলে অনুমিত।

পদমতী: জলপাইগুড়ি

নবাবি আমলে পদম্ সিং নামে জনৈক জায়গিরদার এই অঞ্চলের অধিপতি ছিলেন। তাঁর নামানুসারে স্থাননাম পদমতী হয়েছে বলে অনুমিত।

পরেশনাথ: বাঁকুড়া

এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত পরেশনাথ শিবের মন্দির থেকে স্থাননাম পরেশনাথ হয়েছে।

পরেশনাথপুর: মুর্শিদাবাদ

একদা এই অঞ্চলে পরেশচন্দ্র রায় নামে জনৈক জমিদারের আধিপত্য ছিল। তাঁর নামানুসারেই স্থাননাম পরেশনাথপুর হয়েছে।

পলতা: উ চব্বিশ পরগনা

পূর্বনাম 'পলিতকা' অপভ্রংশে পলতা হয়েছে। সম্ভবত পলতা বা পটল জাতীয় ফসলের সঙ্গে জড়িত স্থাননাম। 'পলিতকা' স্থাননামের উল্লেখ Khalimpur Grant of Dharmapala, North Central Bengal, 1st quater of 9th century-তে পাওয়া যায়।

পলাশী: নদিয়া

কথিত আছে, পূর্বে এই অঞ্চলে পলাশ গাছের বন থাকায় স্থাননাম পলাশী হয়েছে। কিন্তু বহুকাল থেকে পলাশ বন বা গাছের কোনও চিহ্ন মাত্র নেই। স্থানটি ইতিহাস বিশ্রুত পলাশী যুদ্ধক্ষেত্র রূপে খ্যাত। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে এখানে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার সেনাবাহিনীর সঙ্গে ক্লাইভের অধিনায়কত্বে ইংরেজদের যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে জয় লাভ করে ইংরেজরা কার্যত বাংলার আধিপত্য লাভ করে এবং ভারতে ইংরেজ শাসনের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

পলাশী নামে হুগলি ও মুর্শিদাবাদ জেলায় এক একটি স্থান আছে।
প্রচলিত ছড়া:

ঘোড়ার ক্ষুরে উড়ে গেল
পলাশী পরগনা।

* * *

কি হল রে জন,
পলাশী ময়দানে নবাব হারায় পরান,
পলাশী ময়দানে উড়ে কম্পানি নিশান ॥

পহলানপুর: বর্ধমান
জনশ্রুতি আছে, হোসেন শাহের সেনাপতি শাহ্ পহলান সাহেব বর্ধমান থেকে যাত্রা করে অশ্বারোহে রাঙামাটি ছাউনিতে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ দামোদরের দক্ষিণপাড়ে শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে শরীর থেকে তাঁর মাথা বিচ্ছিন্ন হয়, কিন্তু বেগবান অশ্বটি তাঁর মস্তকহীন দেহ নিয়ে তিরবেগে এই স্থানে এলে তাঁর দেহ অশ্বের পিঠ থেকে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তাঁর মস্তকহীন দেহ এই স্থানেই সমাধিস্থ করা হয়। পরবর্তীকালে তিনি জনসমাজে পীরের সম্মান লাভ করেন এবং পীর পহলান 'সাহেব নামে পরিচিত হন। তাঁর নামানুসারেই স্থাননাম পহলানপুর হয়েছে।

পাঁচগ্রাম: মুর্শিদাবাদ
পূর্বে এই অঞ্চলে মোস্তাফাপুর, পলাশপুর, কৃষ্ণগঞ্জ, মনোহরপুর ও হাজিপুর নামে পাঁচখানি ছোট ছোট গ্রাম ছিল। কালক্রমে এই পাঁচটি গ্রাম একত্র হয়ে একটি বড়গ্রামে পরিণত হয়। এই জন্যই সম্ভবত স্থাননাম পাঁচগ্রাম হয়েছে।

পাঁচথুপি: মুর্শিদাবাদ
এই স্থানের একটি দেউলের ধ্বংসাবশেষকে স্থানীয় লোকেরা একটি প্রাচীন বৌদ্ধবিহারের ধ্বংসাবশেষ বলে মনে করে। অনেকে বলেন এই বৌদ্ধবিহারে একদা পাঁচটি স্তূপ ছিল। সেই থেকে স্থানের নাম হয় 'পাঁচস্তূপ', যা পরে অপভ্রংশে পাঁচথুপি হয়েছে।

প্রচলিত ছড়া:

জজান, পাঁচথুপি মহাস্থান।
পেটে ভাত নাই, মুখে পান ॥

পাঁচমুড়া: বাঁকুড়া

প্রচলিত ছড়া:

পাঁচমুড়ার হাতি ঘোড়া।
পুরুলিয়ার 'লা'।
বিষ্ণুপুরের শাঁখা পরে
সেজেছেন মনসা মা ॥
('লা'— লাক্ষাজাত আলতা।)

পাঁচাল: বাঁকুড়া

এই স্থাননামের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না, কিন্তু রত্নেশ্বর শিবের জন্য খ্যাত এই স্থানটি একদা মল্লরাজের অধীন একটি বর্ধিষ্ণু জনপদ ছিল এবং এখানে লায়েক মিশির, (মিশ্র পদবিধারী ব্রাহ্মণ) বাউরি (অন্ত্যজ জাতি) এবং বাঁদরের প্রাধান্য ছিল বলে জানা যায়। এখানকার পরিতৃপ্ত গ্রামবাসীরা নিজেদের গ্রামকে 'নন্দন কানন' বলে অভিহিত করত। এই সম্বন্ধে একটি প্রচলিত ছড়া আছে—

লায়েক, মিশির, বাউরী, বাঁদর।
তিন দিকে তার বেড়া কাঁদর ॥
পশ্চিমেতে শালের বন।
এরই মাঝে নন্দন কানন ॥

এখানকার রত্নেশ্বর শিব সম্বন্ধে জনশ্রুতি আছে যে এই স্থানের আদি বাসিন্দা মিশ্র পরিবারের জনৈক পূর্বপুরুষ কানপুরের নিকটবর্তী স্থান বসোয়ায়া রঞ্জিৎপুরা থেকে পুরী যাওয়ার পথে বিষ্ণুপুরে এলে বিষ্ণুপুরের রাজা তাঁকে রাজ বা সরকারের কাজে নিয়োগ করেন এবং রাজা গোপাল সিং ওই ব্রাহ্মণকে পাঁচাল গ্রামখানি দান করেন। রত্নেশ্বর শিব মন্দিরটি সেই ব্রাহ্মণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় বলে জানা যায়।

প্রচলিত ছড়া:

হাতি, ঠেলা, ধান চাল।
তবে জানবি পাঁচাল ॥

পাইকড়: বীরভূম

প্রচলিত ছড়া:

গগনপুরের ধুলো।
পারকান্দীর মুলো।
পাইকড়ের মাটি।
বংশবাটির বেটি।
ধরে ধরে কাটি ॥

পাকপাড়া: বীরভূম

প্রচলিত ছড়া:

পাকপাড়া লক্ষ্মীছাড়া।
ঘরে ঘরে মদের হাঁড়া ॥

পাগলঝোরা: দার্জিলিং

মূল নেপালি থেকে উদ্ভূত নাম, অর্থ মত্ত জলধারা।

পাগলার হাট: জলপাইগুড়ি

কথিত আছে, এই স্থানে এক 'পাগল' কোটাল একটা বাজার বা হাট বসিয়েছিল। সেই থেকে স্থাননাম পাগলার হাট হয়েছে বলে অনুমিত।

পাখান্না: বাঁকুড়া

একদা এই স্থানের এক বৃহৎ পুষ্করিণীর আশেপাশে অনেকগুলি ছোট ছোট পুকুর বা পোখর ছিল। স্থানীয় লোকেরা সেই পুকুরগুলিকে পোখনা বা পোখারণ বা পুষ্করণা নামে অভিহিত করত। সেই থেকে ক্রমে অপভ্রংশে 'পাখান্না' স্থাননাম হয়েছে বলে অনুমিত।

পাটকেবাড়ি: নদিয়া

প্রচলিত ছড়া:

পাটকেবাড়ি ডুবুডুবু
গলায়দড়ে ভাসে
সোনার বোকায়াল আমার
বসে বসে হাসে।

পাটুলী: হুগলি

পাট + টুলি = পাটুলী। পাট বা পাট চাষের সঙ্গে জড়িত নাম। কেউ কেউ মনে করেন প্রাচীন পাটলিপুত্রের নামের অনুকরণে পাটুলী নামকরণ হয়েছে। পাটুলীর মঠবাড়ি হুগলি জেলার অন্যতম প্রাচীন নিদর্শন। মঠবাড়িতে অনুষ্ঠিত পুজোয় দেবী দুর্গার দুটি মাত্র হাত বাইরে থেকে দেখা যায়। বাকি আটটি হাত পেছনে অপ্রকট থাকে। তা ছাড়া দুর্গার দক্ষিণে কার্তিক ও বামে গণেশ থাকে। এই ধরনের অদ্ভুত দুর্গা প্রতিমা আর কোথাও দেখা যায় না। শোনা যায় কোনও এক সময় এখানে দুর্গার সামনে নরবলি হত।

প্রচলিত ছড়া:

পাটুলী ডুবুডুবু
দামপাল ভাসে।
সোনার নারায়ণপুর
খিলখিলিয়ে হাসে ॥

পাণ্ডুয়া: মালদহ

মালদহের (ইংরেজবাজার) কাছেই অবস্থিত প্রাচীন জনপদটি এক সময় সমগ্র বাংলাদেশের রাজধানী ছিল এবং উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত হয়েছিল। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থাদিতে এবং ইতিহাসে স্থানটি পুণ্ড্রবর্ধন, পুণ্ড্রনগর, পুণ্ড্ররাজ্য, পুণ্ড্রদেশ, পৌণ্ড্রবর্ধন নামে উল্লেখ পাওয়া যায়। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত নানা গ্রন্থে পুণ্ড্ররাজ্যের উল্লেখ আছে। প্রবাদ আছে, মহাভারতখ্যাত পাণ্ডবরা অতীতে এই জনপদ স্থাপন করেছিলেন। এখানকার সাতাশঘরা দিঘি অর্জুন খনন করেছিলেন বলে অনেকে মনে করেন। বর্তমানে ধ্বংসস্তুপের মধ্যে অবস্থিত একটি ছোট দালান স্থানীয় লোকেদের কাছে পাণ্ডব রাজার দালান

নামে পরিচিত। পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রাপ্ত একটি মুদ্রা থেকে জানা যায় যে স্থানটি একদা পাণ্ডুনগর নামে পরিচিত ছিল। ঋগ্‌বেদে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে 'পুণ্ড্র'-এর উল্লেখ আছে। প্রাচীন কালে উত্তরবঙ্গে বহু পুণ্ড্র জাতি বাস করত। অনেকে মনে করেন যে এই শব্দ থেকে 'পলু' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। 'পলু' অর্থে রেশমকীট এবং রেশমকীট পালনকারীদের 'পুণ্ডরী' নামে অভিহিত করা হত। সম্ভবত সেই সূত্রে পদ্মপুরাণে এই স্থানকে পুণ্ড্ররাজ্য নামে উল্লেখ করা হয়েছে। পদ্মপুরাণে উল্লিখিত একশো আট প্রধান তীর্থের মধ্যে পুণ্ড্রবর্ধনের পাটলা তীর্থ এবং দেবী পুরাণে পাটলা দেবী বা পাতলা চণ্ডীর নাম পাওয়া যায়। মুসলমান আমলে এক সময় স্থানটি 'পিরুয়া' এবং ফিরোজাবাদ নামে অভিহিত হত। রিয়াজউস সালাতিনের মতে আলাউদ্দিন আলি শাহকে নিহত করে সামসুদ্দিন যখন 'হজরত' পাণ্ডুয়ার সিংহাসনে অবতরণ করেন, তখন থেকে মুসলমান ইতিহাসে পাণ্ডুয়া নাম পাওয়া যায়।

পাণ্ডুয়া: হুগলি

হুগলি জেলার এই স্থানটি পূর্বে 'পণ্ডুনগর' বা 'পাণ্ডুনগর' নামে পরিচিত ছিল। অনেকে মনে করেন, উত্তরবঙ্গের প্রসিদ্ধ পাণ্ডুয়ার নামের অনুকরণে এই স্থানের নাম পাণ্ডুয়া রাখা হয়। ভিন্নমতে ভূরিশ্রেষ্ঠরাজ পাণ্ডুদাসের নামানুসারে এই স্থানের নাম পাণ্ডুয়া হয়। এমনও প্রবাদ আছে যে বুদ্ধদেবের পিতৃব্য অমৃতোদন শাক্যের পুত্র পাণ্ডু শাক্য সপরিবারে পবিত্র তীর্থ ত্রিবেণীর কাছে গঙ্গাতীরে এসে বাস করেন এবং কালক্রমে সেখানে একটি রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁরই নাম অনুসারে তাঁর রাজধানী পাণ্ডুনগর বা পাণ্ডুয়া নামে খ্যাত হয়। চলতি কথায় স্থানটি 'পেঁড়ো' বা 'ছোট পেঁড়ো' নামে পরিচিত। (উত্তরবঙ্গের পাণ্ডুয়াকে 'বড় পেঁড়ো বলা হয়)। গৌড়রাজ শামস্‌-উদ্‌-দীন ইউসুফ শাহ (১৪৭৬-১৪৮৩ খ্রি.) পাণ্ডুয়ার হিন্দুরাজ্য জয় করেন। তখন এখানে বহু হিন্দু মন্দির ছিল। কিন্তু মুসলমান রাজত্বকালে হিন্দু মন্দিরগুলিকে মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়। স্থানটি বাংলায় বিপ্লবের দীক্ষাগুরু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের জন্মস্থান। বাংলায় প্রথম রেলপথ পাণ্ডুয়া পর্যন্ত ছিল।

প্রচলিত ছড়া:

পাণ্ডুয়াতে তাড়ি ভাল, চিনিদানার ছুঁড়ি।
চ্যাংলাতে হাঁড়ি ভাল, দিনাজপুরের মুড়ি ॥

পাতলা খাওয়া: জলপাইগুড়ি
জনশ্রুতি আছে, পাটুলি দাস নামে এক বিশিষ্ট রাজবংশী পুরুষ এক সময় এই স্থানে 'খানা' বা ভাত খেয়েছিলেন। সেই 'খাওয়া' থেকে স্থাননাম হয় 'খাওয়া', যা পরে 'পাতলা খাওয়া'য় বিবর্তিত হয়।

পাতিরাম: দ দিনাজপুর
পূর্বনাম রহিমপুর। পাতিরাম নামে জনৈক রাজা এখানে বাস করতেন বলে পরবর্তীকালে তাঁর নামানুসারে স্থাননাম পাতিরাম হয়।
পাত্রসায়ের: বাঁকুড়া
সুকুমার সেন জানিয়েছেন, পাত্র + সায়ের (ফারসি) অর্থাৎ যেখানে রাজকবির বাস অথবা যেখানে রাজকর্মচারীর খোঁড়া খুব বড় দিঘি আছে।
প্রচলিত ছড়া:

কিষ্টনগর ডুবুডুবু
বেন্দা ভাসে।
সোনার পাত্তোসায়ের
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসে ৷৷

পানখাই: পূ মেদিনীপুর
হুগলি নদীর চড়ার ওপর গড়ে ওঠা এই স্থানটি স্থানীয় জমিদার তাঁর কন্যাকে বিয়ের যৌতুক হিসাবে 'পানখাবার' জন্য দান করেন বলে স্থানের নাম 'পানখাই' হয়েছে বলে অনুমিত।

পানিঘাটা: দার্জিলিং
মূল নেপালি থেকে উদ্ভূত স্থাননাম। অর্থ জল-কল (Water-mill)। স্থানীয় লোকে এই জলকলের সাহায্যেই আনাজ শস্য পেষাই করত বলে জানা যায়।

পানিহাটি: উ চব্বিশ পরগনা
জনসমাজে চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদ রাঘব পণ্ডিতের সঙ্গে জড়িত স্থান বলে খ্যাত এই স্থানটি একদা বাণিজ্যপ্রধান স্থানরূপে 'পণ্যহাটি' নামে পরিচিত ছিল। পণ্যহাটি অপভ্রংশে পানিহাটি হয়েছে বলে অনুমান করা হয়। সুকুমার

সেনের মতে, পানের হাট থেকে এসেছে। চৈতন্যমঙ্গল, চৈতন্যভাগবত এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃততে পানিহাটি নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। পানিহাটিতে গঙ্গাতীরে প্রায় সাতশো বছর পুরনো বলে অনুমিত একটি অতি প্রাচীন বটগাছ আছে। বটগাছের পাশে একটি অতি প্রাচীন ঘাটের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। এই ঘাটের একটা প্রস্তরফলকে লেখা আছে ঘাটটি হিন্দু আমলে তৈরি এবং ১৫১৪ খ্রিস্টাব্দে পুরী থেকে ফেরার সময় শ্রীচৈতন্য এই ঘাটে নৌকা থেকে অবতরণ করেছিলেন। প্রতি বৎসর চৈতন্যদেবের আগমন-স্মরণ উপলক্ষে কার্তিক মাসের কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথির পরবর্তী রবিবারে এখানে মহোৎসব ও মেলা হয়। বটগাছের কাছে একটি ছোট ঘরে শ্রীচৈতন্যদেবের চরণচিহ্ন রাখা আছে বলে জানা যায়। কলকাতার মহানির্বাণ মঠের প্রতিষ্ঠাতা প্রসিদ্ধ অবধূত জ্ঞানানন্দ স্বামী পানিহাটিতে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রচলিত ছড়া:

পানিহাটি সম গ্রাম নাহি গঙ্গাতীরে।
বড় বড় সমাজ সব পতাকা মন্দিরে ৷৷

কাজের বেলায় আমড়ার আঁটি।
বাড়ি কোথা না পানিহাটি ৷৷

পারকাঁদি: বীরভূম

প্রচলিত ছড়া:

পারকাঁদির মুলো।
গগনপুরের ধুলো ৷৷
বাঁশোড়ার বেটি।
পাইকরের মাটি ৷৷

পারকুলা: নদিয়া

প্রচলিত ছড়া:

যার নাই চাল কুলো।
সে যায় পারকুলো ৷৷

পিপলিয়া: হাওড়া
পূর্বনাম 'পিপ্পলি' অপভ্রংশে পিপলিয়া হয়েছে। 'পিপ্পলি' (Pippali) নামের উল্লেখ Khalimpur Grant of Dharmapala-তে পাওয়া যায়।

পিফা: উ চব্বিশ পরগনা
শোনা যায় এক সময় এখানকার উর্বর জমি প্রচুর শাকসবজি এবং এক বিশেষ প্রকার পেঁপের জন্য খ্যাত ছিল। পেঁপের সুখ্যাতির জন্য স্থানের নাম হয় 'পেঁপে', যা পরে অপভ্রংশে 'পিফা' হয়েছে বলে অনেকে অনুমান করেন।

পীড়রাবনি: বাঁকুড়া
'পিড়রা' এক প্রকার স্থানীয় জংলি গাছ বা আগাছার নাম। এক সময়ে এখানে এই জাতীয় আগাছার জঙ্গলে পূর্ণ ছিল বলে স্থাননাম 'পীড়রাবনি' হয়ে থাকবে।

পীরপুর: নদিয়া
কথিত আছে, বহু পূর্বে এখানে শাহ্ এনাত নামে এক সিদ্ধ ফকির বাস করতেন। তাঁর সম্মানেই স্থাননাম পীরপুর হয়েছে বলে অনুমিত।

পুটীজোল: মুর্শিদাবাদ
এই স্থাননামের উল্লেখ Khalimpur Grant of Dharmapala, North Central Bengal, 1st quarter of the 9th Century-তে পাওয়া যায়।

পুরুলপাড়া: হাওড়া
এক সময়ে এখানে প্রচুর ঝিঙে ও ধুন্দুল চাষ হত। পাকা ঝিঙে ও ধুন্দুলের খোসা গায়ে সাবান মাখা ইত্যাদি কাজে ব্যবহার হয়ে থাকে। স্থানীয় লোকে এই খোসাকে 'পুরুল' বলে। অনুমান করা হয় এখানে প্রচুর পুরুলের চাষ হওয়ার জন্য স্থাননাম পুরুলপাড়া হয়েছে।

পুরুলিয়া: পুরুলিয়া
মুকুন্দরাম পুরুল্যা (ধুঁদুল) আগাছার উল্লেখ করেছেন।

প্রচলিত ছড়া:

পেট মোটা, গলা সরু।
তবে জানবি পুরুলিয়ার গোরু ॥
* * *
'ছট', খরা, কুষ্ঠ।
পুরুলিয়ার বৈশিষ্ট্য ॥
* * *
উঁই, পঁই, ডিংলা (কুমড়ো)
তিন নিয়ে পুরুল্যা ॥
* * *
পাঁচমুড়ার হাতিঘোড়া,
পুরুলিয়ার 'লা'
বিষ্ণুপুরের শাঁখা পরে,
সেজেছেন মনসা মা ॥

পেডং: দার্জিলিং
মূল তিব্বতি থেকে উদ্ভূত নাম। অর্থ 'পো' বা শাল জাতীয় এক প্রকার গাছের রস বা আঠা যা থেকে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা তাঁদের মন্দিরের জন্য বিশেষ প্রকার ধূপবাতি তৈরি করতেন। এই 'পো' জাতীয় গাছ এক সময়ে এই অঞ্চলে প্রচুর দেখা যেত বলে জানা যায়।

পৈতাচুরি: নদিয়া
কথিত আছে, এই এলাকার এক রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারের বাড়ি থেকে পৈতা চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থাননাম পৈতাচুরি হয়েছে।

পোপড়া: মুর্শিদাবাদ
প্রচলিত ছড়া:

সাগরদিঘি পোপড়া।
দেখেশুনে পা বাড়া ॥

পোবং: দার্জিলিং

মূল লেপচা থেকে উদ্ভূত নাম, অর্থ 'পো' জাতির এক বিশেষ প্রকার বাঁশ গাছের স্থান।

পোলবা: হুগলি

কথিত আছে, বহুকাল পূর্বে স্থানীয় পালবংশের কোনও পূর্বপুরুষ এখানে এসে বসবাস করেন। সেই সময় আশেপাশের স্থান প্রায়ই বন্যার জলে ভেসে যেত। বন্যার প্রকোপ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য তাঁরা অপেক্ষাকৃত উঁচু এই জায়গাটি বেছে নেন। পরে বসতি গড়ে উঠলে স্থানটি পালবংশের বাস থেকে 'পালবাস' নামে পরিচিত হয়। পরে অপভ্রংশে পালবাস থেকে 'পালবা' এবং পালবা থেকে 'পোলবা' হয়েছে বলে অনুমিত।

প্রদ্যুম্ননগর: নদিয়া

জনশ্রুতি আছে, শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন চক্রতীর্থে সিদ্ধি লাভ করে এখানে নিজের নামে একটি নগর স্থাপন করেন। আর এক মতে প্রদ্যুম্ন রায় নামক জনৈক রাজা এই স্থানের প্রতিষ্ঠাতা। স্মার্ত রঘুনন্দন মুক্তবেণীর স্থান নির্দেশ করতে গিয়ে প্রদ্যুম্ননগরের নাম উল্লেখ করেছেন। কারও কারও মতে প্রাচীনকালে বর্তমান চক্রদহ বা চাকদহ প্রদ্যুম্ননগরের এক অংশ ছিল। পুরনো জমিদারি নথিপত্রে প্রদ্যুম্ননগর এবং প্রদ্যুম্নহ্রদের উল্লেখ পাওয়া যায়।

প্রিয়নগর: নদিয়া

কথিত আছে, বহু পূর্বে স্থানীয় বিশিষ্ট চট্টোপাধ্যায় বংশে প্রিয়বালা দেবী নামে জনৈকা দানশীলা ও ধর্মপরায়ণ মহিলা ছিলেন। তাঁর দানশীলতার খ্যাতির জন্যই স্থাননাম 'প্রিয়নগর' হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।

ফকিরগঞ্জ: দ দিনাজপুর

প্রায় তিন শতাধিক বছর আগে এখানে একজন মুসলমান ফকিরের আবির্ভাব হয়। তিনি এখানে আস্তানা স্থাপন করে সাধন ভজন করে কালাতিপাত করতেন। ফকিরের মৃত্যুর পর তাঁর আস্তানা পীরের দরগাহ বলে প্রসিদ্ধি লাভ করে। কালক্রমে ফকিরের আস্তানা থেকে স্থাননাম হয় ফকিরগঞ্জ।

ফরাজিপাড়া: নদিয়া

'ফরাজ' কথার অর্থ আল্লার অনুসরণকারী। কথিত আছে, শরিয়তউল্লাহ নামের এক জন কুসংস্কার-মুক্ত মুসলমান এবং তাঁর পুত্র মহম্মদ মহসীন ওরফে দুদুমিঞা প্রচলিত মুসলমান ধর্মের মৌলিক সংস্কার সাধন করে মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে ফরাজি ধর্মমত প্রচার করেন। ফরাজি মুসলমানরা সাধারণত সংঘবদ্ধ ভাবে কোনও এলাকায় একত্র বসবাস করতেন এবং ক্রমে সেই এলাকা ফরাজিপাড়া নামে পরিচিত হয়।

ফরাসডাঙ্গা: হুগলি

প্রচলিত ছড়া:

গাঁজা, গুলি, অন্নভাঙ্গা।
এ তিন নিয়ে ফরাসডাঙ্গা ৷৷

ফরিদপুর: মুর্শিদাবাদ

শাহ্ ফরিদ নামে এক দরবেশ ধর্মপ্রচারের জন্য এখানে এসে আস্তানা গাড়েন। তাঁর মৃত্যুর পর সেই আস্তানাতেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয় এবং স্থানটি ক্রমে পীরের স্থাননামে খ্যাত হয়। ক্রমে জনবসতি গড়ে উঠলে শাহ্ ফরিদের নামে স্থাননাম হয় ফরিদপুর।

ফলতা: দ চব্বিশ পরগনা

পূর্বনাম পুলতা, অপভ্রংশে ফলতা হয়েছে বলে অনুমিত।

ফাঁসিতলা: নদিয়া

কথিত আছে, সেকালে নীলকর সাহেবরা এখানে বিদ্রোহী নীলচাষিদের গাছে ঝুলিয়ে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করত। সেই থেকে স্থাননাম ফাঁসিতলা হয়েছে বলে অনুমিত।

ফালাকাটা: জলপাইগুড়ি

স্থানীয় গ্রাম্যদেবী পাঁচটি সিংহের ওপর অবস্থিত ফালাকাটা দেবীর নামানুসারে স্থাননাম ফালাকাটা হয়েছে। ফালাকাটা দেবী কালী বা মহাকালের প্রতিমূর্তিরূপে পূজিতা।

ফালুট: দার্জিলিং

মূল লেপচা শব্দ 'ফাক লুট' থেকে উদ্ভূত নাম। অর্থ, খোলা ছাড়ানো পাহাড়। এই নামের কারণ, এই পাহাড়ি এলাকা শুষ্ক এবং বৃক্ষহীন কিন্তু এর নীচের পাহাড়গুলি ঘন জঙ্গলে পূর্ণ। আদিতে স্থানটি তিব্বতি ভাষায় ফালালুম (Phalalum বা Phali-lung) নামে পরিচিত ছিল। লেপচাদের বিকৃত উচ্চারণে স্থাননাম হয় ফাক-লুট যা পরে অপভ্রংশে ফালুট হয়েছে।

ফুরফুরা: হুগলি

পূর্বনাম 'বালিয়া বাসন্তী'। হজরত শাহ সুফি স্থানীয় বাগ্‌দি রাজাকে পরাজিত করে এই স্থানটি দখল করলে স্থানটি ফুরফুরা শরীফ নামে পরিচিত হয়। ফুরফুরা শব্দের তাৎপর্য অস্পষ্ট। স্থানটি মুসলমানদের একটি পবিত্র স্থান।

সুকুমার সেন 'বাংলার স্থান নাম' বইয়ে লিখছেন, 'নামটির তিন ব্যুৎপত্তি মনে জাগছে। আরবী অথবা ফারসি শব্দ। (১) আরবী 'ফুরফুর'— চড়ুইয়ের মতো পাখি; (২) ফারসী 'ফুরফুরূজান্‌' থেকে মানে 'সৃষ্টিকর্তা', (৩) ফারসী 'ফুরফুরিয়াস্‌' থেকে, মানে এক পীরের নাম, সিকন্দরের সহচর। শেষের ব্যুৎপত্তিটিই লাগসই। এখানে বড়ো পীরের দরগা আছে।'

ফুরসেরিং: দার্জিলিং

মূল তিব্বতি থেকে উদ্ভূত নাম। ফুরপু স্রিং নামক এক সর্দারের সঙ্গে জড়িত নাম। স্রিং নামক ব্যক্তি যার জন্ম ফুরপু অর্থাৎ বৃহস্পতিবারে হয়েছে সেই থেকে ফুরপুস্রিং এবং অপভ্রংশে ফুরসেরিং হয়েছে। জন্মদিনের সঙ্গে জড়িত করে তিব্বতিদের মধ্যে নবজাতকদের নামকরণ করার রীতি আছে বলে শোনা যায়।

ফুলখালি: নদিয়া

এককালে স্থানটি মুসলমান প্রধান ছিল। শোনা যায় মুসলমানেরা 'ফুলখেলা'য় পারদর্শী ছিলেন। 'ফুলখেলা' একটি স্থানীয় শব্দ। অর্থ 'হা-ডু-ডু' খেলা। স্থানীয় অধিবাসীদের ফুলখেলার পারদর্শিতা থেকে স্থাননাম হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। অন্যমতে 'ফুল্ল' থেকে ফুল শব্দ এসেছে এবং 'খাল' বিশিষ্ট স্থান বলে খাল থেকে 'খালি' শব্দযোগে স্থাননাম 'ফুলখালি' হয়েছে।

ফুলগেড়িয়া: প মেদিনীপুর

প্রচলিত ছড়া:

পা গোদা, মাথা হেঁড়ে।
তার বাড়ি ফুলগেড়ে ॥

ফুলিয়া: নদিয়া

ফুলের বাগান থেকে ফুলিয়া নাম হয়েছে। স্থানটি কৃত্তিবাসের জন্মস্থান রূপে খ্যাত। কথিত আছে, কৃত্তিবাসের সময় ফুলিয়া অতি সমৃদ্ধ স্থান ছিল। কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণীতে পাওয়া যায়।

মালীজাতি ছিল তথায় মালঞ্চ এথানা।
ফুলিয়া বলিয়া কৈল তাহার ঘোষণা ॥
(মালঞ্চ = মালা + মঞ্চ। অর্থাৎ ফুলের বাগান।)

ফুলের বাগান এবং মালীদের সঙ্গে জড়িত স্থাননাম।

কৃত্তিবাস লিখেছেন—

গ্রামরত্ন ফুলিয়া জগতে বাখানি।
দক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙ্গা তরঙ্গিণী ॥

প্রচলিত ছড়া:

ফুলিয়ায় কৃত্তিবাস গায় সুধা ভাণ্ড।
রাবণেরে মজাইতে বিধাতার কাণ্ড ॥

* * *

স্থানের প্রধান যে ফুলিয়ায় নিবাস।
রামায়ণ গান দ্বিজ মনে অভিলাষ ॥

কৃত্তিবাসের স্মৃতিস্তম্ভের গায়ে লেখা আছে—

হেথা দ্বিজোত্তম,
আদি কবি বাংলার ভাষা রামায়ণ কার।
কৃত্তিবাস লভিলা জনম।
সুরভিত সুকবিত্বে ফুলিয়া পুণ্য তীর্থে
হে পথিক, সম্ভ্রমে প্রণাম ॥

ফ্রেজারগঞ্জ: দ চব্বিশ পরগনা

পূর্বনাম নারায়ণতলা। ১৯০৩-১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে স্যার অ্যানড্রু ফ্রেজার যখন বাংলায় গভর্নর ছিলেন তখন গঙ্গার মোহনায় নারায়ণতলা নামক এই মনোরম দ্বীপটিকে কলকাতাবাসীর বায়ু পরিবর্তনের জন্য একটি স্বাস্থ্যনিবাসে পরিণত করেন। সেই সময় অ্যানড্রু ফ্রেজারের নামানুসারে স্থানটি ফ্রেজারগঞ্জ নামে পরিচিত হয়।

বংশবাটী/বাঁশবেড়িয়া: হুগলি

প্রাচীন সপ্তগ্রামের অন্যতম প্রধান গ্রাম। স্থান নামকরণ সম্বন্ধে জানা যায় যে একসময় এখানে ভাগীরথীর তীরে বহু বাঁশঝাড় ছিল। সেই বাঁশবন থেকে বংশবাটী নামের উৎপত্তি হয়েছে। একদা সারবন্দি ঘন বাঁশঝাড়ের বেড় শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে দুর্ভেদ্য ব্যূহের কাজ করত। শোনা যায় এই বাঁশঝাড়ের বেড়ার জন্যই এক সময়ে বর্গির হানা থেকে বাঁশবেড়িয়ার রাজারা আত্মরক্ষা করতে এবং বর্গিদের পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। একসময় এই স্থানে বহু পণ্ডিতের বাস ছিল বলে জানা যায়। দীনবন্ধু মিত্রের সুরধুনী কাব্যে আছে—

পরিপাটি বংশবাটী স্থান মনোহর,
যে দিকে তাকাই দেখি সকলি সুন্দর।
বিদ্যাবিশারদ কত পণ্ডিতের বাস।
সুগৌরবে শাস্ত্রালাপ করে বার মাস।
এই স্থানে জন্মেছিল শ্রীধর রতন।
কথককুলের কেতু কাঞ্চনবরণ।
সুভাবে রচিল কত গীত মধুময়।
শুনিলে আনন্দে নাচে লোকের হৃদয় ॥

প্রচলিত ছড়া:

কার্তিক, কাঁসারী, উদগেড়ে
এ তিন নিয়ে বাঁশবেড়ে ॥

* * *

গগনপুরের ধুলো।
পারকান্দীর মুলো।

পাইকড়ের বঁটি।
বংশবাটির বেটি।
ধরে ধরে কাটি ॥

বক্রেশ্বর: বীরভূম

বক্রেশ্বর নামকরণ ও স্থানমাহাত্ম্য এবং এখানকার সর্বজন বিদিত উষ্ণ প্রস্রবণের উৎপত্তি সম্বন্ধে দুটি পৌরাণিক কাহিনি আছে। সত্যযুগে সুব্রতমুনি লক্ষ্মীর স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হলে তাঁকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন না করায় অপমানে তিনি ওই সভা ত্যাগ করেন এবং অপরিসীম ক্রোধে তাঁর দেহের অষ্টঅঙ্গ বেঁকেচুরে যায়। এই কারণে তিনি অষ্টবক্রমুনি নামে পরিচিত হন। অষ্টবক্রমুনি এমন কদাকার চেহারা নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে কাশীতে এসে হাজির হন এবং শিবত্ব প্রাপ্তির জন্য তপস্যা আরম্ভ করেন। তপস্যাকালে তাঁর প্রতি দৈবাদেশ হয় যে, তিনি গৌড়দেশে গুপ্তকাশীতে গিয়ে তপস্যা করলে তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হবে। দৈবাদেশ অনুসারে তিনি দশ হাজার বছর ধরে গৌড়ের গুপ্তকাশীতে এসে তপস্যা করে শিবত্ব প্রাপ্ত হন। এই কারণে গুপ্তকাশী রূপে বিবেচিত শৈবতীর্থ এই স্থানটি অষ্টবক্রমুনির নামানুসারে বক্রেশ্বর নামে খ্যাত হয়। অন্য কাহিনি এই প্রকার—ভগবান নারায়ণ নরসিংহ মূর্তি ধারণ করে হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন। হিরণ্যকশিপু ব্রাহ্মণ সন্তান ছিলেন। তাই ব্রহ্মহত্যার অপরাধে নারায়ণের হস্ত এবং পদনখে দারুণ জ্বালা অনুভূত হয়। দেব সমাজে ও ঋষি মণ্ডলে এই কথা প্রচার হলে অষ্টবক্রমুনি নারায়ণের তীব্র জ্বালা স্বেচ্ছায় নিজের মাথায় ধারণ করেন। ফলে মুনি অসীম যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকেন। ভক্তের যন্ত্রণা নিবারণের জন্য নারায়ণ অষ্টবক্রমুনিকে গৌড়ের গুপ্তকাশীতে গিয়ে শিবের মস্তক স্পর্শ করে বসে থাকতে বলেন এবং নির্দেশ দেন যে ভারতের যাবতীয় তীর্থবারি সুড়ঙ্গ পথে এসে যখন অষ্টবক্রমুনির মাথায় পড়বে তখনই তাঁর যন্ত্রণার উপশম হবে। এই নির্দেশ অনুসারে সর্বতীর্থবারি এসে মুনির মাথায় পড়লে তিনি যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পান। কথিত আছে, এই বারিধারা অষ্টবক্রমুনির জ্বালা স্পর্শে উষ্ণভাব ধারণ করে নিকটস্থ পাপহরা নদীতে গিয়ে পড়ে। এই ভাবেই এই স্থানের বর্তমান উষ্ণ প্রস্রবণের উৎপত্তি হয়েছে বলে ধর্মভীরু জনগণ মনে করেন।

প্রচলিত ছড়া:

নলহাটিতে মা ললাটেশ্বরী
লাভপুরে মা ফুল্লরা।
সাঁইথিয়ার মা নন্দেশ্বরী
তারাপীঠে মা জয়তারা।
বোলপুরে কঙ্কালীতলা
বক্রেশ্বরে মা'র পায়ের তলা।
এই ছয় পীঠ নিয়ে বীরভূমের বড়গলা ॥

বক্সীগঞ্জ: কুচবিহার
পূর্বনাম শিবগঞ্জ। বক্সীরাম নামে জনৈক মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী বাসিন্দার নামানুসারে বক্সীগঞ্জ স্থাননাম হয়েছে। অসম সীমান্তে অবস্থিত এই স্থানটি একটি প্রাচীন ব্যাবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল বলে জানা যায়।

বগড়ী: প মেদিনীপুর
পূর্বনাম বকদ্বীপ বা বকডিহি। অপভ্রংশে বগড়ী হয়েছে। অনেকে মনে করেন বকডিহি বা বগড়ী থেকে বাগ্‌দি কথার উৎপত্তি হয়েছে এবং বাগ্‌দি সম্প্রদায়ের নামকরণের সঙ্গে এই অঞ্চলের যোগসূত্র আছে। কিংবদন্তি আছে, এই অঞ্চলটি মহাভারতের বকরাক্ষসের রাজ্য ছিল। জতুগৃহ দাহের পর পাণ্ডবরা বিদুরের পরামর্শ মতো নৌকায় গঙ্গাপার হয়ে দক্ষিণদিকে অরণ্যাবৃত এই স্থানে এসে এক ব্রাহ্মণের গৃহে আশ্রয় নেন। এখানে এসে পাণ্ডবরা জানতে পারেন যে বক রাক্ষস রোজ একটি করে মানুষ ভক্ষণ করে। এই অত্যাচারের কথা শুনে ভীম সেই রাক্ষসকে বধ করে জনগণকে বকাসুরের হাত থেকে ত্রাণ করেন। স্থানীয় প্রখ্যাত কৃষ্ণরায়জির মন্দিরের জন্য স্থানটি বগড়ী কৃষ্ণনগর নামেও পরিচিত।

বজরাসারি: নদিয়া
নদীতীরবর্তী এই স্থানে একসময় নদীঘাটে সারি সারি বজরা বাঁধা থাকত বলে স্থাননাম বজরাসারি হয়েছে।

বজিরহাট: হুগলি

প্রচলিত ছড়া:

লাগন, ভাঙ্গন, ঝগড়াঝাঁটি।
এ তিন নিয়ে বজিরহাটি ॥

বড়গোয়াল: হুগলি

পূর্বনাম বট-গোহালী অপভ্রংশে বড়গোয়াল হয়েছে। বট-গোহালী নামের উল্লেখ Paharpur copper-plate Grant of the Gupta Year 159, North Central Bengal, C. 479-এ পাওয়া যায়।

বড়গোয়াল ডাংরা: বাঁকুড়া

উঁচু ডাঙা জমিতে কোনও গৃহস্থের বড়সড় গোয়ালের অবস্থান সূচক স্থাননাম।

বড়জঙ্গল: নদিয়া

একসময় স্থানটি জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। বিরাট জঙ্গলাকীর্ণ এলাকা থেকে স্থাননাম জঙ্গল হয়ে থাকতে পারে। বাংলায় জঙ্গলবুড়ি নামে একটি কথা আছে। জঙ্গল কেটে আবাদ করার জন্য খাজনায় বিলি করার নামে জঙ্গলবুড়ি। জঙ্গলবুড়ি থেকে বড় জঙ্গল নামও হতে পারে।

বড়বাঁশি: মেদিনীপুর

পূর্বনাম লোহাগ্রাম। স্থানটি একদা বাঁশিপাল ও বুধিপাল নামে দু' ভাইয়ের মধ্যে ভাগ হয়ে গেলে বড় ভাইয়ের অংশ কড়বাঁশি এবং ছোট ভাইয়ের অংশ কড় বুধি নামে পরিচিত হয়। কড়বাঁশি কালক্রমে অপভ্রংশে বড়বাঁশি হয়েছে বলে অনুমিত।

বড়োয়া: বর্ধমান

অনেকে মনে করেন পুরনো বর্ধমানই বর্তমানে বড়োয়া নামে পরিচিত।

বদ্যিপুর: বর্ধমান

প্রচলিত ছড়া:

গাঁজা, গুলি, মদে চুর।
মীরহাট, বদ্যিপুর ॥

* * *

ওপরপুরের মাটি
মীরপুর বদ্যিপুরের বেটি ॥

বনগাঁ: উ চব্বিশ পরগনা

বনাঞ্চলের অবস্থান সূচক স্থাননাম।

প্রচলিত ছড়া:

রানাঘাটের পানতুয়া, বনগাঁর দই,
শান্তিপুরের কাঁচাগোল্লা, বাবু বলে কই ॥

বনপাশ: বর্ধমান

পূর্বনাম বনপার্শ্ব। অপভ্রংশে বনপাশ হয়েছে। বনের পাশে অবস্থিত স্থানসূচক নাম।

বন্যেশ্বর: মুর্শিদাবাদ

স্থানীয় বন্যেশ্বর শিবের নামানুসারে স্থানের নাম বন্যেশ্বর হয়েছে।

বরাহভূম: বাঁকুড়া (অধুনালুপ্ত)

ভবিষ্যপুরাণে বরাহভূম রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই রাজ্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি রোমাঞ্চকর কাহিনি আছে। লায়া উপাধিধারী এক ব্যক্তি দলমা পাহাড়ের একটি নির্জন স্থানে এক বৃহৎ অজগরের ওপর উপবিষ্ট হয়ে কালীর উপাসনা করতেন। একদিন তিনি দেখলেন যে অজগরটি স্বস্থানে নেই এবং সেই স্থানে দুটি শূকর মিথুন-ক্রীড়ারত অবস্থায় রয়েছে। ক্রোধে তিনি তরোয়াল হাতে নিয়ে বরাহমিথুনকে তাড়া করলেন। শূকরটি ছুটে পালাল কিন্তু শূকরী গর্ভিণী থাকায় পালাতে পারল না। লায়া তরোয়ালের এক আঘাতে শূকরীর দেহ দ্বিখণ্ডিত করে ফেললেন। তখন শূকরীর উদর থেকে দুইটি দিব্যকান্তি মানবশিশু বেরিয়ে এল। ব্যাপার দেখে লায়া বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলেন। কিন্তু তখনই দৈববাণী হল যে, এই শিশু দুটি দেবপুত্র, লায়া যেন তাদের ঘরে নিয়ে গিয়ে পুত্রবৎ পালন করেন। লায়ার নিজের সন্তান ছিল না। সেই জন্য শিশুদুটিকে তিনি পরম আদরে লালন পালন করতে লাগলেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুদুটি রূপ

লাবণ্য ও শৌর্য বীর্যে পূর্ণ হয়ে উঠতে লাগল। তাদের দেখে লোকে বলাবলি করতে লাগল, এরা কখনওই লায়ার পুত্র নয়। নিশ্চয়ই কোনও রাজপুত্র।

একদিন কিশোরদ্বয় তাদের পালক পিতার অজ্ঞাতসারে গৃহত্যাগ করে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজধানীতে গিয়ে নিজেদের দেবকুমার বলে মহারাজের কাছে আত্মপরিচয় দিয়ে তাদের কোনও রাজ্যশাসনের ভার দেবার জন্য প্রার্থনা জানাল। কিশোরদ্বয়কে পরীক্ষা করার জন্য বিক্রমাদিত্য একটি তোরণের নীচের দিকে তীক্ষ্ণধার অসিফলক ঝুলিয়ে তার নীচে দিয়ে তাদের পূর্ণবেগে অশ্বচালনা করে ছুটে যেতে বললেন। জ্যেষ্ঠকুমার অশ্বচালনা করে তোরণের নীচে আসতেই অসিফলকে তার মাথা দ্বিখণ্ডিত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। কিন্তু কনিষ্ঠ কুমার এই দৃশ্য দেখে বিন্দুমাত্র ভীত না হয়ে অশ্বচালনা করতে প্রস্তুত হলে বিক্রমাদিত্য ইঙ্গিতে তাকে নিবৃত্ত করে বললেন যে, তারা দু'ভাই যে দেবকুমার সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তিনি কনিষ্ঠ কুমারকে তুঙ্গভূমি ও সামন্তভূমের আধিপত্য প্রদান করলেন। কুমারদ্বয় দেব অংশরূপী বরাহ থেকে উৎপন্ন হয়েছিলেন বলে রাজ্যের নাম বরাহভূম রাখা হয়।

বর্ধনপাড়া: বীরভূম

বর্তমানে বর্ধনপাড়া যেখানে অবস্থিত প্রায় আড়াইশো বছরেরও আগে সেখানে বিনোদনগর ও শ্যামনগর নামে দুটি গ্রাম ছিল। কালক্রমে গ্রামদুটি জনশূন্য হয়ে যায়। বিনোদনগরের পাশের পাইকর গ্রামের লোকসংখ্যা বেড়ে গেলে ক্রমে এই স্থানে আবার জনবসতি গড়ে ওঠে। এই কারণে পাইকর গ্রামের পাশের এই অংশটি বর্ধনপাড়া নামে পরিচিত হয়।

বর্ধমান: বর্ধমান

জৈনদের শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীরের পূর্বাশ্রমের নাম বর্ধমান থেকেই এই স্থানের নাম বর্ধমান হয়েছে বলে জানা যায়। কথিত আছে, বর্তমান বর্ধমান নগরেই তিনি প্রথম ধর্মপ্রচার করেন। জৈনদের নিদর্শনস্বরূপ বর্ধমান ও তার চারপাশ থেকে অনেক তীর্থঙ্করদের প্রস্তরমূর্তি পাওয়া গেছে। গ্রিক ইতিহাসকারেরা স্থানটিকে বর্ধিষ্ণু হিন্দু রাজ্য গঙ্গারিডি (Gangardae) বা (Gangarides) গঙ্গারিডস-এর রাজধানী পার্থালিস অথবা পোর্টালিস (Porthalis বা Portalis) নামে চিহ্নিত করেছেন। বর্ধমানের নাম প্রথম সঠিক ভাবে জানা যায় মুসলমান যুগে। ১৫৭৪

সনে দাউদ খাঁকে পরাজিত করে মুঘল বাদশাহ আকবর এই স্থানটি দখল করেন। এখানকার পরের ইতিহাস বাদশাহ জাহাঙ্গীর ও তাঁর প্রেমিকা মেহের-উন-নিসার বা মেহেরুন্নিসার সঙ্গে জড়িত। যুবরাজ অবস্থায় জাহাঙ্গীর (সেলিম) মেহেরুন্নিসার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিয়ে করতে চান। কিন্তু সম্রাট আকবর তাতে সম্মত না হয়ে তুর্কি জায়গিরদার শের আফগানের সঙ্গে মেহেরুন্নিসার বিয়ে দিয়ে তাঁদের সুদূর বর্ধমানে পাঠিয়ে দেন। ভারতের মসনদে বসার পরও জাহাঙ্গীরের মন সব সময় বর্ধমানের দিকে পড়ে থাকত। কীভাবে মেহেরুন্নিসাকে পাওয়া যায়। কুতুবুদ্দিন খাঁর সঙ্গে মতলব করে তাঁকে বাংলাদেশের সুবেদার করে পাঠালেন। নানা চক্রান্ত অসফল হলে অবশেষে এক দিন শহরের এক প্রান্তে শের আফগানকে বিশ্বাসঘাতকতা করে হত্যা করা হয়। এই বিশ্বাসঘাতী সংঘর্ষে কুতুবেরও মৃত্যু হয়। আর বাধা কীসের! জাহাঙ্গীর মেহেরুন্নিসাকে তুলে নিয়ে গিয়ে ভারত-সম্রাজ্ঞী করে নাম দিলেন 'নুরজাহান' অর্থাৎ জগতের আলো।

বর্ধমানের ঐতিহাসিক গুরুত্ব আরও আছে। মুঘল সাম্রাজ্যের গদিতে বসার আগে যুবরাজ খুররম (শাজাহান) বিদ্রোহ করে বর্ধমান দখল করেছিলেন। চেতোয়া-বরদার রাজা শোভা সিংহ ও আফগান সর্দার রহিম খাঁ মুঘল বাদশাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে মুঘল সৈন্যদের সঙ্গে সংঘর্ষে উভয়েই এই বর্ধমানেই নিহত হন। সম্রাট অওরঙ্গজেব তাঁর পুত্র (কারও মতে পৌত্র) আজিম-উশ্-শানকে ১৬৯৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলার সুবেদার নিযুক্ত করেন এবং এই স্থানে তিন বছর থাকেন। তাঁর বর্ধমানে প্রবাস কালেই কলকাতা, চন্দননগর ও চুঁচুড়ায় ইউরোপীয় বণিকদের দুর্গ গড়ার অনুমতি দেওয়া হয় এবং শেষ পর্যন্ত ১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে আজিম-উশ-শান ইংরেজদের সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর নামে তিনটি গ্রামের জমিদারিস্বত্ব ১৬০০০ টাকা নজর দিয়ে স্থানীয় জমিদারের কাছ থেকে কিনে নেবার অনুমতি দেন। মহানগরী কলিকাতা এবং ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন এক হিসেবে বর্ধমান থেকেই হয় (কলিকাতা দেখুন)। আনুমানিক ১৬২৪ খ্রিস্টাব্দে আবুরায় কপুর নামে একজন ক্ষত্রিয় লাহোর থেকে বর্ধমানে এসে বসবাস স্থাপন করেন। ইনিই প্রখ্যাত বর্ধমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

প্রচলিত ছড়া:

একা যাব বর্ধমান করিয়া যতন।
যতন নাহিলে কোথা মিলয়ে রতন ৷৷

* * *

দিনাজপুর নগদ দান, রানী ভবানীর কীর্তি
কৃষ্ণচন্দ্রের বহ্মোত্তর বর্ধমানের বৃত্তি ॥

* * *

শান্তিপুরের খাসা দই।
বর্ধমানের বসা দই ॥
বঁধু আমি তোমা বই,
আর কারো নই ॥

* * *

বর্ধমানের চাষী ভালো।
চব্বিশ পরগনার গোপ ॥
গুপ্তিপাড়ার মেয়ে ভালো।
শীঘ্র বংশলোপ ॥

* * *

বর্ধমানের ঢাকী ভালো, চব্বিশ পরগনার গোপ,
পদ্মানদীর ইলিশ ভালো, কিন্তু বংশ লোপ।
হুগলীর ভালো কোটাল লেঠেল
বীরভূমের ভালো ঘোল,
ঢাকের বাদ্যি থামলেই ভালো,
হরি হরি বোল ॥

* * *

মশা, মাছি, মুসলমান।
এ তিন নিয়ে বর্ধমান ॥

* * *

লম্বা কোঁচা, কাছায় টান।
বাড়ি জানবি বর্ধমান ॥

* * *

কাছা উঁচু, কোঁচা টান।
তাঁর বাড়ি বর্ধমান ॥

* * *

যদি দেখি ঢিল
মারি দুই কিল ॥
যদি দেখি টান।
বাড়ি বর্ধমান ॥

* * *

দামোদরে এল বান।
ডুবল শহর বর্ধমান ॥

* * *

যত ধান তত বান।
দুয়ে মিলে বর্ধমান ॥

* * *

ওল, কচু, মান।
তিনে বর্ধমান ॥

* * *

পুঁই, আমড়া, ধান।
তিনে বর্ধমান ॥

আমড়া, কুমড়া, ধান।
তিনে বর্ধমান ॥

* * *

খেত্রী, আগুড়ি (উগ্রক্ষত্রিয়), মোছলমান
এ তিন নিয়ে বর্ধমান।

* * *

চাষ, ময়রা, মোছলমান।
এ তিন নিয়ে বর্ধমান ॥

* * *

বলগানা: বর্ধমান
প্রচলিত ছড়া:

যদি পেরুলি বলগনা।
তো নেয়ে ধুয়ে ঘর যানা ॥

* * *

যদি পেরুলি বলগনা।
তো লেপ চাপা দে’ ঘুম যা না ॥

বলরামপুর: হুগলি
বলরাম হাড়ি প্রবর্তিত লোকধর্ম বলরামী বা বলাহাড়ি সম্প্রদায়ের বসতি সূচক স্থাননাম।

বলরামপুর: কুচবিহার
প্রচলিত ছড়া:

বলরামপুরের বাঁশ।
কোচবিহারের রাস ॥

বলাগড়: হুগলি
এখানে পঞ্চমুণ্ডী আসন সংযুক্ত এক চণ্ডী মন্দির আছে। স্থানটি বলয়পীঠ নামে প্রসিদ্ধ। সেই থেকেই স্থাননাম বলাগড় হয়েছে বলে মনে করা হয়।

বল্লভপুর: নদিয়া
কবি কৃত্তিবাসের ভ্রাতা বল্লভের নামানুসারে স্থাননাম বল্লভপুর হয়েছে।

বল্লালদিঘি: নদিয়া
সেনরাজা বল্লালসেন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত দিঘি থেকে এই স্থাননাম।

বহড়ু: দ চব্বিশ পরগনা
স্থানটি বড়ুক্ষেত্র নামে সপ্তদশ শতকে রচিত কবি কৃষ্ণদাসের রায়মঙ্গল কাব্যে উল্লেখ পাওয়া যায়। বড়ুক্ষেত্র অপভ্রংশে বহড়ু হয়েছে বলে অনুমিত। স্থানটি পশ্চিম ভারতীয় স্থাপত্যরীতি অনুসারে নির্মিত শ্যামসুন্দরজিউর মন্দিরের জন্য খ্যাত।

প্রচলিত ছড়া:

সঘনে দামামা ধ্বনি

শুনি রায়গুণমণি,
বড়ুক্ষেত্র বাহিল আনন্দে।
বারাসাতে উপনীত
হইয়া সাধু হরষিত,
পূজিল ঠাকুর সদানন্দে ॥

বহরমপুর: মুর্শিদাবাদ
পূর্বনাম ব্রহ্মপুর। অর্থ, ব্রহ্মের আবাসস্থল। কারও মতে ব্রাহ্মণদের জনবসতি সূচক স্থান ব্রহ্মপুর, যা পরে অপভ্রংশে বহরমপুর হয়েছে। এখানে নদীর একটি ঘাট বিপ্রঘাট বা ব্রাহ্মণদের ঘাট নামে পরিচিত। অনেকে স্থাননামের সঙ্গে বহরমজঙ্গ নামে জনৈক মুসলমান রাজপুরুষের যোগসূত্র আছে বলে মনে করেন। কিন্তু তার কোনও প্রামাণিক তথ্য পাওয়া যায় না।

বাঁকিসোল: বাঁকুড়া
প্রচলিত ছড়া:

পোস্ত পোড়া, বিউলির ঝোল।
তবে জানবি বাঁকিসোল ॥

বাঁকুড়া: বাঁকুড়া
বিষ্ণুপুরের মল্লরাজা প্রমুখদের স্থানরূপে খ্যাত বাঁকুড়ার নামকরণ সম্বন্ধে এক মত বলে যে, খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতকে বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বিরের এক পুত্র বাঁকুড়ামল্লের নাম অনুসারে স্থাননাম বাঁকুড়া হয়। অন্য মতে, স্থানটি বঙ্কুরাই নামক কোনও এক নরপতি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে বাঁকুড়া নাম হয়েছে।

ইংরেজদের পুরনো নথিপত্রে স্থানটিকে বানকুড়া (Bancoorah) অথবা বানকুণ্ডা (Bankoonda) নামে উল্লেখ করা হয়েছে, যার অপভ্রংশে পরবর্তী কালে বাঁকুড়া হয়। 'বামকুণ্ডা' নামের উল্লেখ কিছু কিছু সংস্কৃত কাব্যেও পাওয়া যায় এবং কথিত আছে, পঞ্চদশ শতাব্দীর সাধক কবি শ্রীহর্ষ এই বামকুণ্ডাতেই বাস করতেন। যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধির মতে স্থানীয় প্রসিদ্ধ এক্তেশ্বর শিবের 'বঙ্কিম' বা 'বাঁকা' ভঙ্গি থেকে স্থাননাম বাঁকুড়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, সম্ভবত 'বাম+কুণ্ডা' থেকে বামকুণ্ডা যা পরে অপভ্রংশে বাঁকুড়ায় পরিবর্তিত

হয়ে থাকবে। অন্য দিকে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে বাঁকুড়া নামটা সংস্কৃত 'বক্র' শব্দ থেকে 'বঁকুণ্ডা' বা বাঁকুড়া হয়েছে। মঙ্গলকাব্যে বাংলার বহুল পূজিত 'ধর্মঠাকুর'কে 'বাঁকুড়া রায়' অভিহিত করা হয়েছে। অনেকে মনে করেন এই 'বাঁকুড়া রায়' থেকে স্থাননাম বাঁকুড়া হওয়ার সম্ভাবনাকেও অগ্রাহ্য করা যায় না।

প্রচলিত ছড়া:—

বাঁকুড়ার রামগতি।
সিউড়ির কালী গতি।
নলহাটির জগজ্যোতি ॥

* * *

মৈমনসিং-এর মুগ ভাল,
খুলনার খই।
ঢাকার ভাল পাতক্ষীর
বাঁকুড়ার দই ॥

* * *

আঁকুড়া বাঁকুড়াবাসী।
মুড়ি খায় রাশি রাশি ॥

* * *

মুড়ি খায় হাঁড়ি হাঁড়ি।
তবে জানবি বাঁকড়োয় বাড়ি ॥

* * *

হাতে লঙ্কা, মুড়ির রাশি।
তবে জানবি বাঁকোড়া বাসী ॥

* * *

মুড়ি, পোস্ত, কুকড়ার (মোরগের) লড়াই
এই তিন নিয়ে বাঁকড়োর বড়াই ॥

* * *

কানা কুটে (কুষ্ঠরোগগ্রস্ত), খোঁড়া।
তিন নিয়ে বাঁকুড়া ॥

* * *

মদ, মাংস, কুঁকড়া (মোরগ)।
তিন নিয়ে বাঁকুড়া ॥

বাঁদড়া: বর্ধমান

শোনা যায় কাটোয়ার সন্নিহিত অজয় নদের তীরে আগে এই স্থানে একটি বন্দর ছিল। সেই থেকেই স্থানের নাম 'বন্দর' থেকে বাঁদড়া হয়ে থাকবে।

বাঁশচাতর: মুর্শিদাবাদ

প্রচলিত ছড়া:

বিশুর পুকুর ডুবুডুবু,
মাধবপুর ভাসে।
বাঁশচাতর গেল গেল,
বেলডাঙ্গা হাসে ॥

বাঁশোড়া: বীরভূম

সুকুমার সেনের মতে বাঁশ ঘেরা (বংশ+বাটক) হাওয়া।

প্রচলিত ছড়া:

পারকাঁদির মুলো।
গগনপুরের ধুলো ॥
বাঁশোড়্যার বেটি।
পাইকড়ের মাটি ॥

বাউড়িয়া: হাওড়া

সুকুমার সেনের মতে বাঁওড়ের ধারে গাঁ থেকেই স্থাননাম উদ্ভূত।

প্রচলিত ছড়া:

কল, কয়লা, উড়ে।
তিন নিয়ে বাউড়ে (বাউড়িয়া) ॥

বাউরপুনি: মুর্শিদাবাদ

বাউরপুনি স্থাননামের ব্যুৎপত্তি অস্পষ্ট কিন্তু স্থাননামের অন্ত্যপদে পুনি শব্দের

ব্যবহারের উল্লেখ Puspabhadra inscription of Dharmapala of Pragjyotisa, 12th century-তে পাওয়া যায়।

বাওয়ালি: দ চব্বিশ পরগনা

বাওয়ালি একটি সম্প্রদায়ের নাম। কথিত আছে, একসময় জঙ্গলে পরিপূর্ণ এই স্থানটিতে কয়েক ঘর বাওয়ালি সম্প্রদায়ের লোক এই জঙ্গলের গভীরে বাস করত। মুঘল সরকারের এক রাজকর্মচারী হরানন্দ মণ্ডল এই বনাঞ্চলের জমিদারি হাসিল করে এখানে গ্রাম পত্তন করেন। সেই সময় বাওয়ালিরা তাঁকে বিশেষ সাহায্য করে। সেই কারণেই সম্ভবত প্রতিষ্ঠিত গ্রামের নাম বাওয়ালি রাখা হয়। কেউ কেউ বলেন এই অঞ্চলে জঙ্গলের মধ্যে বাওয়ালি ফকিরের একটি আস্তানা ছিল। সেই জন্য স্থানের নাম বাওয়ালি রাখা হয়।

প্রচলিত ছড়া:

যদি এলি বাওয়ালি।
সব বুদ্ধি খোয়ালি ॥

বাগআঁচড়া: নদিয়া

স্থানটির পূর্বনাম তদানীন্তন দেওয়ান বা কারও মতে বারো ভুঁইয়ার অন্যতম চাঁদ রায়-এর নামানুসারে চাঁদড়া বা চাঁদুড়া ছিল। কথিত আছে, চাঁদরায় কোনও শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাওয়ার সময় প্রতিজ্ঞা করেন যুদ্ধে জয়ী হলে এই স্থানে বাগদেবীর প্রতিষ্ঠা করবেন। বিজয়ী চাঁদ রায় প্রতিজ্ঞা অনুসারে এখানে বাগদেবীর প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেই থেকে স্থানটি প্রথমে বাগ-চাঁদরায় নামে পরিচিত হয়। ক্রমে লোকমুখে স্থানটি বাগ-চাঁদরায় থেকে বাগ-চাঁদরা হয়, যা পরে বাগ-আঁচড়ায় বিবর্তিত হয়। (কারও মতে রঘুনন্দন নামে জনৈক সাধক ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই বাগদেবীর প্রতিষ্ঠা করেন) অপর এক মতে বাগ-আঁচড়া এক প্রকার বিষাক্ত কাঁটাগাছের নাম, যা এখানে একসময় প্রচুর পাওয়া যেত, যা থেকে স্থাননাম বাগ-আঁচড়া হয়েছে। তাঁতি প্রধান এই স্থান রামকৃষ্ণ মিশনের নবম প্রেসিডেন্ট স্বামী মাধবানন্দের বাসস্থান রূপে খ্যাত।

বাগডোগরা: দার্জিলিং

শোনা যায় একদা এখানে জঙ্গলে প্রচুর বাঘ দেখা যেত। স্থাননামের অর্থ বাঘের গর্জন।

বাগনান: হাওড়া

বাগনান স্থাননামের ব্যুৎপত্তি অস্পষ্ট। সম্ভবত বাগ পদবিধারী কোনও ব্যক্তির সঙ্গে নান ব্যবস্থাসূচক স্থাননাম। (নান জমিদারি ব্যবস্থার বিবরণের জন্য আলিনান দেখুন) বাগ অর্থে বাগিচা থেকেও স্থাননাম হতে পারে।

প্রচলিত ছড়া:

দুলে, কাপালী, মুচুরমান
এ তিন নিয়ে বাগনান।

বাগের গ্রাম: নদিয়া

পাঠান আমলে তদানীন্তন পাঠান সরকার মালেক মীর আহমদ বেগ নামে একজন পাঠানকে একদা এই শ্বাপদসংকুল জলাশয় এবং জঙ্গলাকীর্ণ জায়গায় নির্বাসন দেন। বেগ সাহেব সেই পাণ্ডববর্জিত জায়গায় বসতি স্থাপন করেন এবং জল নিষ্কাশনের জন্য একটি খাল কাটেন। খালটি বেগের খাল নামে পরিচিত হয়, যা পরে অপভ্রংশে বাগের খাল হয় এবং ক্রমে বাগের গ্রাম-এ পরিবর্তিত হয় বলে মনে করা হয়।

বাঘনাপাড়া: বর্ধমান

কিংবদন্তি অনুসারে শাপগ্রস্ত ব্যাঘ্রপাদ মুনি ব্যাঘ্রকলেবর ধারণ করে এখানে কঠোর তপস্যা করেন, পরে তিনি শাপমুক্ত হন। ব্যাঘ্রপাদ মুনির স্মৃতিবিজড়িত স্থান বলে স্থানের নাম বাঘনাপাড়া হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।

অপর পক্ষে 'বংশী শিক্ষা' গ্রন্থে বলা হয়েছে যে এই স্থানে জঙ্গলের মধ্যে একটি বাঘ বাস করত। পরম বৈষ্ণব রামচন্দ্র গোস্বামী এই বাঘকেও হরিনাম দিয়ে উদ্ধার করেন এবং বাঘের নামে স্থানের নাম রাখেন বাঘনাপাড়া।

প্রচলিত ছড়া:

এখনও নেড়ী-নেড়ায় আসে এই বাঘনাপাড়ায়।
আনন্দে নাচে গায় গাছের গোড়ায় ॥

কেন্থা করোয়া (কাঁথা-কমণ্ডুল) সব তাদের গলায় ॥

* * *

উলোর মেয়ের কলকলানি
শান্তিপুরের চোপা।
গুপ্তিপাড়ার হাতনাড়া বামন
বাঘনাপাড়ার খোঁপা ॥

বাঘুণ্ডা: নদিয়া

বাঘমুণ্ড থেকে বাঘুণ্ডা নাম হওয়া সম্ভব। কিন্তু এই স্থানে বাঘ এবং মুণ্ডের যোগসূত্রের কোনও হদিশ পাওয়া যায় না।

বাছরী: হাওড়া

প্রচলিত ছড়া:

বাছরীর মাটি।
হাঁটবে গুটি গুটি ॥
যাবে যদি ছুটে।
খোলাম (খোলা মুকুচি) যাবে ফুটে ॥

বাজারসৌ: মুর্শিদাবাদ

পূর্বনাম বজ্রাসন থেকে বজ্রসির এবং পরে অপভ্রংশে বাজারসৌ নাম হয়েছে বলে মনে করা হয়।

বাজুকা: নদিয়া

বাজু অর্থে নারীদের বাহুর অলংকার বিশেষ, অথবা খাটের পাশের কাঠ বোঝায়। বাজু থেকে স্থাননাম বাজুকা হয়ে থাকবে। কিন্তু স্থাননামে 'বাজু'র যোগসূত্র জানা যায় না।

বাড়া: বীরভূম

পূর্বনাম বালনগর, পরে সংক্ষেপে 'বাড়া'য় বিবর্তিত হয়েছে বলে অনুমান করা হয়।

বাণগড়: উ দিনাজপুর

পৌরাণিক 'বাণ' রাজার সঙ্গে জড়িত স্থাননাম। কথিত আছে এই স্থানে দৈত্যরাজ বাণরাজার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের খণ্ডযুদ্ধ হয়েছিল। 'বাণগড় মাউন্ড' (Bangar Mound) নামে উল্লিখিত এক ধ্বংসস্তূপই বাণরাজার প্রাসাদের স্থান বলে মনে করা হয়। কিংবদন্তি অনুসারে এক সাধু এই স্থানে একটু জায়গার জন্য প্রার্থনা জানালে বাণরাজা তা অস্বীকার করায় সেই সাধুর শাপে রাতারাতি বাণরাজার প্রাসাদ ধ্বংস্তূপে পরিণত হয়। পুরাতত্ত্ববিদেরা এখানে খনন করে এক প্রাচীন অট্টালিকা এবং বহু প্রাচীন দ্রব্যসামগ্রীর নিদর্শন পেয়েছেন বলে জানা যায়।

বাণপুর: মালদহ

কথিত আছে, প্রাচীন কালে স্থানীয় সব বাসিন্দারা 'বাণগুণ' মন্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। মন্ত্রের গুণে তাঁরা যে কোনও লোককে বশীভূত করে নিজের ইচ্ছানুসারে চালনা করতে পারতেন। এঁরা ভগবতীর পূজারি ছিলেন এবং প্রতি বছর বাহান্নটি ভগবতীর মূর্তি গড়ে 'বাণ' মন্ত্রের সাধন করতেন। স্থানীয় লোকেদের বিশ্বাস এই কারণেই স্থাননাম বাণপুর হয়েছে।

বাণেশ্বর: কুচবিহার

স্থানীয় বাণেশ্বর শিবের নাম থেকে স্থাননাম বাণেশ্বর হয়েছে।

বাণেশ্বর শিব এবং স্থানের নাম সম্বন্ধে এই অঞ্চলে একটি পৌরাণিক কাহিনি প্রচলিত আছে। দ্বাপর যুগের শেষ ভাগে উজানীনগর নামে খ্যাত উত্তরবঙ্গে মহাবীর বলী নামে এক দৈত্য রাজত্ব করত। মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মহাপরাক্রমশালী দৈত্য বাণাসুর রাজত্ব লাভ করে এবং বাহুবলে স্বর্গের দেবরাজ ইন্দ্রের রাজত্ব দখল করে নেন। কিন্তু ইষ্টদেব মহেশ্বরের আদেশানুসারে দেবরাজ ইন্দ্রকে তাঁর হৃতরাজ্য ফিরিয়ে দেন। স্বরাজ্যে ফিরে বাণাসুর সংকল্প করেন নিজের রাজত্বে দ্বিতীয় কাশীনগর স্থাপন করবেন। সেই জন্য রাজপাট ত্যাগ করে বাণাসুর গহন অরণ্যে প্রবেশ করে কঠিন তপস্যায় শিবকে তুষ্ট করে প্রার্থনা করলেন যে শিবকে তিনি কৈলাস থেকে মর্তে জল্পেশ্বরে তাঁর রাজত্বে নিয়ে গিয়ে মহাপুণ্যতীর্থ দ্বিতীয় কাশী স্থাপন করবেন। মহেশ্বর বাণাসুরের প্রার্থনা মঞ্জুর করে

একটি শর্ত রাখলেন যে শিবকে মাথায় করে নিয়ে গিয়ে সূর্যোদয়ের পূর্বেই জল্পেশ্বরে পৌঁছাতে হবে। নতুবা তার মনস্কামনা পূর্ণ হবে না। এই শর্তে রাজি হয়ে বাণাসুর শিবকে মাথায় নিয়ে কৈলাস থেকে মর্তে যাত্রা করলেন এবং এক লাফে দ্বাদশ যোজন পার করে রাতের শেষ প্রহরে জল্পেশ্বরের খুব কাছে এসে পৌঁছলেন। কিন্তু এমন সময় ব্রাহ্মণরূপধারী নারদের ছলনায় বাণাসুরের অসহ্য প্রস্রাব পায়। দৈত্যপতি বিভ্রান্ত হয়ে প্রমাদ গণলেন। ব্রাহ্মণরূপী নারদকে সামনে দেখতে পেয়ে তাঁর কাছে শিবকে কিছুক্ষণের জন্য গচ্ছিত রেখে অদূরে মূত্রত্যাগ করার জন্য প্রস্থান করলেন। কিন্তু বাণাসুরের মূত্রত্যাগ আর শেষ হয় না। এদিকে রাত ভোর হয়ে এল। ছলনাময় ব্রাহ্মণ শিবকে মাটিতে রেখে চলে গেলেন। মনস্কামনা অপূর্ণ থেকে যায় দেখে দৈত্যপতি তাঁর ইষ্টদেবের কাছে আকুল প্রার্থনা জানালেন একটা উপায় বার করার জন্য। সেই প্রার্থনায় বিগলিত হয়ে ভোলানাথ বর দিলেন—

আজি হতে তব রাজ্য মম মহিমাতে।
শিবরাজ্য নামে খ্যাত হইবে জগতে।
বসেছি যেথায় এই মাটির উপর
হবে মম লিঙ্গ-পীঠ অর্দ্ধনারীশ্বর ॥
শোন বাণাসুর, ভক্ত হতে তব নাম,
এ মাটি ধরিবে নাম বাণেশ্বর ধাম ॥

বাথানগাছি: নদিয়া

প্রচলিত ছড়া:

হাতিশালা   বাথানগাছি।
দিগ্‌নগরের   কাছাকাছি ॥

বাদামতাম: দার্জিলিং

মূল লেপচা থেকে উদ্ভূত নাম। অর্থ এক প্রকার বিশালাকায় বাঁশের ঝাড়। শোনা যায় লেপচারা এই বাঁশ দিয়ে দুধের বা জলের পাত্র বা ওইরকম গৃহস্থালির পাত্র তৈরি করত।

বাবলা: বর্ধমান
পূর্বনাম বৈয়াবল্লাকা। অপভ্রংশে বাবলা হয়েছে। বৈয়াবল্লাকা স্থাননামের উল্লেখ Malla-Sarul copper-plate inscription of Gope Chandra and Vijaysena-তে পাওয়া যায়। বাবলা একপ্রকার কাঁটাযুক্ত গাছের নাম।

বামুনদিয়া: পুরুলিয়া
প্রচলিত ছড়া:

শালিক, চড়াই, টিয়া।
বাস বামুনদিয়া ৷৷

বারদুয়ারি: মালদহ
কথিত আছে, এই স্থানে একদা বারোটি প্রবেশ দ্বার বা দরজা যুক্ত বিরাট অট্টালিকা ছিল। সেই থেকে স্থাননাম বারদুয়ারি হয়ে থাকবে।

বারবেগে: নদিয়া
সিরাজের হত্যাকারী মহম্মদ-ই-বেগ প্রতিষ্ঠিত বারোটি জনপদের বারোতম স্থান হিসাবে স্থাননাম বারো বেগে হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। অন্য মতে জমির বা জোতের ভাগ থেকে ভেগে এবং পরে অপভ্রংশে বেগে হয়েছে।

বারাসত: উ চব্বিশ পরগনা
কথিত আছে, শ্রীমন্ত সওদাগর আদিগঙ্গা দিয়ে সিংহলে যাওয়ার সময় কঠিন যাত্রাপথের দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এই স্থানে আদ্যমহেশ শিবের পুজো করেন। তিনি একশোবার এই শিবকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেছিলেন বলে স্থানের নাম বারাশত থেকে বারাসত হয়েছে।

অন্য মতে শ্রীমন্ত সওদাগর যাত্রাকালে সুন্দরবনের দেবতা 'বারা' ঠাকুরের শত মূর্তির পুজো করেছিলেন বলে স্থানের নাম বারাশত থেকে বারাসত হয়। আরও এক মতে বারো ঘরের বাড়ি বা বারোটি অশ্বত্থ থেকে স্থাননাম হয়েছে।

ইংরেজ আমলে বারাসত একটি বর্ধিষ্ণু স্থান ছিল এবং এখানে একটি সেনা শিক্ষা কেন্দ্র ছিল যেখানে ইংল্যান্ড থেকে আগত আনকোরা ইংরেজ সৈন্যরা

শিক্ষা পেত। সেই কারণে স্থানটি একসময় বাংলার স্যান্ডহার্স (Sandhurst of Bengal) নামে পরিচিত ছিল।

বারুইপুর: দ চব্বিশ পরগনা
পান ব্যবসায়ী বারুই সম্প্রদায়ের বসতি সূচক স্থাননাম। কথিত আছে, শ্রীচৈতন্য নীলাচল যাত্রাকালে আদি গঙ্গার তীরবর্তী এই গ্রামের সন্নিহিত আটিসরা গ্রামে ভক্ত শ্রীঅনন্তের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন।

বার্নিয়া: নদিয়া
বন্যা থেকে বান্যে বা বার্নে এবং পরে অপভ্রংশ বার্নিয়া হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।

বালাণ্ডা: উ চব্বিশ পরগনা
পূর্বনাম 'বালবল্লভী'। অপভ্রংশে বালাণ্ডা হয়েছে বলে অনুমিত। কথিত আছে, একসময় এই স্থানে 'বালবল্লভী' নামে একটি রাজ্য ছিল।

বালাপুকুরী: কুচবিহার
প্রবাদ আছে, প্রাচীনকালে এক ধর্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ চণ্ডীদেবীর আশীর্বাদে মাত্র এক যুগের জন্য রাজা হওয়ার ক্ষমতা লাভ করেন এবং সেই সময় তিনি রাজা কান্তেশ্বর নামে পরিচিত হন। তিনি জনহিতার্থে এই স্থানে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করেন। সেই পুকুরের পাড়ে এবং জলে বালির প্রাচুর্যের জন্য স্থানীয় লোকেরা পুকুরটিকে বালাপুকুরী বলে অভিহিত করত। সেই থেকে স্থানের নাম বালাপুকুরী হয়েছে বলে মনে করা হয়।

বালাসন: দার্জিলিং
স্থানীয় সোনালি বালুময় নদী থেকে স্থাননাম বালাসন হয়েছে। নেপালি ভাষায় স্থানটি বলুসন নামেও পরিচিত।

বালি: হাওড়া
গঙ্গার দক্ষিণ পাড়ে অবস্থিত এই স্থানটি বালিঘাট নামেও পরিচিত।

প্রচলিত ছড়াঃ—

বালি, দ্বিগঙ্গা আর মুড়াগাছা
আর যত সব কাদা খোঁচা ৷৷

* * *

ওতোর পাড়া,
ধনের ঘড়া।
বালি
হাড় কালি ৷৷

* * *

কাগজ, কলম, কালি
এ তিন নিয়ে বালি।

* * *

ঘোষ, বোস, মিত্র এরা কুলের অধিকারী
অভিমানে বালির দত্ত যান গড়াগড়ি।

বালিগুনি: বীরভূম

কিংবদন্তি আছে, পাঠান রাজত্বকালে এই স্থানে একটি বালুকাময় চর ছিল। সেই চরে অজ্ঞাতনামা এক সাধুব্যক্তি আশ্রম করে বাস করতেন। তাঁর মধুর ব্যবহারের জন্য সব সম্প্রদায়ের লোকই তাঁকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করত। সাধু নানা অলৌকিক গুণের অধিকারী ছিলেন এবং তাঁর কৃপায় বহু দুরারোগ্য রোগের নিরাময় হত, এমনকী বন্ধ্যানারীও সন্তানবতী হতেন। সেজন্য জনসাধারণ তাঁকে গুণী বলে শ্রদ্ধা জানাত। বালিচরের ওপর এই গুণীর আশ্রম ছিল বলে স্থানের নাম বালিগুনি হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।

বালিঘাট: মুর্শিদাবাদ

ঋষি বাল্মীকির নাম থেকে স্থাননাম বালিঘাট হয়েছে বলে মনে করা হয়। স্থানীয় লোকে নদীর ঘাটের কাছে একটি বটগাছ দেখিয়ে বলেন যে, ঋষি বাল্মীকি এই ঘাটে স্নান করতেন।

বালুটে: বর্ধমান

পূর্বনাম বল্লিহিট্টা। অপভ্রংশে বালুটিযা এবং পরে বালুটে হয়েছে। বল্লিহিট্টা নামের উল্লেখ Naihati copper plate of Vallalasena Uttar Radha of Central Bengal, early 12th century এবং Saktipur copper plate of Lakshman-Sena West Bengal, 12th-18th century-তে পাওয়া যায়।

বাসুদেবপুর: পূ মেদিনীপুর

এই স্থানের অন্যতম প্রাচীন পরিবার ভট্টাচার্যদের গৃহদেবতা বাসুদেব বিগ্রহের নামানুসারে স্থাননাম বাসুদেবপুর হয়েছে। এই নামে মেদিনীপুর জেলায় চোদ্দোটি গ্রাম আছে। পশ্চিমবঙ্গের অন্য জেলাতেও এই নামের একাধিক গ্রাম আছে।

বাসুলডাঙা: দ চব্বিশ পরগনা

প্রচলিত ছড়া:

হাজিপুরের তাল-পাটালি,
বাসুলডাঙ্গার খই।
ধামুয়ার রাঙ্গা মুলো,
উলুবেড়ের দই ॥

বাহাদুরপুর: পুরুলিয়া

প্রচলিত ছড়া:

আখড়াই-এর মাটি,
বাহাদুরপুরের লাঠি,
আড়কালির ঘাঁটি ॥

বাহিরগড়: হুগলি

হুগলি জেলার জাঙ্গিপাড়ায় একসময় এখানে রাজপুত ক্ষত্রিয় বংশ সিংহরায়দের গড়বেষ্টিত বাড়ি ছিল— যা গড়বাড়ি নামে অভিহিত হত। গড়বাড়ির বাইরের অবশিষ্ট অংশকে বাহিরগড় বলা হত। সেই থেকে স্থাননাম বাহিরগড় হয়েছে।

বাহিরী: বীরভূম

জনশ্রুতি আছে, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু একবার বক্রেশ্বর যাওয়ার পথে এই স্থানে 'বিহার' করেন। সেই কারণে স্থানের নাম হয় 'বিহারী', যা পরে অপভ্রংশে বা   হয়েছে বলে অনুমিত।

বাহিরী: পূ মেদিনীপুর

শোনা যায় অতীতকালে এখানে একটি বৌদ্ধ বিহার ছিল। বৌদ্ধ 'বিহার' থেকে স্থানের নাম বাহিরী হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। প্রবাদ আছে, এখানে মহাভারতের মৎস্যদেশাধিপতি বিরাট রাজার গোগৃহ ছিল।

বাহুলাড়া: বাঁকুড়া

সাধারণ লোকের কাছে স্থানটি 'বোলড়া' নামে পরিচিত। সম্ভবত 'রাঢ়' শব্দের বিবর্তিত রূপ লাড়-লডম্-লড়া থেকেই বাহুলাড়া বা বোলাড়া হয়েছে।

বিজনবাড়ি: দার্জিলিং

মূল নেপালি শব্দ থেকে উদ্ভূত নাম। নেপালিরা 'বিজন' অর্থে চারাগাছ এবং 'বারি' অর্থে জমি বলেন। এই গ্রামের ঢালু পাহাড়ের গায়ে যখন প্রথম চায়ের চারাগাছ রোপণ করা হয়েছিল তখন থেকেই গ্রামের নাম 'বিজনবাড়ি' হয়েছে বলে অনুমিত।

বিরহী: নদিয়া

কিংবদন্তি আছে, প্রায় পাঁচ শতাধিক বছর আগে এক অজ্ঞাতনামা বৈষ্ণব এই স্থানের একটি বাঁধানো বটগাছের গোড়ায় বসে মদনগোপালের উপাসনা করতেন। সেই সাধক দেহত্যাগ করলে তাঁর ভক্তরা গ্রামে একটি দারুময় মদনগোপালের বিগ্রহ স্থাপন করে। নদিয়ার রাজার তত্ত্বাবধানে মন্দিরে নিয়মিত পুজোর ব্যবস্থা করা হয়। শোনা যায় ওই সময় একদিন মদনগোপালের চোখে জল দেখা যায় এবং রাতে স্বপ্নাদেশ হয় যে রাধিকা যমুনার পাড়ে এসেছেন তাই তাঁর বিরহে মদনগোপাল কাতর। পরদিন যমুনা তীরে রাধিকার এক অপরূপ দারুমূর্তি পাওয়া যায়। গ্রামবাসীরা মদনগোপালের পাশে রাধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। এই ঘটনা থেকেই স্থানের নাম

'বিরহী' হয়েছে বলে অনুমিত। অন্য মতে, সহোদরার অভাবে মদনগোপালের 'বিরহ' থেকে গ্রামনাম উৎপত্তি হয়েছে। শোনা যায় সেই কারণে এখানে প্রতি বছর ভাইফোঁটার দিন গ্রামের মহিলারা মদনগোপালকে ফোঁটা দেন এবং সেই উপলক্ষে মেলাও বসে।

বিলকান্দি: বীরভূম

কথিত আছে, অনেক আগে এই স্থানে একটি বিরাট বিল ছিল। কালক্রমে ওই বিলটি নিকটবর্তী ব্রাহ্মণী নদীর বন্যায় প্লাবিত হয়ে পলিমাটিতে ভরতি হয়ে ওঠে। তখন আশেপাশের গ্রামের লোকেরা ওই জমিতে চাষ-আবাদ আরম্ভ করে এবং পরে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে। ওই মজে যাওয়া বিলের ওপর জনপদ গড়ে ওঠায় স্থানের নাম বিলকান্দি হয়েছে বলে অনেকে অনুমান করেন।

বিষ্ণুপুর: বাঁকুড়া

বিষ্ণুপুর নামকরণের গল্প সঠিক জানা যায় না, কিন্তু স্থানটি মল্লরাজাদের রাজধানী ও তাঁদের পুরাকীর্তি এবং পোড়ামাটির স্থাপত্যের জন্য খ্যাত। প্রবাদ আছে, সপ্তম শতাব্দীতে কোনও এক ক্ষত্রিয় রাজার মহিষী তীর্থ করার মানসে বৃন্দাবন থেকে শ্রীক্ষেত্র যাওয়ার সময় জঙ্গলের পথে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করে মারা যান। একজন বাগ্‌দি কাঠুরিয়া জঙ্গলে কাঠের খোঁজে এসে জঙ্গলের মধ্যে একটি অসহায় নবজাত শিশুকে দেখে তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এসে লালন পালন করতে থাকে। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে বালকটির মধ্যে ক্ষত্রিয়চিত লক্ষণ ও সৌন্দর্যের বিকাশ হতে থাকে এবং সাত বছর বয়স হলে এক ব্রাহ্মণ, বালকের অপরূপ দৈহিক গঠন ও রাজকীয় লক্ষণ দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন এবং তার লালনপালনের ভার নেন। বালকটি ক্রমে শৌর্যবীর্যে পারদর্শী এবং মল্লযুদ্ধে অপরাজেয় হয়ে ওঠে।

ইতিমধ্যে স্থানীয় আদিবাসী রাজার মৃত্যু হয়। রাজার শ্রাদ্ধাদি কাজের সময় নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ বালকটিকে সঙ্গে নিয়ে শ্রাদ্ধের সভায় উপস্থিত হলে হঠাৎ প্রয়াত রাজার হাতি সেই বালককে শুঁড়ে করে তুলে এনে রাজার শূন্য সিংহাসনে বসিয়ে দেয়। উপস্থিত গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এই ঘটনায় বিস্মিত হন

কিন্তু বালকের রাজোচিত লক্ষণ দেখে তাকেই নতুন রাজারূপে অভিষিক্ত করেন। এইভাবেই মল্লযুদ্ধ খ্যাত আদিমল্ল, রঘুনাথ মল্ল দ্বারা প্রখ্যাত মল্লভূমরাজ্য ও মল্লরাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। রঘুনাথের শৈশব অবস্থায় বাগদি কাঠুরিয়া দ্বারা প্রতিপালন এবং ঘটনাক্রমে আদিবাসী রাজার সিংহাসনাসীন হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এবং আদিবাসী 'মল্ল' পদবি ধারণ করার জন্য মল্লরাজবংশের রাজারা 'বাগ্দি রাজা' নামেও পরিচিত। পরবর্তীকালে 'মল্ল' রাজারা রাজপুত ক্ষত্রিয় 'সিং' পদবি ধারণ করেন।

আদিমল্ল রঘুনাথ স্বীয় পরাক্রমবলে বহু সামন্ত রাজা ও সর্দারকে পরাজিত করে এক বিস্তীর্ণ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বর্ধমান ও সাঁওতাল পরগনার কিছু অংশ এবং ছোটনাগপুরের অধিত্যকা-ভূমির খানিকটা পর্যন্ত মল্লভূম রাজ্য বিস্তৃত ছিল বলে জানা যায়। মল্লভূমের প্রথম রাজধানী ছিল প্রদ্যুম্ননগর। চতুর্দশ শতাব্দীতে রঘুনাথ মল্লের ঊনবিংশ বংশধর জগৎমল্ল বিষ্ণুপুরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। সেই সময় থেকেই বিষ্ণুপুরের প্রকৃত ইতিহাস শুরু হয় এবং ক্রমে বাংলার সংস্কৃতি ও সভ্যতায় এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে।

বিষ্ণুপুরে মল্লরাজাদের বহু প্রাচীন দুর্গ এবং মন্দিরগুলি প্রাচীন বাংলার পোড়ামাটি স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন। ভারতীয় সংগীতের প্রাচীন প্রখ্যাত 'বিষ্ণুপুর ঘরানা' সর্বত্র সম্মানিত। বিখ্যাত সংগীতসাধক যদুভট্ট ও রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী বিষ্ণুপুরের অধিবাসী ছিলেন। আদি বিষ্ণুপুরের মল্লরাজারা ছিলেন শক্তির পূজারি শাক্ত। মল্লরাজা বীর হাম্বিরের বৈষ্ণব ধর্মগ্রহণ এবং মল্লভূমে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচলন সম্বন্ধে একটি কাহিনি প্রচলিত আছে। কথিত আছে, শ্রীনিবাস আচার্য, শ্যামানন্দ ও নরোত্তম ঠাকুর প্রভৃতি বৈষ্ণব মহন্তগণ বৃন্দাবন থেকে গোস্বামীদের গ্রন্থগুলি একটি পেটিতে নিয়ে গোরুর গাড়ি করে মল্লভূমরাজ্যের মধ্য দিয়ে গৌড়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। পেটির মধ্যে ধনরত্ন আছে মনে করে বীর হাম্বির তাঁর লোকজন দিয়ে সেই পেটি লুঠ করে নিয়ে আসেন। পুঁথিগুলির উদ্ধারের আশায় শ্রীনিবাস আচার্য হাম্বিরের রাজসভায় গিয়ে উপস্থিত হন। আচার্যের সৌম্যমূর্তি দেখে এবং তাঁর ভগবদ্ভক্তি ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেয়ে রাজা তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এইভাবে মল্লভূমের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের আরম্ভ হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্গির বারবার আক্রমণে এবং গৃহবিবাদের ফলে

মল্লরাজাদের পতন হয়। অবশেষে ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে মল্লভূম বর্ধমানের মহারাজের কাছে বিক্রি হয়ে যায়।

প্রচলিত ছড়া:

পাঁচমুড়ার হাতিঘোড়া।
পুরুলিয়ার 'লা'।
বিষ্ণুপুরের শাঁখা পরে
সেজেছেন মনসা মা
('লা'—লাক্ষাজাতীয় আলতা।)

* * *

গাইয়ে বাজিয়ে সুর।
তিনে বিষ্ণুপুর ॥

* * *

গান, বাজনা, মতিচুর।
এ তিন নিয়ে বিষ্ণুপুর ॥

* * *

গুলি, খিলি, মতিচুর
এ তিন নিয়ে বিষ্ণুপুর ॥
(মতিচুর-তামাক)

বীরচন্দ্রপুর: বাঁকুড়া

কথিত আছে, মল্লরাজবংশের জনৈক রাজা বীরচাঁদ গোস্বামী নামে এক ব্রাহ্মণকে এই মৌজাটি দান করেছিলেন এবং তাঁর নামানুসারে এই স্থানের নাম হয় বীরচন্দ্রপুর।

বীরনগর: নদিয়া

সাবেক নাম উলা। গ্রামবাসীদের ডাকাত ধরার সাহসিকতা এবং বীরত্বের জন্য এই স্থানটিকে বীরনগর আখ্যা দেওয়া হয়। স্থানটি সাধারণত উলা বীরনগর নামেও পরিচিত। (উলা দেখুন) শোনা যায়— প্রায় দুই শতাধিক বছর আগে এই অঞ্চলে ডাকাতের অত্যন্ত উপদ্রব ছিল। একবার মহাদেব মুখোপাধ্যায় নামে স্থানীয় এক জমিদারের বাড়িতে এক সশস্ত্র দস্যুদল আক্রমণ করলে

গ্রামবাসীরা একজোট হয়ে সেই আক্রমণের প্রতিরোধ করে। খণ্ডযুদ্ধে দস্যুদলের অধিকাংশ দুর্বৃত্ত হত বা আহত হয় এবং আঠারোজন ডাকাতকে গ্রামবাসীরা বন্দি করে তদানীন্তন ইংরেজ সরকারের হাতে সমর্পণ করে। ধৃত ডাকাতদের মধ্যে কয়েকজন তখনকার নামী-দাগি দস্যুও ছিল। বিচারে ইংরেজ সরকার ধৃত ডাকাতদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেন এবং আহত গ্রামবাসীদের প্রত্যেককে 'বিশ সিক্কা' করে পুরস্কার দেন। গ্রামবাসীদের সাহস এবং বীরত্বের জন্য আদালতের অভিপ্রায় অনুসারে তদানীন্তন জেলাশাসক স্থানটিকে সরকারিভাবে 'বীরনগর' নামকরণ করেন।

বীরভূম

সাঁওতালি মুণ্ডারী শব্দ 'বীর' অর্থে 'জঙ্গল'। আদিতে জঙ্গলাকীর্ণ এই অঞ্চলকে স্থানীয় সাঁওতাল আদিবাসীরা 'বীরভূইয়্যা' বা জঙ্গলময় ভূমি বলে অভিহিত করত। 'বীরভূইয়্যা' থেকে বীরভূম হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। কারও কারও মতে প্রায় আটশো বছর আগে পশ্চিমোত্তর প্রদেশ, সম্ভবত পঞ্জাব থেকে তিন রাজপুত ভাই স্থানীয় আদি বনবাসীদের পরাজিত করে এই অঞ্চল দখল করে এবং তিন জন তিনটি পৃথক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। তাদের একজনের নাম ছিল বীরসিংহ। তিনি নিজের নামানুসারে তাঁর রাজধানীর নাম রাখেন বীরসিংহপুর। অনেকের মতে বীরসিংহপুর থেকে এই অঞ্চলের নাম বীরভূম হয়েছে। আরও এক মতে 'মল্লভূমি'র অধীশ্বর মল্লজাতির বিভিন্ন শাখা যেমন 'মান,', 'সিংহ', 'বীর', 'বল' প্রভৃতি নানা জায়গায় ছড়িয়ে গিয়ে নিজেদের নামানুসারে মালভূমি, বীরভূমি, সিংহভূমি ইত্যাদি অঞ্চলের সৃষ্টি করে। সেই সুবাদে বীরভূমি থেকে বীরভূম হয়েছে বলে অনুমান করা হয়।

আবার অনেকে বলেন বীরাচারের জন্য প্রসিদ্ধ বলে এই অঞ্চলকে বীরভূমি বলা হত, যা পরে বীরভূম নামে পরিচিত হয়। কথিত আছে, পূর্বে বীরভূমে বীরাচার সম্মত ধর্মানুষ্ঠান সমধিক প্রচলিত ছিল। তারাপুর, নলহাটি, লাভপুরের ফুল্লরা, কঙ্কালীতলা প্রভৃতি পীঠস্থান তার প্রমাণ।

জৈন ধর্মগ্রন্থাদিতে প্রাচীন রাঢ় দেশের শ্বাপদসংকুল পশ্চিম অঞ্চলকে বজ্রভূমি বলা হয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে জৈনদের শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর এই অঞ্চলে ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করেছিলেন বলে জানা যায়। অনেকের বিশ্বাস এই বজ্রভূমিই বীরভূমি বা বীরভূম। কথিত আছে, কোনও সময়ে এই অঞ্চলটি

'বীরভূম কামকোটি' নামে পরিচিত ছিল, কিন্তু এর সপক্ষে কোনও যুক্তিসংগত তথ্য পাওয়া যায় না। ভবিষ্যপুরাণের ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডে এই অঞ্চলকে 'বীরদেশ' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। বীরদেশ-ই যে বীরভূমি বা বীরভূম সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই বলেই মনে হয়। আইন-ই-আকবরিতে বীরভূম নামের স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

বীরভূম নামকরণ সম্বন্ধে একটি প্রচলিত লোক-গাথা থেকে জানা যায় যে একদা বিষ্ণুপুরের এক অধিপতি তাঁর শিক্ষিত বাজপাখি দিয়ে পাখি শিকার করতে বেরিয়ে এই অঞ্চলে এসে পড়েন। কিছু দূরে একটা বক দেখতে পেয়ে তিনি বাজপাখিকে সেই বকের পেছনে লেলিয়ে দেন। বকটি কিন্তু পালানোর কোনও চেষ্টা না করে বাজপাখিকে আক্রমণ করে। বাজপাখি পরাজিত হয়ে রাজার কাছে ফিরে আসে, আর বক আগের মতো আপনমনে চরতে থাকে। বাজপাখিরা সাধারণত নিরীহ বক শিকার করে থাকে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে বিপরীত ব্যাপার দেখে রাজা অত্যন্ত বিস্মিত হলেন এবং ভাবলেন, যে-দেশের পাখি এত সাহসী হয় সে দেশের মানুষেরা নিশ্চয়ই অতিশয় বীর ও সাহসী হবে। তাই তিনি এই অঞ্চলের নামকরণ করলেন বীরভূমি বা বীরভূম।

প্রচলিত ছড়া:

নলহাটিতে মা ললাটেশ্বরী,
লাভপুরে মা ফুল্লরা।
সাঁইথিয়ায় মা নন্দেশ্বরী,
তারাপীঠে মা জয়তারা,
বোলপুরে কঙ্কালীতলা
বক্রেশ্বরে মা পায়ের তলা।
এই ছয় পীঠ নিয়ে বীরভূমের বড় গলা।

* * *

পুঁই, পোস্ত, কলাইয়ের ডাল।
এই তিনে বীরভূমের চাল ॥

* * *

লাউ, পোস্ত, কচুর ধুম।
তবে জানবি বীরভূম।

খায় পোস্ত, মারে ঘুম,
বাড়ি কোথা? না, বীরভূম ॥

* * *

হুগলির ভাল কোটাল, লেঠেল,
বীরভূমের ভাল খোল,
ঢাকের বাদ্যি থামলে ভাল,
বলো, হরি হরিবোল ॥

বীরসিংহ: পূ মেদিনীপুর

স্থাননামের ব্যুৎপত্তির ইতিহাস বা কিংবদন্তি জানা যায় না। পূর্বে এই স্থানটি হুগলি জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল, পরে মেদিনীপুরের সঙ্গে যুক্ত হয়। বীরসিংহ গ্রাম বাংলার আবালবৃদ্ধবনিতার পরিচিত স্বনামধন্য পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মস্থানরূপে খ্যাত।

বীরসিংহপুর: বীরভূম

কথিত আছে, এ অঞ্চলের প্রথম হিন্দু রাজপুত রাজা বীরসিংহের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত রাজধানী ছিল বীরসিংহপুর। প্রায় আটশো বছর আগে রাজপুত বীরসিংহ ও তাঁর দুই ভাই চৈতন্যসিংহ এবং ফতেসিংহ পশ্চিমোত্তর প্রদেশ থেকে মুসলমানদের দ্বারা পরাজিত ও বিতাড়িত হয়ে এই অঞ্চলে আসেন এবং স্থানীয় আদিবাসীদের পরাজিত করে তিন ভাই তিনটি পৃথক রাজ্য স্থাপন করেন। বীরসিংহ নিজের নামানুসারে তাঁর রাজধানীর নাম রাখেন বীরসিংহপুর। অনেকে বলেন বীরসিংহপুরই পরে বীরভূম নামে পরিচিত হয়।

(বীরভূম দেখুন)।

বুড়াবুড়ি কালুপুর: পূ মেদিনীপুর

স্থানটির আদিনাম কালুপুর। কথিত আছে, প্রায় দেড় শতাধিক বৎসর পূর্বে এই স্থানের পূর্বদিকে জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে একটি গাছের তলায় লোকচক্ষুর আড়ালে দুটো পাথরের মূর্তি মাটির তলায় চাপা পড়ে ছিল। সনাতন সামন্ত নামে এক ব্যক্তি স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে ওই মূর্তিদুটোর কথা জানতে পারেন। কথাটা জানাজানি হওয়ার পর কৌতূহলী কয়েকজন রাখাল বালক মূর্তিদুটোকে মাটি

খুঁড়ে বার করে পাশের নদীর জলে ফেলে দেয়। কিন্তু পরের দিন আবার সেই একই জায়গায় মূর্তিদুটোকে পাওয়া যায়। এই খবর লোকের মুখে প্রচারিত হলে দৈবজ্ঞানে গ্রামবাসীরা মূর্তিদুটোকে ফুল, বেলপাতা দিয়ে পুজো করতে আরম্ভ করে। কোনও অজানা কারণে মূর্তিদুটো বুড়াবুড়ি নামে খ্যাত হয়। সেই থেকে স্থানটি বুড়াবুড়ি কালুপুর নামে পরিচিত হয়।

বুধপুর: পুরুলিয়া
স্থানীয় বুদ্ধেশ্বর শিব মন্দির থেকে স্থাননাম বুধপুর হয়েছে।

প্রচলিত ছড়া:

বুধপুরের বুধেশ্বর (বুদ্ধেশ্বর)।
আনাড়ার বাণেশ্বর,
অযোধ্যার দামোদর,
গয়াধামের গদাধর ॥

বুলবুলচণ্ডী: মালদহ
শোনা যায়, প্রায় শতাধিক বছর আগে এখানে পুকুর খোঁড়ার সময় একটি অর্ধশায়িতা নারীমূর্তি পাওয়া যায়। নারীমূর্তির কোলের ওপর একটি শিশু শায়িত অবস্থায় এবং পায়ের কাছে এক পরিচারিকার মূর্তি খোদাই করা ছিল। গ্রামবাসীরা নারী মূর্তিটিকে মা চণ্ডীর মনে করে এবং বিধিসম্মতভাবে মূর্তিটির প্রতিষ্ঠা করে চণ্ডীজ্ঞানে নিত্যপূজার ব্যবস্থা করে। সম্ভবত গ্রামের পূর্বনাম ছিল বুলবুলি। এই চণ্ডীরূপী নারীমূর্তির আবিষ্কারের পরে স্থানটি বুলবুলচণ্ডী নামে পরিচিত হয়।

বৃন্দাবনপুর: বাঁকুড়া
কথিত আছে, একসময় মনোরম এই স্থানে কয়েক ঘর 'গোপ' বাস করতেন। একবার অধুনা উত্তরপ্রদেশের বৃন্দাবনধামের মদনমোহনজিউর সেবায়েত পরিবারের কোনও ব্যক্তি দৈবক্রমে এখানে আসেন এবং এক স্থানীয় গোপ পরিবারে আতিথ্য গ্রহণ করেন। কিছুকাল এখানে বাস করার পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সময় তিনি কয়েকজন গোপবালাকে সঙ্গে নিয়ে যান এবং নিজের স্মৃতিরক্ষার্থে এই স্থানের নাম রাখেন বৃন্দাবনপুর। তদানীন্তন বিষ্ণুপুররাজ এই নামকরণে আপত্তি জানালে বৃন্দাবনধামের সেবায়েত

রাজার কাছে এই জনপদটি ভিক্ষাস্বরূপ প্রার্থনা করেন। রাজা তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করে 'বৃন্দাবনপুর' স্থাননামের স্বীকৃতি দেন।

বেংকান্দি: জলপাইগুড়ি

একদা স্থানীয় ডোবা-নালাতে অসংখ্য ব্যাং দেখা যেত এবং সম্ভবত রাত্রে তাদের সমবেত আর্তরবকে ক্রন্দনের সঙ্গে তুলনা করে 'বেংকান্দি' স্থাননাম হয়ে থাকবে।

বেকোয়াল: নদিয়া

প্রচলিত ছড়া:

পাটকেবাড়ি ডুবুডুবু।
গলায়দ'ড়ে ভাসে।
সোনার বেকোয়াল আমার।
বসে বসে হাসে ৷৷

বেগড়ী: হাওড়া

কথিত আছে, প্রাচীনকালে এই স্থানের পূর্ব সীমানায় হাবসি রাজারা বাস করতেন। তাঁদের প্রাসাদসংলগ্ন একটি পরিখা এবং শেষসীমান্তে আর একটি পরিখা ছিল। প্রথম পরিখাটিকে বলা হত 'ভিতরগড়' এবং বাইরেরটিকে বলা হত 'বাহিরগড়'। সম্ভবত এই 'বাহিরগড়' থেকে 'বাইগড়ী' এবং ক্রমে 'বেগড়ী' হয়েছে বলে অনুমিত।

বেতঝরিয়া: প মেদিনীপুর

কথিত আছে, আগে এই স্থান ঘন বেত বনে পূর্ণ ছিল। আদিবাসীরা এই বেত বন পরিষ্কার করে বসবাসের উপযোগী করে তোলে বলে স্থাননাম বেতঝরিয়া হয়েছে।

বেতোড়: হাওড়া

শোনা যায় চাঁদ সওদাগর বাণিজ্য যাত্রাকালে এখানে নৌকা বেঁধে বেতাই চণ্ডীর পুজো করেছিলেন। সেই থেকে স্থাননাম বেতোড় হয়েছে। বিপ্রদাসের

‘মনসামঙ্গল’ কাব্যে এই স্থানের উল্লেখ আছে বলে জানা যায়। কথিত আছে, এই স্থানের প্রাচীন নাম ছিল বেতাধ্যচতুরকা (Vetaddachaturaka), যা থেকে অপভ্রংশে ‘বেতদ্ব’ হয় এবং পরে ‘বেতড়’ বা ‘বেতোড়’ হয়েছে। বেতাধ্যচতুরিকা নামের উল্লেখ Govindapur copper plate of Laksmana-Sena, late 12th century-তে পাওয়া যায়। স্থানটি একসময় একটি বড় বন্দর এবং পর্তুগিজদের ব্যাবসার একটি কেন্দ্র ছিল বলে জানা যায়।

বেথুয়াডহরী: নদিয়া
বেথুয়া অর্থে বেতোশাক বিশেষ। ডহর অর্থাৎ কোনও জলাশয়ের ধারে পর্যাপ্ত পরিমাণে বেতোশাকের প্রাপ্তিসূচক স্থাননাম। অন্য অর্থে বেথুয়া মানে নাবাল এবং ডহরী শব্দের অর্থে জমি। এই দুই মিলিয়ে নাবাল জমিসূচক স্থাননাম।

বেনালি: নদিয়া
নীলকর সাহেব বেনালি’র নামানুসারে স্থাননাম বেনালি হয়েছে।

বেন্দা: বাঁকুড়া
প্রচলিত ছড়া:

কিষ্টনগর ডুবুডুবু
বেন্দা ভাসে।
সোনার পাত্তোসায়ের
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসে ॥

বেলডাঙ্গা: মুর্শিদাবাদ
পূর্বনাম ‘লেক বিল’। অতীতকালে এখানে জলাভূমি ছিল বলে ওই নাম হয়েছিল। প্রায় তিনশো বছর আগে এই স্থানের পশ্চিমে প্রবাহিত ভাগীরথী নদীতে বাঁধ দেওয়ায় স্থানটি ক্রমশ ভরাট হয়ে ডাঙায় পরিণত হয়। নবাবি আমলের নথিপত্রে তখন এই স্থানটিকে ‘বীলডাঙ্গা’ নামে চিহ্নিত করা হয়, যা পরে বেলডাঙ্গা নামে পরিচিত হয়।

প্রচলিত ছড়া:

বেলডাঙ্গার বেটি,
কথায় পরিপাটি।
কাজের নাইকো খোঁজ,
হাত নাড়াতেই ভোজ ॥

* * *

বিশুর পুকুর ডুবুডুবু,
মাধবপুর ভাসে।
বাঁশ চাতরা গেল গেল,
বেলডাঙ্গা হাসে।

বেলাদহ: মুর্শিদাবাদ

শোনা যায়, এই স্থানটি পূর্বে গভীর বেনাবনে পূর্ণ ছিল। আশেপাশের জায়গার লোকেরা এখানে বেনা খড় কাটতে আসত। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এই স্থানে বসবাসের উপযুক্ত মনে করে এখানে বসতি স্থাপন করে। এখানে·একটি প্রাচীন দহ দেখতে পাওয়া যায়। সেই কারণে সম্ভবত স্থানের নাম বেনাদহ থেকে অপভ্রংশে বেলাদহ হয়েছে।

বেলাবেড়িয়া: প মেদিনীপুর

সুবর্ণরেখা এবং দালাং নদীর মধ্যবর্তী বেলাভূমিতে অবস্থিত জনবসতির জন্য স্থাননাম বেলাবেড়িয়া হয়েছে বলে মনে করা হয়। সুকুমার সেনের মতে বাড়িয়া মানে বেড়া দেওয়া অথবা প্রাচীর ঘেরা জায়গা। কথিত আছে, স্থানটি নিমাই চন্দ্ নামক জনৈক ওড়িশার হিন্দু রাজার কর্মচারী স্থাপন করেছিলেন।

প্রচলিত ছড়া:

ছিঁড়া জালে মাছ ধরে ধলভূয়্যানী।
চুন-দকতায় ভুলাই রাখে চিলকিগড়্যালী।
ঘরে ভাত নাই পান খায় ঝাড়গানাড়্যালী।
উঁচকপালে সিঁদুর পরে বেল্যাবেড়ালী।

বেলিয়াতোড়: বাঁকুড়া

শোনা যায় বালিপূর্ণ এই স্থানটি একদা বালি অপসারণ করে বসতি স্থাপন করা

হয় বলে স্থানটি বালিয়াতোড় বা বেলিয়াতোড় নামে পরিচিত হয়। কারও মতে তোড় শব্দের অর্থ অসম্পূর্ণ, ভাঙা। স্থানটি ধর্মরাজের গাজনের জন্য খ্যাত। এখানে ধর্মরাজের আবির্ভাব সম্বন্ধে একটি কাহিনি প্রচলিত আছে। প্রায় আড়াইশো বছর আগে স্থানীয় তাম্বূলী পরিবারের জনৈক ব্যক্তি নিকটবর্তী দামোদর নদীর ধার থেকে একটি গোলাকৃতি পাথর কুড়িয়ে পান। তিনি ওই পাথরটিকে ব্যবসায়ে ওজন কার্যে ব্যবহার করবেন ঠিক করেন। কিন্তু তিনি ওই পাথরটির এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য লক্ষ করেন। দাঁড়িপাল্লায় যে পরিমাণ মালই দেওয়া হোক না কেন তা ওই পাথরের সমতুল্য ওজনের হয়। কৌতূহলবশত তিনি পাথরটিকে এক ব্রাহ্মণ পুরোহিত বাড়িতে পুজোর জন্য গচ্ছিত রাখেন। সেই পুরোহিত এক স্বপ্নাদেশে জানতে পারেন যে, ওই শিলা সামান্য পাথর মাত্র নয়— সেটি ধর্মরাজ শিলা। কিন্তু গরিব ব্রাহ্মণ ধর্মরাজের নিত্যসেবার ব্যয়ভার বহন করার অক্ষমতা জানালে, গ্রামের সর্বসাধারণ ধর্মরাজশিলার পূজা-পাঠাদির ভার নেয় এবং গ্রামের মধ্যে একটি মন্দির তৈরি করে গোলাকার ধর্মরাজ শিলাকে প্রতিষ্ঠা করে। সেই থেকে সামাজিক প্রথা অনুসারে ধর্মরাজের নিত্য পূজা-পাঠাদি পরিচালিত হয় এবং প্রতি বছর আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথি থেকে তিনদিন ব্যাপী সাড়ম্বরে ধর্মরাজের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

প্রচলিত ছড়া:

বামুন, কায়েত, ম্যাচার জোর।
এ তিন নিয়ে বেলতোড় ৷৷

(ম্যাচা, এক ধরনের স্থানীয় মিষ্টান্ন)

বেলুটি: বীরভূম

কথিত আছে, বহুকাল পূর্বে অজয় নদ গতিপথ পরিবর্তন করায় এই স্থানে চরাভূমি জেগে ওঠে এবং পরে ওই চরাভূমিতে এক বিল্ববন (বেলে)-র সৃষ্টি হয়। ক্রমে জনবসতি গড়ে উঠলে সম্ভবত বিল্ববন থেকে স্থাননাম বেলুট এবং পরে বেলুটি হয়। জনশ্রুতি আছে, রাজকন্যা বিদ্যাবতীর কাছে অপমানিত হয়ে কালিদাস গভীর দুঃখে ভ্রমণ করতে করতে অজয় নদের তীরবর্তী এই বেলবনে এসে উপস্থিত হন এবং এক অলৌকিক ঘটনার মধ্যে সরস্বতীর কৃপা লাভ করে মহাকবিরূপে খ্যাতি অর্জন করেন।

বেলুড়: হাওড়া

স্থাননামের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোনও তথ্য জানা যায় না। এখানে জগৎবিখ্যাত বেলুড় মঠ এবং রামকৃষ্ণ সংঘের প্রধান কেন্দ্র অবস্থিত। বেলুড় মঠের সীমানার মধ্যে অবস্থিত স্বামী বিবেকানন্দের সমাধিমন্দির ও তাঁর বসবাসের কক্ষ একটি বিশিষ্ট দর্শনীয় স্থান।

প্রচলিত ছড়া:

গাঁজা, গুলি, খেলুড়ে।
তিন আছে বেলুড়ে ॥

বেহালা: কলকাতা

কলকাতা সংলগ্ন অতি প্রাচীন জনপদ। বর্তমানে কলকাতা কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত একটি এলাকা বিশেষ। কিংবদন্তি আছে যে, ভেলার ওপর মৃত পতি লখিন্দরের মৃতদেহ নিয়ে বেহুলা অনেকদিন এই স্থানে বাস করেছিলেন বলে বেহুলার নামানুসারে এই স্থানের নাম বেহুলা বা বেহালা হয়। 'কালীক্ষেত্র দীপিকা' গ্রন্থে এই স্থানটি 'বহুলা' নামে উল্লিখিত আছে।

প্রচলিত ছড়া:

মশা, মাছি, ময়লা।
এ তিন নিয়ে ব্যায়লা ॥

* * *

খানা, খন্দ, হোগলা।
এ তিন নিয়ে বেহালা ॥

বৈদ্যনাথপুর: হাওড়া

পূর্বনাম ইছাপুর। এই স্থানে স্বয়ম্ভু বৈদ্যনাথ শিবের অবস্থান হেতু স্থাননাম বৈদ্যনাথপুর হয়েছে।

বৈদ্যপুর: মুর্শিদাবাদ

বৈদ্যবংশীয় জিরেরাম সেনগুপ্ত নামে একজন চিকিৎসক প্রথম এই গ্রামটি পত্তন করেন বলে গ্রামের নাম বৈদ্যপুর হয়েছে বলে মনে হয়।

বৈদ্যবাটী: হুগলি

পূর্বে এই স্থানে বহু চিকিৎসক বা বৈদ্য বাস করতেন বলে স্থানটি বৈদ্যবাটী নামে পরিচিত হয়। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে এই স্থানের উল্লেখ আছে। বিপ্রদাস লিখেছেন, এখানে গঙ্গাতীরে চাঁদ সওদাগর একটি নিমগাছে পদ্মফুল ফুটতে দেখেছিলেন। কেউ কেউ বলেন যে, পুরী গমনকালে শ্রীচৈতন্যদেব এখানে গঙ্গার ঘাটে বিশ্রাম করেছিলেন এবং তাঁর আদেশে ঘাটের কাছে একটি নিমগাছ রোপণ করা হয়। শোনা যায় মহাপ্রভুর মহিমায় সেই নিমগাছে জবাফুল ফুটেছিল। সেই অলৌকিক নিমগাছের জন্যই নাকি শ্রীচৈতন্য 'নিমাই' নামে পরিচিত হন এবং স্থানটি 'নিমাইতীর্থ' রূপে খ্যাত হয়। বিভিন্ন চৈতন্য-সাহিত্যে নিমাইতীর্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাংলার প্রথম উপন্যাস টেকচাঁদ ঠাকুর প্রণীত 'আলালের ঘরে দুলাল'-এ বৈদ্যবাটীর উল্লেখ আছে।

প্রচলিত ছড়া:

কলা, কুমড়ো, শাকের আঁটি।
এ তিন নিয়ে বৈদ্যবাটী ॥

* * *

কলাপাতা, কাঠের আঁটি।
এ দুই নিয়ে বৈদ্যবাটী ॥

বৈনান: বর্ধমান

মুসলমান আমলে বিদ্রোহী হিন্দু গ্রামের ওপর 'বা-ই-নান্' কর নামে একপ্রকার কর বসানো হত। সেই থেকে অপভ্রংশে স্থাননাম বৈনান হয়েছে বলে অনুমিত। অন্য মতে নামটি 'অস্ট্রিক' গোষ্ঠীজাত, কিন্তু সেক্ষেত্রে স্থাননামের অর্থ অস্পষ্ট।

বৈরহাট্টা: দ দিনাজপুর

কিংবদন্তি আছে, মহাভারতে উল্লিখিত বিরাট রাজার আবাস এই স্থানেই ছিল। বিরাট রাজার নাম থেকে স্থানের নাম বৈরহাট্টা হয়েছে বলে অনেকে অনুমান করেন।

বৈষ্ণবপাড়া: মুর্শিদাবাদ

স্থানের নাম সম্বন্ধে একটি লোকগাথা প্রচলিত আছে। বহুদিন আগে এখানে বড় গৌরচন্দ্র দাস নামে একজন বৈষ্ণব সাধক বাস করতেন। যদিও তিনি সংসারত্যাগী ছিলেন, তাঁর কাছে ঘোড়া ও বেতনভোগী সহিস ইত্যাদি ছিল। একদিন তাঁর সহিস গ্রামের পশ্চিম দিকে জলঙ্গী নদীর তীরে ঘাস কেটে চাদরে বাঁধছিল। সেই সময় নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণ নৌকাযোগে ওই পথে যাচ্ছিলেন। চাদরে ঘাস বাঁধতে দেখে তিনি কৌতূহলবশত সেই সহিসকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করায় সহিস তার মনিব গৌরদাসের সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে রাজাকে জানায়। রাজা তখনই গৌরদাসকে নদীর তীরে ডেকে পাঠান। হাতে মালা, গায়ে নামাবলী, খড়ম পায়ে গৌরচন্দ্র এলে রাজা জানতে চাইলেন তিনি বৈষ্ণব হয়েও ঘোড়া, সহিস ইত্যাদির ব্যবস্থা কেন রেখেছেন। উত্তরে সাধক জানালেন যে মানুষের বিপদ আপদে সাহায্য করার জন্যই অর্থাৎ অসুখে-বিসুখে চিকিৎসককে খবর দেওয়া, মৃত্যুর খবর আত্মীয়স্বজনকে পৌঁছে দেওয়া ইত্যাদি জনহিত কাজের জন্যই তিনি ওইরকম ব্যবস্থা রেখেছেন। উত্তর শুনে প্রীত হয়ে রাজা গৌরচন্দ্রের কাছে একটি কীর্তন শুনতে চাইলেন। সাধক তখনই তাঁকে একখানি কীর্তন গেয়ে শোনালেন। গান শুনে মুগ্ধ হয়ে রাজা আগামী পুজোর উৎসবে নাটোরের রাজবাড়িতে দলবল নিয়ে কীর্তন গাওয়ার জন্য গৌরচন্দ্রকে আমন্ত্রণ জানালেন। যথাসময়ে গৌরদাস রাজবাড়িতে কীর্তন শোনালেন। রাজা সন্তুষ্ট হয়ে গৌরচন্দ্র দাসকে ভূ-সম্পত্তি উপহার দিতে চাইলে তিনি রাজাকে বললেন, পার্থিব সুখ-সুবিধা বা ভোগ বিলাসের মধ্যে তিনি আর যেতে চান না। তবে রাজার যদি দয়া হয় তা হলে তাঁর স্বজাতি বৈষ্ণবদের জন্য কিছু নিষ্কর সম্পত্তি দান করতে পারেন। নাটোরের রাজা গৌরদাসকে অনেক নিষ্কর জমি দান করেন এবং ক্রমে সেই জমিতে অনেক বৈষ্ণব স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করলে স্থানের নাম হয় বৈষ্ণবপাড়া।

বোঁয়াই: বর্ধমান

জনশ্রুতি আছে, বুদ্ধিমন্ত খাঁ নামে এক ব্যক্তি বনজঙ্গল কেটে এখানে প্রথম বসতি স্থাপন করেন। স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে তিনি এখান থেকে প্রায় দু' মাইল দূরে রায়কা দিঘির এক প্রান্তে একটি শেওড়া গাছের তলা থেকে এক শিলামূর্তি

আবিষ্কার করেন। ওই শিলামূর্তিকে তিনি চণ্ডীজ্ঞানে নিত্যসেবার ব্যবস্থা করেন। বুদ্ধিমন্ত থেকে সেই দেবী বোঁয়াই চণ্ডী নামে খ্যাত হন এবং স্থাননাম হয় 'বোঁয়াই'।

বোড়াল: দ চব্বিশ পরগনা
জনশ্রুতি আছে, সুন্দরবনের নিকটবর্তী এই স্থানের নিম্নভূমি গঙ্গার জল প্লাবনে প্রায়ই ডুবে যেত। খেত-খামার ও ধান জমির সীমানা নির্ধারক 'আল'গুলিও জলের তলায় চলে যেত বলে স্থানীয় লোকে বলত 'বুড়িয়া' আল অর্থাৎ 'ডোবা-আল'। 'বুড়িয়া' আল অপভ্রংশে 'বোড়া' আল হয় এবং পরে বোড়াল হয়েছে বলে অনুমিত। স্থানটি অষ্টধাতু নির্মিত চতুর্ভুজা ত্রিনয়নী সুন্দরী ষোড়শী ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর মন্দিরের জন্য খ্যাত।

বোড়ো বলরাম: বর্ধমান
এই স্থানের আদি নাম বোড়ো। এখানে প্রতিষ্ঠিত বলরাম ঠাকুরের মন্দিরের জন্য বোড়োর সঙ্গে বলরাম যুক্ত হয়ে স্থাননাম বোড়ো বলরাম হয়েছে।

বোন্‌হা: বীরভূম
'বোন্‌হা' ফারসি শব্দ, অর্থ পীর মহাপুরুষদের আবির্ভাব স্থান। কথিত আছে, এক সময় এই স্থানে নেসার মিঞা নামে জনৈক ফারসি ভাষার ওস্তাদ বাস করতেন। সেই সূত্রে স্থাননাম বোন্‌হা হয়েছে বলে অনুমিত।

বোলপুর: বীরভূম
একসময় নিকটবর্তী সুপুর নামক স্থানে রাজা সুরতের রাজধানী ছিল। তিনি একবার মা চণ্ডিকার সন্তুষ্টির জন্য এক লক্ষ বলি চড়ান। সেই থেকে 'বলি' চড়ানোর স্থান হিসেবে স্থাননাম বলি-পুর থেকে অপভ্রংশে বোলপুর হয়েছে।

প্রচলিত ছড়া:

বোলপুরের ধুলো,
নানুরের মুলো।
কীর্ণহারের তুলো ॥

নলহাটিতে মা ললাটেশ্বরী,
লাভপুরে মা ফুল্লরা।
সাঁইথিয়ায় মা নন্দেশ্বরী,
তারাপীঠে মা জয় তারা।
বোলপুরে কঙ্কালীতলা,
বক্রেশ্বরে মা'র পায়ের তলা,
এই ছয় পীঠ নিয়ে বীরভূমের বড় গলা।

ব্যাঁটরা: হাওড়া

প্রচলিত ছড়া:

ছাতা, জুতো, পেঁটরা।
এ তিন নিয়ে ব্যাঁটরা ॥

* * *

চোর, চোট্টা, ছ্যাঁচড়া।
তিন নিয়ে ব্যাঁটরা ॥

ব্যান্ডেল: হুগলি

'বন্দর' কথা থেকে ব্যান্ডেল নামের উৎপত্তি হয়েছে বলে অনুমিত। একদা স্থানটি পর্তুগিজদের অধিকারে ছিল। ১৫৫৯ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগিজদের নির্মিত গির্জাটি এখানকার একটি দ্রষ্টব্য স্থান।

ব্যারাকপুর: উ চব্বিশ পরগনা

অনেকের মতে এই স্থানের আদি নাম 'চানক'। সম্ভবত এখানকার জব চার্নকের বাগানবাড়ি থেকে এইরকম ধারণা করা হয়। কিন্তু তথ্যগত সূত্রে জানা যায় কাঁকিনাড়া ও বরাহনগরের মধ্যে 'চানক' নামে একটি স্থান ব্যারাকপুর পত্তন হওয়ার আগে থেকেই ছিল। ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে অঙ্কিত ব্রুসের মানচিত্রে এই 'চানক' নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৭৭২-এ সৈনিক ছাউনি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গেই ব্যারাকপুর স্থাননামের যোগসূত্র আছে বলে অনেকে মনে করেন। সৈনিক ছাউনিকে ইংরেজিতে 'ব্যারাক' বলে। সেই থেকেই স্থাননাম 'ব্যারাকপুর' হয়েছে বলে মনে হয়।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম (বা সিপাহি বিদ্রোহ) এই ব্যারাকপুরের সৈনিক ছাউনি থেকেই শুরু হয়। ঘটনাটা এইরকম— একদিন ব্যারাকপুর বারুদখানার একজন নিম্নজাতীয় খালাসি জনৈক উচ্চবর্ণের সিপাহির লোটা থেকে জল খেতে চাইলে সে আপত্তি করে বলে যে, নীচ জাতির সংস্পর্শে তার লোটা অপবিত্র হয়ে যাবে। এই কথায় খালাসিটি তাকে বলে যে কলকাতার কেল্লায় যে নতুন ধরনের টোটা তৈরি হচ্ছে তাতে গোরু ও শুয়োরের চর্বি মেশানো আছে। সিপাহিদের দাঁত দিয়ে সেই টোটা কেটে বন্দুকে পুরতে হবে, তখন জাতের গুমর আর বেশিদিন থাকবে না। এই খবর সিপাহি মহলে প্রচার হলে তাদের মধ্যে দারুণ অসন্তোষ ও চাঞ্চল্য দেখা দেয়। ইংরেজ সেনাপতি বহু যুক্তিতর্ক দিয়েও সিপাহিদের বিশ্বাস টলাতে অক্ষম হয়। সিপাহি মঙ্গল পাণ্ডে অন্যান্য সিপাহিদের জীবনপণ করে জাতি ও ধর্ম রক্ষার জন্য উত্তেজিত করতে থাকে। সশস্ত্র মঙ্গল পাণ্ডেকে দমন করতে গিয়ে একজন সেনানায়ক ও এক সার্জেন্ট মেজর তার বন্দুকের গুলিতে প্রাণ হারায়। ২৯ মার্চ ১৮৫৭ সালে এই ঘটনা ঘটে। ইংরেজ সেনানায়কদের আদেশ সত্ত্বেও কোনও সিপাহি ইংরেজ সেনা অধিকারীদের রক্ষা করতে এগিয়ে আসে না। তখন ছাউনিতে কার্যরত ইংরেজ সৈন্যদের সাহায্যে মঙ্গল পাণ্ডেকে গ্রেফতার করা হয় এবং কোর্ট-মার্শালের বিচারে তাকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। এরপর বিদ্রোহী 'বেঙ্গল রেজিমেন্ট'-কে নিরস্ত্র করে সৈন্যদল ভেঙে দেওয়া হয়। অচিরেই বিদ্রোহের খবর সমস্ত উত্তর ভারতে দাবাগ্নির মতো ছড়িয়ে পড়ে এবং গদিচ্যুত নবাব বাদশাহ, রাজা মহারাজা, জমিদার-তালুকদার ইত্যাদির সহযোগিতায় এই বিদ্রোহ ইংরেজের বিরুদ্ধে একটি সর্বজনীন সংগ্রামে পরিণত হয়।

ব্যারাকপুরে গঙ্গার ধারে মঙ্গল পাণ্ডের স্মৃতিরক্ষার জন্য পরিকল্পিত শহিদ মঙ্গল পাণ্ডে-উদ্যান একটি দর্শনীয় স্থান। ব্যারাকপুরের অন্তর্গত মণিরামপুর পল্লিতে প্রসিদ্ধ জননায়ক বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভূমি ছিল। এখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

ব্রহ্মোত্তর মানিকচক: মুর্শিদাবাদ

সাবেক নাম মানিকচক। বহুকাল আগে এখানে অনেক ব্রাহ্মণ বাস করতেন এবং জনপদটি তাঁদের ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি ছিল। সেই কারণেই সম্ভবত স্থানের নাম ব্রহ্মোত্তর-মানিকচক হয়েছে।

ব্রাহ্মণীতলা: নদিয়া
মনসার নামভেদে পূজিতা ব্রাহ্মণীদেবী থেকে স্থাননাম ব্রাহ্মণীতলা হয়েছে। কথিত আছে, নাকাসীপাড়ার জমিদার ডোমনচন্দ্র সিংহরায় স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে এখানে ব্রাহ্মণীদেবীর পুজো আরম্ভ করেন।

ভক্তবান্দ: বাঁকুড়া
একজন শিবভক্ত স্থানীয় বাঁধের জল থেকে একটি শিবলিঙ্গ আবিষ্কার করে এই স্থানে প্রতিষ্ঠা করেন। সেই কারণেই স্থানের নাম ভক্তবান্দ হয়েছে বলে অনেকে অনুমান করেন।

ভগবানগোলা: মুর্শিদাবাদ
ভগবান + গোলা। গোলা অর্থে আড়ত, বাজার বা গঞ্জ। একদা ভাগীরথী, জলঙ্গী ও পদ্মার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত এই স্থানটি বন্দরনগর নামে খ্যাত ছিল এবং ধান, শস্য, রেশম ইত্যাদি ব্যবসায়ের এক প্রধান কেন্দ্র ছিল। স্থাননামে গোলার সঙ্গে ভগবান কথার যোগসূত্র অস্পষ্ট হলেও জানা যায় যে, বিশিষ্ট বৈষ্ণব ভক্ত রামচন্দ্র কবিরাজ ও তাঁর অনুজ বিখ্যাত পদাবলী রচয়িতা গোবিন্দ দাস এই গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। সেই কারণেই স্থানটি সম্ভবত ভগবানগোলা নামে পরিচিত হয়। এখানকার শান্ত শ্যামল পল্লিশ্রীর কথা ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে বিশপ হেবার তাঁর ভ্রমণ বিবরণীতে উল্লেখ করেছেন। পলাশী যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সিরাজউদ্দৌলা ভগবানগোলা থেকেই নৌকাযোগে রাজমহল অভিমুখে পলায়ন করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্গিদের বারবার আক্রমণে স্থানটি বিধ্বস্ত হয় এবং ক্রমে পদ্মা নদী দিক পরিবর্তন করায় স্থানটির ব্যবসায়িক এবং ঐতিহাসিক গুরুত্ব কমে গিয়ে বর্তমানে একটি নগণ্য গ্রামে পরিণত হয়েছে। সাধারণ লোকের কাছে স্থানটি নতুন ভগবানগোলা অথবা কোনও অজানা কারণে 'আলাতলী' নামে পরিচিত।

ভগীরথপুর: মুর্শিদাবাদ
কথিত আছে, পাটলিপুত্র থেকে বল্লালসেন কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে ভগীরথ নামে একজন ব্যবসায়ী নৌকাযোগে ভৈরব নদীর তীরে এই স্থানে এসে গ্রাম পত্তন করেন। তাঁর নাম অনুসারে স্থাননাম ভগীরথপুর হয়েছে বলে মনে করা হয়।

ভদ্রকালী: প মেদিনীপুর

এখানে প্রতিষ্ঠিত ভদ্রকালীর নাম অনুসারে স্থাননাম।

হুগলি জেলাতেও ভদ্রকালী নামে জায়গা আছে।

প্রচলিত ছড়া:

চুন, সুরকি, বালি
তিনে ভদ্রকালী ॥

ভদ্রপুর: বীরভূম

স্থানটি ভাদুর নামেও পরিচিত এবং ইতিহাস-বিশ্রুত মহারাজা নন্দকুমারের জন্মস্থান বলে খ্যাত।

প্রচলিত ছড়া:

ভাদুরের নন্দকুমার
লক্ষ বামুন করলে সুমার।
কেউ খেলে মাছের মুড়ো,
কেউ খেলে বন্দুকের হুড়ো।

* * *

নন্দকুমার রায় ছিল বাঙ্গালার অধিকারী।
হেস্টিংস সাহেব এল জান করিবারে বারি ॥
নন্দকুমারের মা কাঁদে ঐ গঙ্গার পানে চেয়ে।
আর না আসিবে বাছা জোড়া ডিঙ্গি বেয়ে ॥

ভদ্রেশ্বর: হুগলি

পূর্বনাম বুদেশী। এখানে প্রতিষ্ঠিত ভদ্রেশ্বর শিবলিঙ্গ থেকে স্থাননাম ভদ্রেশ্বর হয়েছে।

ভাঙামোড়: হুগলি

প্রচলিত ছড়া:

বামুন, বদ্যি, বাঁশের গোড়া।
এ তিন নিয়ে ভাঙামোড়া ॥

ভাটপাড়া: উ চব্বিশ পরগনা

ভাটপাড়া ভট্টপল্লী নামেও খ্যাত। ভাটপাড়া বা ভট্টপল্লী নামকরণ সম্বন্ধে নানারকম মত আছে। অনেকের মতে 'ভাটপাড়া'-ই মৌলিক নাম। ভাট বামুন বা ভট্টাচার্যদের এবং পণ্ডিত সমাজের বাসস্থান হওয়ায় এই নামের সংস্কৃতিকরণ হয়ে 'ভট্টপল্লী' হয়েছে। 'ভাটপাড়া' নামের উল্লেখ Sylet Bhatra copper plate inscription of Govinda-Keseva-Deva; 11th century C. 1049-তে পাওয়া যায়।

আর এক মতে 'ভাট' নামক শ্রেণি বিশেষের আবাস বা এই স্থানে 'ভাট' নামক এক শ্রেণির গাছের জঙ্গলের জন্য 'ভাটপাড়া' নাম হয়েছে। অন্য এক মতে মহারাজা প্রতাপাদিত্যের ভক্তিভাজন সিদ্ধপুরুষ আল্লাল ভট্ট (গণপতি ভট্টের পুত্র এবং নারায়ণ ঠাকুরের শ্বশুর) তাঁর অন্তিমকালে কাঁকিনাড়ায় গঙ্গাতীরে বাস করেছিলেন বলে প্রতাপাদিত্য পাশের জঙ্গলে 'ভট্টপল্লি' জনপদের প্রতিষ্ঠা করেন। পরে ভট্টপল্লি অপভ্রংশে ভাটপাড়া হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। একদা ভাটপাড়া 'টোল' এবং সংস্কৃত শিক্ষার জন্য খ্যাত ছিল। তার কিছু কিছু নিদর্শন এখনও পাওয়া যায়।

প্রচলিত ছড়া:

টিকি, ঢেঁকি, সজনে খাড়া।
এ তিন নিয়ে ভাটপাড়া ॥

পাঁজি, পুঁথি, স্তোত্র-পড়া।
এ তিন নিয়ে ভাটপাড়া ॥

ভাটাকুল: বর্ধমান

প্রচলিত ছড়া:

কালো কাপড়, মাথার চুল।
বাড়ি কোথা? না, ভাটাকুল ॥

ভাড়াডাঙ্গা: মুর্শিদাবাদ

শোনা যায়, আগে এই অঞ্চলে একটি বড় নদী বহতা ছিল। সেই সময় এই

স্থানে জলপথে যাতায়াত করার জন্য নৌকা ভাড়া পাওয়া যেত। পরে এখানে জনবসতি গড়ে উঠলে স্থানের নাম হয় ভাড়াডাঙ্গা।

ভাদীশ্বর: বীরভূম
বাংলায় মুসলমান রাজত্বকালে এই অঞ্চলে ভদ্রেশ্বর নামে এক রাজা ছিলেন বলে জানা যায়। সেই রাজার নামানুসারে স্থাননাম হয় ভদ্রেশ্বর, যা পরে অপভ্রংশে ভাদীশ্বর হয়েছে বলে অনুমিত।

ভালকী: বর্ধমান
প্রবাদ আছে, অনেকদিন আগে এক পূর্ণগর্ভা মহিলা পুকুরে স্নান করতে এলে হঠাৎ এক বন্য ভালুক তাকে আক্রমণ করে এবং মুখে করে তুলে নিয়ে বনের মধ্যে চলে যায়। এই ঘটনার কিছুদিন পরে এক ব্রাহ্মণ বনের মধ্যে দিয়ে যাবার পথে এক ভালুকের গর্তের মধ্যে একটি সদ্যোজাত মনুষ্যশিশুকে ক্রন্দনরত দেখে দয়াপরবশ হয়ে শিশুটিকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন। ব্রাহ্মণের স্ত্রী শিশুটিকে সযত্নে প্রতিপালন করতে থাকেন এবং ভালুকের গর্ত থেকে পাওয়া গিয়েছিল বলে শিশুটির নাম রাখেন 'ভল্লুপাদ'। কথিত আছে, এই ভল্লুপাদ বড় হয়ে 'ভাল্কী'-এর রাজা হয়েছিলেন এবং তাঁর রাজধানীর নাম হয় 'ভাল্লি', যা পরে অপভ্রংশে 'ভালকী' হয় বলে অনুমিত। অন্য মতে, ভল্লাঙ্ক নামে এক প্রকার শাক থেকে কিংবা ভল্লাতক (কাজুবাদাম গাছ) থেকে স্থাননাম হয়েছে।

ভাসুর কাটা: পূ মেদিনীপুর
কথিত আছে, কোনও কামুক ভাসুর ভ্রাতৃবধূর হাতে নিহত হওয়ার কাহিনির সঙ্গে জড়িত স্থানের নাম।

ভিটা: বর্ধমান
পূর্বনাম বাসুদেবপুর। বর্ধমান মহারাজার খাস তালুক 'কাপুড়ে চর'কে লাট বাসুদেবপুর থেকে পৃথক করে দেখানোর জন্য বাসুদেবপুরের নাম পরিবর্তন করে 'ভিটা' নামে জমিদারি সেরেস্তায় নথিভুক্ত করা হয়।

ভীমগড়: বীরভূম
জনশ্রুতি আছে, বনবাসকালে পঞ্চপাণ্ডব এই স্থানে কিছুদিন বাস করেছিলেন। সেই সময় ভীম স্থানীয় একটি গড়ের কাছে শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করেন। সেই থেকে স্থাননাম ভীমগড় হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।

ভুরকুণ্ডা: বীরভূম
প্রচলিত ছড়া:

মুলুকের অপরাজিতা
মঙ্গলডিহির বাস।
ভুরকুণ্ডার ডেঙ্গো ঠাকুর,
শুনতে উপহাস ॥

ভুরশুট/ভুরশো: হুগলি
পূর্বনাম ভূরিশ্রেষ্ঠ। ভূরি = বহু এবং শ্রেষ্ঠী = বণিক। অর্থাৎ যে স্থানে একত্রে বহু বণিক বসবাস করে সেই সূত্রে স্থাননাম। বর্তমানে ভুরশুট বা ভুরশো নামে পরিচিত। কথিত আছে, স্থানটি একদা ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজার রাজধানী এবং প্রধান বাণিজ্যবন্দর ছিল। সেই সময় ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্য বর্তমান হাওড়া, হুগলি এবং মেদিনীপুরের কিছুটা নিয়ে গঠিত ছিল। ধনী শ্রেষ্ঠী বা বণিকেরা ছাড়া বহু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এই স্থানে বাস করতেন বলে জানা যায়। কেউ কেউ বলেন, হিন্দু মন্দির ধ্বংসকারী ইতিহাস বিশ্রুত কালাপাহাড় ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজবংশের লোক ছিলেন। তাঁর আদিনাম ছিল রাজীবলোচন রায় এবং ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজা রুদ্রনারায়ণের সেনাপতি ছিলেন। কথিত আছে, রাজীবলোচনের বীরত্বে ও সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে এক নবাবকন্যা তাঁর প্রেমে পড়েন। অনেক ইতস্তত করে রাজীবলোচন তাকে বিয়ে করেন। হিন্দু হয়ে মুসলমান কন্যাকে বিয়ে করায় রাজীবলোচন স্বসমাজে অপমানিত ও নিগৃহীত হন। রাজীবলোচন ক্ষুব্ধ হয়ে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হয়ে দারুণ হিন্দুবিদ্বেষী হয়ে পড়েন এবং হিন্দু মন্দির ধ্বংসকারী কালাপাহাড় নামে পরিচিত হন।

ভৈরবচন্দ্রপুর: নদিয়া
নদিয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের তৃতীয় পুত্র ভৈরবচন্দ্রের নামে স্থাননাম।

ভৈরবদাঁড়ী: পূ মেদিনীপুর
ভৈরব + দাঁড়ী। বনদেবতা ভৈরবের 'দাঁড়া' থেকে স্থাননাম। 'দাঁড়া' শব্দের অর্থ পবিত্র স্থান। অপভ্রংশে 'দাঁড়ী' হয়েছে।

ভৈরবপুর: বাঁকুড়া
জনশ্রুতি আছে, স্থানীয় রায়বংশীয় এক ব্যক্তি নিকটবর্তী জঙ্গলাকীর্ণ স্থান থেকে একটি শিশু সন্তান উদ্ধার করেন এবং তাকে নিজের সন্তানতুল্য লালনপালন করেন। শিশুটি বড় হলে একদিন একজন সন্ন্যাসী এসে সেই বালকের হাতে একটি পাথরের ভৈরবমূর্তি দিয়ে যান। এই ঘটনা থেকেই সম্ভবত স্থাননাম ভৈরবপুর হয়েছে।

ভোঁপুর: হুগলি
প্রবাদ আছে এই স্থানে মহাদেব স্বয়ম্ভু অর্থাৎ ভূমি ফুঁড়ে উঠেছিলেন বলে স্থানের নাম হয় ভুঁইফোড়, যা পরে অপভ্রংশে ভোঁপুর হয়েছে।

মগরা: বর্ধমান
জনশ্রুতি আছে, বহুকাল আগে একদল দস্যু বেহুলা নদীতে সদাগরি জাহাজ লুটপাট করে বেড়াত। পরে তারাই নদীকূলবর্তী স্থানে বসবাস করে গ্রাম পত্তন করে। দস্যু বা মগদের বসতি বলে স্থানটি 'মগরা' নামে পরিচিত হয়।

মঙ্গলকোট: বর্ধমান
পূর্বনাম 'মঙ্গলকোষ্ঠ'। অপভ্রংশে মঙ্গলকোট হয়েছে। স্থানটি আঠারো মুসলমান পীরের স্থান বলে খ্যাত। কথিত আছে, একসময় এখানে বিক্রমজিৎ (কারও মতে বিক্রমকেশরী) নামে এক হিন্দু রাজার রাজত্ব ছিল। কেউ কেউ বলেন গোপভূমের সদ্গোপ রাজাদের কোনও এক শাখার বংশধররা এখানে রাজত্ব করতেন। আঠারোজন গাজি বা ধর্মযোদ্ধা মঙ্গলকোট দখল করতে

এলে এক এক করে সতেরোজন গাজি বিক্রমজিতের পরাক্রমে পরাজিত ও নিহত হন। শেষে গজনবী নামে একজন গাজি বিক্রমজিৎকে পরাজিত করে মঙ্গলকোট দখল করে। ধর্মযুদ্ধে নিহত গাজি বা বীরদের সমাধি এখানে আছে বলে জানা যায়, তার মধ্যে 'হামিদ দানেশমন্দ বাঙ্গালী'র সমাধি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মঙ্গলঘাট: হাওড়া

প্রচলিত ছড়া:

নন্টে বাটুলের পান
মঙ্গলঘাটের ধান ॥

মঙ্গলডিহি: বীরভূম

প্রচলিত ছড়া:

মুলুকের অপরাজিতা,
মঙ্গলডিহির রাস।
ভুরকুন্ডার ডেঙ্গো ঠাকুর,
শুনতে উপহাস ॥

মটগোদা: বাঁকুড়া

জনশ্রুতি আছে, বহুকাল পূর্বে এখানে গদাধর নামে জনৈক সাধক একটি মঠ স্থাপন করে সাধন ভজন করতেন। সেই মঠের এখন আর কোনও অস্তিত্ব নেই, কিন্তু লোকমুখে স্থানটি মঠ গদাধর নামে পরিচিত হয়, যা পরে অপভ্রংশে মটগোদা হয়।

মণ্ডলকুলী: প মেদিনীপুর

মণ্ডল + কুলী। কুলী/কোপা অর্থে কোপানো বা চাবকানো অথবা জলপ্রণালী। মণ্ডলের সঙ্গে কুলী শব্দের যোগসূত্র অস্পষ্ট। এই স্থাননামের উল্লেখ Nowgaon copper plate of Bala Varman of Pragjyotisa C 975-এ পাওয়া যায়।

মনিভঞ্জন: দার্জিলিং
মূল নেপালি থেকে উদ্ভূত নাম। অর্থ 'মনি'র নিকটে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী তল বা ঢালু স্থান। 'মনি' অর্থে বৌদ্ধস্তূপ বোঝায়।

ময়না: পূ মেদিনীপুর
প্রাচীন ময়নাগড় বর্তমানে ময়না নামে পরিচিত। ময়না নামটি মদন গাছ থেকে এসেছে বলে কেউ কেউ বলেন। নবম শতাব্দীতে ময়নাগড়ে কর্ণসেন নামে এক রাজা ছিলেন। বীরভূমের অজয়গড়ের সামন্ত গোপ-রাজ সোম ঘোষের পুত্র ইছাই ঘোষ কর্ণসেনকে পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত করেন। যুদ্ধে কর্ণসেনের ছ'পুত্র নিহত হয়। সেই শোকে কর্ণসেন তদানীন্তন গৌড়েশ্বর ধর্মপালের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তাঁর শ্যালিকা ধর্মঠাকুরের উপাসিকা রঞ্জাবতীর পাণিগ্রহণ করেন। ধর্মঠাকুরের বরে রঞ্জাবতীর গর্ভে লাউসেন নামে কর্ণসেনের এক পুত্র হয়। কর্ণসেনের পুত্র লাউসেন ইছাই ঘোষকে যুদ্ধে নিহত করে পিতার হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে লাউসেনের বীরত্বের কাহিনি সবিস্তারে বর্ণিত আছে। ময়নাগড়ের প্রসিদ্ধ প্রাচীন রুঙ্কিণী নাম্নী কালী ও লোকেশ্বর শিব লাউসেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলে লোকে বিশ্বাস করে।

প্রচলিত ছড়া:

ওল, জাউর (কচু), কিটনা (কুটকুটে)।
এই নিয়ে ময়না ॥

* * *

দে, নন্দীর টাকা,
কুচল মাঝির পা্কা।
দাসের ঘরে ধান,
ময়না রাজার মান ॥

মল্লভূম: বাঁকুড়া
(বিষ্ণুপুর দেখুন।)

মল্লারপুর: বীরভূম
জনশ্রুতি আছে, স্বপ্নাদেশ অনুযায়ী রাজা মল্লনাথ এই স্থানে মল্লেশ্বর

শিবের প্রতিষ্ঠা করেন। সেই থেকে স্থাননাম মল্লপুর হয়, যা পরে মল্লারপুর হয়েছে।

মসিদপুর: বর্ধমান
পূর্বনাম দেওড়া। একদা এখানে শ্বেতগঙ্গা নামে একটি বড় দিঘি ছিল এবং তার উত্তর পাড়ে একটি দেবগৃহ ছিল। দেবগৃহ অপভ্রংশে দেওড়া হয়। এক সময় ওই দেবগৃহের ধ্বংসাবশেষের ওপর একটি মসজিদ তৈরি হয় এবং স্থানটি মসজিদপুর নামে পরিচিত হয়, যা পরে অপভ্রংশে মসিদপুর হয়েছে।

মস্তাপুর: মালদহ
প্রচলিত ছড়া:

চৈতা, মস্তাপুর
মুখ চড়চড়, পুকুর দূর ॥

মহতা: মুর্শিদাবাদ
পূর্বনাম 'মহন্ত প্রকাশ' (Mahanta-Prakasa) অপভ্রংশে মহতা হয়েছে। মহন্ত প্রকাশ নামের উল্লেখ Khalimpur Grant of Dharmapala, North Central Bengal, 1st quarter of the 9th century-তে পাওয়া যায়।

মহলা: মুর্শিদাবাদ
যশোহরের রাজা বসন্ত রায় কয়েকজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও জ্যোতিষী নিয়ে এই স্থানে বসতি স্থাপন করেন। আদিতে স্থানের নাম বসন্ত রায়ের মহল্লা ছিল। বর্তমানে 'মহলা' নামে পরিচিত।

মহানন্দটোলা: মালদহ
পূর্বনাম কাদাটে দিয়ার। গঙ্গার চর থেকে সৃষ্টি বলে প্রথমে এই প্রকার স্থাননাম হয়। পরবর্তীকালে এখানকার প্রধান মণ্ডল মহানন্দ মণ্ডলের নামে স্থাননাম হয় মহানন্দটোলা।

মহানাদ: হুগলি

পূর্বনাম কিশাবতী। কথিত আছে, সুদূর অতীতে এই স্থানে একটি দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ পতিত হয় এবং হাওয়ার প্রকোপে সেই শঙ্খ থেকে 'মহানাদ' উত্থিত হয়। সেই থেকে স্থানটি মহানাদ নামে পরিচিত হয়।

কারও কারও মতে গুপ্তযুগে এই স্থানটি একটি সুপ্রসিদ্ধ বৃহৎ জনপদ ছিল এবং প্রাচীন রাঢ়ীয় সভ্যতার কেন্দ্রভূমি হিসেবে এখান থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ও সভ্যতার 'ধ্বনি' সমুত্থিত হত বলে স্থাননাম 'মহানাদ' হয়েছে। একদা এখানে প্রাচীন নাথ যোগীদের নাথ-সাধনার কেন্দ্র ছিল বলে জানা যায় এবং অনেকে মনে করেন নাথ যোগীদের নাথতত্ত্ব থেকেই এই স্থানের নাম মহানাদ হয়েছে।

জাহাঙ্গীরের সময়ে পাটনার জগমোহন পণ্ডিত রচিত 'দেশাবলি বিবৃতি'-তে এই স্থানটি 'মানাত' নামে উল্লিখিত হয়েছে। সেই সময় সম্ভবত লোকের মুখে 'মহানাদ' 'মানাদ' নামে উচ্চারিত হত এবং 'মানাদ'-কেই 'দেশাবলি বিবৃতি'-তে 'মানাত' নামে উল্লেখ করা হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে।

প্রচলিত ছড়া:

মানদের (মহানাদের) জাত।
কে দেয় কার পোঁদে হাত ॥

মহালভিরাম: দার্জিলিং

মূল লেপচা থেকে উদ্ভূত নাম, অর্থ শৈলশিরা, যেখান থেকে মহালডি নদী উৎপত্তি হয়ে হঠাৎ তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়ে সমতলে প্রবেশ করে। মহালডি নদী বাংলায় মহানদী নামে পরিচিত।

মহিষাদল: পূ মেদিনীপুর

মহিষাদল নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানারকম মত আছে। কেউ বলেন এক সময় রূপনারায়ণ নদীর অধুনালুপ্ত দুটি প্রশস্ত শাখার মধ্যবর্তী ভূখণ্ড মহিষ সদৃশ দ্বীপের আকারের ছিল বলে স্থানের নাম মহিষাদল হয়েছে। অন্য মতে, অতীতে এখানে বন্য মহিষ ইত্যাদি পশু প্রচুর পরিমাণে দেখা যেত বলে মহিষাদল নাম হয়েছে। আরও এক মতে, আদিতে এই স্থানে মাহিষ্য জাতির

বসবাস ছিল বলে স্থানের নাম মহিষাদল হয়েছে। প্রাচীনকালে 'মহিষ' নামক জাতি সমুদ্রোপকূলে প্রত্যন্ত দেশে বাস করত বলে জানা যায়। কথিত আছে তাদের পূর্বপুরুষগণ মহারাজ সগরের অভিশাপে ব্রতভ্রষ্ট হয়ে রাজ্য থেকে অপসারিত হয়।

বিশ্বকোষে 'মহিষ্য' শব্দে দেখা যায় শ্মশ্রুধারী ম্লেচ্ছ জাতিবিশেষ। হয়তো তাদের বংশধরগণ এদেশে প্রথম বাস করায় 'মহিষদল' বা 'মহিষাদল' স্থান নামকরণ হয়ে থাকবে। স্থানটি মহিষাদল রাজবংশের সুরম্য রাজবাড়ি এবং রাজাদের নির্মিত একটি সতেরো চূড়ার বৃহৎ রথ ও গোপালজিউর নবরত্ন মন্দিরের জন্য খ্যাত। শোনা যায় মহিষাদলের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বর্তমানে উত্তরপ্রদেশ নিবাসী সামবেদীয় ব্রাহ্মণ জনার্দন উপাধ্যায় ব্যাবসা উপলক্ষে মেদিনীপুরে আসেন এবং তৎকালীন ভূস্বামী রাজা কল্যাণ রায় চৌধুরী রাজস্ব অনাদায়ে ধনাঢ্য জনার্দন উপাধ্যায়কে জামিন রেখে অব্যাহতি পান এবং শেষে তাঁর কাছেই জমিদারি হস্তান্তর করতে বাধ্য হন।

প্রচলিত ছড়া:

কিছু ভাল, কিছু খল
দুয়ে মিলে মহিষাদল ॥

মহীপালদিঘি: দ দিনাজপুর।
মহীপাল নামক এক রাজার দ্বারা খনন করা দিঘি থেকে স্থাননাম।

মহুদা: পুরুলিয়া
প্রচলিত ছড়া:

সুরগুমার ঘাট।
মহুদার ফাট
ঝালদার হাট ॥

মাঘপালা: কুচবিহার
শোনা যায় একসময় এখানে সাড়ম্বরে মাঘোৎসব পালন করা হত। এই উপলক্ষে সারা মাঘ মাস ধরে নাচগানের পালা চলত। সেই থেকে স্থাননাম মাঘপালা হয়েছে বলে অনুমিত।

মাজিগ্রাম: বর্ধমান

গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে স্থানীয় লোকেরা 'মা-জী' নামে অভিহিত করত বলে স্থাননাম মাজিগ্রাম হয়েছে বলে অনেকে অনুমান করেন। অন্য মতে, এখানে মাঝিদের গ্রাম ছিল বলে স্থাননাম মাঝিগ্রাম হয়েছে। এখানে মাঝিদের বসতি গড়ে ওঠার পেছনে একটি বিচিত্র কাহিনি প্রচলিত আছে। একবার চাঁদ সওদাগর তাঁর সপ্তডিঙা বাণিজ্যপোত নিয়ে অজয় নদের ওপর দিয়ে যাত্রাকালে এক সকালে 'ভ্রমরদহ' ঘাটে নোঙর ফেলেন। রান্নাবান্নার জন্য সওদাগরের মাঝিরা ঘাটের ধারে ব্যবস্থা করার সময় এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখে চাঁদ সওদাগর নিজে এবং মাঝিরা হতভম্ব হয়ে যান। বিরাট আকারের এক ইঁদুর কোথা থেকে এক বিড়াল মুখে করে ধরে এনে সওদাগর আর তাঁর লোকদের দিকে চেয়ে যেন মিটমিট করে কিছু বলতে চায়। তারপর ইঁদুরটি বিড়াল মুখে নিয়ে গুটিগুটি জঙ্গলের দিকে এগুতে থাকে। কৌতূহলী চাঁদ সওদাগর এবং তাঁর কিছু মাঝি ইঁদুরের পেছন পেছন যেতে থাকেন। জঙ্গল ক্রমে গভীর হয়ে আসে এবং এক সময় হঠাৎ সামনে জঙ্গলাবৃত একটি শিব মন্দির দেখা যায়। চাঁদ সওদাগর স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে শিবের জয়ধ্বনি করে ওঠেন এবং তখনই দৈববাণী হয়, 'ইহা দেউলেশ্বর শিবের মন্দির, তুমি ইহা পরিষ্কার করাইয়া পূজার ব্যবস্থা করো।' দৈববাণী অনুসারে চাঁদ সওদাগর মন্দিরটির সংকার করে নিত্যপূজার ব্যবস্থা করেন এবং তাঁর কিছু মাঝিসঙ্গীদের এখানে বসবাসের ব্যবস্থা করে দেন। সেই থেকে স্থাননাম 'মাঝিগ্রাম' হয়, যা পরে অপভ্রংশে 'মাজিগ্রাম' হয়েছে।

মাঝদিয়া: নদিয়া

তিনদিকে নদীবেষ্টিত স্থান হিসেবে স্থানটি একসময় 'মধ্যদ্বীপ' নাম পরিচিত ছিল। পরে অপভ্রংশে মাঝদিয়া হয়েছে। নীল চাষের জন্য নীলকর সাহেবরা এখানে কুঠি নির্মাণ করায় স্থানটি একদা মাঝদিয়া-কুঠিপাড়া নামেও পরিচিত ছিল।

মাটিকুমড়া: নদিয়া

প্রচলিত ছড়া:

বাঁশ, বাজানে, ঘটকেরা,
এ তিন নিয়ে মাটিকোমড়া ॥

মাটিঘরা: দার্জিলিং

মূল নেপালি থেকে উদ্ভূত নাম। পাহাড়ি এলাকায় সাধারণত কাঠ বা পাথরের তৈরি ঘরবাড়ি হয়। এখানে স্থানীয় পাহাড়ের তলদেশে অনেক মাটির ঘর দেখা যায়। সেই কারণে স্থানের নাম মাটিঘরা হয়েছে বলে অনুমিত।

মাটিয়ারি: নদিয়া

প্রচলিত ছড়া:

মেট্টেরির রুদ্রনাথ
ডাকাতগাড়ির বিশ্বনাথ ৷৷

(রুদ্রনাথ, নদিয়ারাজ রাঘবরায় প্রতিষ্ঠিত শিব মন্দির।

বিশ্বনাথ, সমসাময়িক লেখায় ডাকাতরূপে পরিচিত নীল বিদ্রোহের সংগ্রামী কৃষক নেতা।)

মাদারাল: উ চব্বিশ পরগনা

পূর্বনাম 'মাদারাইল' অপভ্রংশে মাদারাল হয়েছে। কথিত আছে, ভারতের পশ্চিমাঞ্চল থেকে মাদার আলি নামে জনৈক পীর এখানে এসে বাস করতেন বলে, স্থাননাম মাদারাইল বা মাদারাল হয়েছে।

মাদানগর: বর্ধমান

প্রচলিত ছড়া:

মোড়াল, মুগরো, জগৎপুর
বানের জলে ভাসে।
সোনার মাদানগর
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসে ৷৷

মাধবপুর: নদিয়া

নদিয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের তৃতীয় পুত্র ভৈরবচন্দ্রের পুত্র মাধবচন্দ্রের নামানুসারে স্থাননাম।

প্রচলিত ছড়া:

বিশুর পুকুর ডুবুডুবু
মাধবপুর ভাসে

বাঁশচাতর গেল গেল
বেলডাঙ্গা হাসে ॥

মানকর: বর্ধমান
মান+কর। মান শব্দের অর্থ মানিবার উপকরণ অথবা সম্মান অথবা অব্যক্ত ক্রোধ বোঝায়। আবার এক প্রকার কন্দ বিশেষও বোঝায়। স্থাননামে প্রযোজ্য অর্থ পরিষ্কার নয়। সুকুমার সেন প্রশ্ন তুলেছেন, 'যেখানে মানের খাতিরে কিছু খাজনা নেওয়া হয়?' স্থানটি এক সময় 'কদম', বেনারসি চেলি ও তসরের জন্য খ্যাত ছিল। অনেকের মতে নব্য-ন্যায়ের প্রবর্তক পণ্ডিত রঘুনাথ শিরোমণি মানকরে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রচলিত ছড়া:

পাল, ভট্‌চাজ, খাঁ।
তিন নিয়ে মানকর গাঁ ॥
* * *
মানাই যার রাজার কর।
সেই গ্রাম মানকর ॥

মানসিংহপুর: হাওড়া
শোনা যায়, আকবরের সেনাপতি মানসিংহ এই স্থানে কিছুদিন বিদ্রোহ দমনের জন্য ছাউনি ফেলে বাস করেছিলেন বলে স্থাননাম মানসিংহপুর হয়।

মানুষমারি: প মেদিনীপুর
সম্ভবত মানুষ মারার কোনও কিংবদন্তির সঙ্গে জড়িত স্থাননাম।

মামজোয়ান: নদিয়া
সংস্কৃত শব্দ 'মাম' অর্থে 'আমাকে' অথবা 'আমি' এবং জোয়ান অর্থে বীর বা শক্তিশালী পুরুষ। একসময় এখানে বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী লোকেদের বসবাস হেতু স্থাননাম মামজোয়ান হয়েছে বলে অনুমিত।

মালদহ: মালদহ
রামায়ণে মলদ ও করুষ নামে দুটি স্থানের নাম পাওয়া যায়। কথিত আছে,

তাড়কা রাক্ষসীর উৎপাতে এই স্থানদুটি মনুষ্যশূন্য হয়ে যায়। পৌরাণিক ভূগোলেও মলদা বা মালদ রাজ্যের নাম পাওয়া যায়। মালদহের সঙ্গে মলদরাজ্যের কোনও সম্বন্ধ আছে কি না তা সঠিক জানা যায়নি। মহাভারতে কৌশিকী নদীর পর নন্দা ও অপরনন্দা নামে দুইটি নদীর উল্লেখ আছে। মহানন্দা তাদেরই অন্যতম বলে অনুমিত। পৌরাণিক বা পুরাতন মালদহ, মহানন্দা ও কালিন্দী নদীর মিলনস্থানে অবস্থিত ছিল। বর্তমান মালদহ যা ইংরেজবাজার নামেও পরিচিত, গৌড় ও পাণ্ডুয়ার ধ্বংসাবশেষ থেকে সংগৃহীত ইট দিয়ে নির্মিত হয়েছে বলে জানা যায়। ধনবত্তার জন্য সম্ভবত এই স্থানের নাম মালদহ হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। একসময় স্থানটি রেশম ও রেশম রং করার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। মালদহের তৈরি রেশমি বস্ত্র দেশে-বিদেশে রপ্তানি হত বলে জানা যায়। অনেকে অনুমান করেন সেই কারণেই সম্ভবত এক সময় এই স্থানটি রংরেজবাজার নামে অভিহিত হয়।

১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে পুরাতন মালদহের কাছে ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানি তাদের কুঠি স্থাপন করে এবং মুসলমান প্রভাব কমে এলে ইংরেজ রাজকর্মচারীরা এখানে বসবাস করতে আরম্ভ করে। সেই সময় থেকে রংরেজবাজার ইঙ্গলেজবাজার বা ইংরেজবাজারে রূপান্তরিত হয় বলে অনেকে অনুমান করেন। স্থানের নাম রংরেজবাজার থেকে ইংরেজবাজার অথবা ইংরেজদের বসবাসের জন্য ইংরেজবাজার হয় কি না সে-কথা সঠিক বলা যায় না। মুসলমান প্রভাবের আগে মালদহ শাক্তপ্রধান স্থান ছিল। চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র গোস্বামীর মালদহে আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চলের অনেকেই বৈষ্ণব মত অবলম্বন করেন।

মালদহের 'গম্ভীরা' নামক লোকসংগীত ও উৎসব বাংলার জনসমাজে বিশেষ সমাদৃত। শোনা যায় দিনাজপুর অঞ্চলের শিবভক্ত বাণরাজা এই উৎসব প্রচলন করেন। মালদহের আম বাংলার জান।

প্রচলিত ছড়া:

আম, রেশম, ধান,
তিনে মালদার জান।

* * *

কৃষ্ণনগরের ময়দা ভাল,
মালদহের ভাল আম।

উলোর ভাল বাঁদর-পুরুষ,
মুর্শিদাবাদের জাম ॥

মালিয়ান্দি: মুর্শিদাবাদ

এখানে একটি প্রাচীন তমাল গাছের তলায় বাঁধানো বেদির ওপর গ্রামদেবীর প্রতীক স্বরূপ একটি শিলাখণ্ড আছে। শিলাখণ্ডটি আকৃতিতে হাঁটুর উপর অংশের মতো দেখতে। চলতি ভাষায় শরীরের ওই অংশকে মালুয়াচাকি বলে। সেই কারণে দেবীর নাম হয়েছে মলয়চণ্ডী এবং স্থাননাম মলয়চণ্ডীর অপভ্রংশে মালিয়ান্দি হয়েছে বলে অনুমিত।

মালিহাটী: মুর্শিদাবাদ

প্রায় চারশো বছর আগে এই জনপদ পাঠান সুলতান দাউদ খাঁর এক বিশিষ্ট রাজকর্মচারী পরমানন্দ চৌধুরী পত্তন করেছিলেন বলে জানা যায়। পরমানন্দ চৌধুরীর সঙ্গে ফতেসিং নামে এক 'হাড্ডিল' বা 'হাড়ি' রাজার বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল এবং এই 'হাড়ি' রাজার অনুকম্পায় পরমানন্দ প্রচুর ভূসম্পত্তির অধিকারী হন। সেই সব সম্পত্তির ওপরই তিনি এই জনপদ গড়ে তোলেন এবং হিতৈষী ফতেসিংহের স্মৃতিতে স্থাননাম দেন মালিহাটী। 'হাড্ডিল' বা 'হাঁড়ি' জাতি স্থানবিশেষে ভুঁইমালী বলে পরিচিত। সেই সূত্রে সম্ভবত 'মালী' শব্দের সঙ্গে হাট্টি বা হাটি অর্থাৎ 'হাট' শব্দ যোগ করে স্থানের নাম মালিহাটী রাখা হয়েছিল।

মায়াপুর: নদিয়া

পূর্ব নাম মিঞাপুর, অপভ্রংশে মায়াপুর হয়েছে। (নবদ্বীপ দেখুন)

মাহেশ: হুগলি

স্থাননামের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোনও গল্পগাথা জানা যায় না, কিন্তু কাশীরাম দাসের মহাভারতে এই স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়। স্থানটি জগন্নাথদেবের রথযাত্রার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ। এখানে জগন্নাথদেবের আবির্ভাব সম্বন্ধে একটি কাহিনি প্রচলিত আছে।

কিংবদন্তি আছে বৈষ্ণব ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী জগন্নাথ দর্শনের জন্য শ্রীক্ষেত্র যান। সেখানে জগন্নাথদেব স্বপ্নাদেশে তাঁকে স্বদেশে ফিরে যেতে বলেন এবং

আরও জানান যে তিনি শীঘ্রই মাহেশে জগন্নাথদেবের দর্শন পাবেন। স্বপ্নাদেশ অনুসারে ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী মাহেশে ফিরে আসেন এবং ভাগীরথী তীরে জগন্নাথদেবের বিগ্রহ কুড়িয়ে পান। ধ্রুবানন্দ সেই বিগ্রহটি একটি মন্দির তৈরি করে প্রতিষ্ঠা করে জগন্নাথদেবের নিত্যপূজার ব্যবস্থা করেন। কালক্রমে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায় এবং সরকারি ও বিশিষ্ট জমিদার ও ব্যক্তিগণের পৃষ্ঠপোষকতায় মাহেশের জগন্নাথ মন্দির ও রথযাত্রা বাংলার ধর্মীয় কাঠামোয় এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। একমাত্র পুরী ছাড়া এত বড় রথের মেলা আর কোথাও দেখা যায় না। কথিত আছে, শ্রীচৈতন্য খড়দহে রাঘব পণ্ডিতের গৃহে যাওয়ার পথে মাহেশ আসেন।

প্রচলিত ছড়া :

খিচুড়ি, অন্ন, পায়েস।
এ তিনে মাহেশ ॥

মিনচু: দার্জিলিং

মূল তিব্বতি থেকে উদ্ভূত নাম, অর্থ— প্রাকৃতিক খনিজ জলের ঝরনা।

মিরিক: দার্জিলিং

মূল লেপচা থেকে উদ্ভূত নাম, অর্থ— আগুনে জ্বলা পাহাড়। লেপচা 'মি' এবং 'রিক' শব্দের অর্থ জ্বলন্ত-জঙ্গল।

মীরহাট: বর্ধমান

প্রচলিত ছড়া:

গাঁজা, গুলি, মদেচুর,
মীরহাট, বাদ্যিপুর ॥

* * *

তিসির ধুলো, চট, পাট।
এ তিন নিয়ে মীরহাট ॥

* * *

ওমরপুরের মাটি।
মীরহাট, বাদ্যিপুরের বেটি ॥

মুইতিন: বীরভূম

কথিত আছে, বর্গিদের ভয়ে কয়েকটি পরিবার নিজেদের গ্রাম ত্যাগ করে এক জনহীন স্থানে এসে অস্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করে। পরে বর্গির হাঙ্গামা মিটে গেলে তিনটি পরিবার ছাড়া অন্যরা নিজেদের গ্রামে ফিরে যায়। ক্রমে থেকে যাওয়া তিনটি পরিবার থেকে বসতি গড়ে ওঠে এবং স্থানের নাম হয় 'মুইতিন' বা আমরা তিন।

মুগড়ো: বর্ধমান

প্রচলিত ছড়া:

মোড়ল, মুগড়ো, জগৎপুর
বানের জলে ভাসে।
সোনার মাদানগর
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসে ॥

মুড়াগাছা: নদিয়া

পূর্বনাম রাঘবপুর। কথিত আছে, আনুমানিক ১১০০ বঙ্গাব্দে রাঘবরামদেব বিশ্বাস নামে জনৈক তহশিলদার কাছারিবাড়ি তৈরি করে এই স্থানে বসবাস আরম্ভ করেন। ক্রমে বসতি গড়ে উঠলে তহশিলদারের নামানুসারে স্থাননাম রাঘবপুর হয়।

কিংবদন্তি অনুসারে একবার এক বড় রকমের অগ্নিকাণ্ডে এখানকার অধিকাংশ বাড়িঘর ও গাছপালা পুড়ে যায়। এই ঘটনার কিছুদিন পরে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র গোপাল ভাঁড়কে সঙ্গে নিয়ে গুড়গুড়িয়া নদীপথে তাঁর গুরুবাড়ি যাচ্ছিলেন। এই গ্রামের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় মহারাজ গোপালকে গ্রামের নাম জিজ্ঞাসা করায় গোপাল ভাঁড় অগ্নিদগ্ধ গ্রামের অবস্থা থেকে তার স্বভাবসিদ্ধ রসিকতার সঙ্গে উত্তর দেয় 'মহারাজ গ্রামের নাম মুড়াগাছা।' তখন থেকে সরকারি নথিপত্রে এই গ্রামের নাম মুড়াগাছা নামে উল্লিখিত হয়। মুড়াগাছা নামে নদিয়া জেলায় পাঁচটি স্থান আছে।

প্রচলিত ছড়া:

বালি, দ্বিগঙ্গা আর মুড়াগাছা
আর যত সব কাদাখোঁচা ॥

* * *

তাল, বাবলা, ছুঁচো, বোঁচা।
এই চার নিয়ে মুড়াগাছা ॥

* * *

মুচি, মুখুজ্জ্যে, কায়েত, বোঁচা।
এ চার নিয়ে মুড়াগাছা ॥

মুরগুমা: পুরুলিয়া

প্রচলিত ছড়া:

মুরগুমার ঘাট।
মহুদার ফাট।
ঝালদার হাট ॥

মুরারাই: বীরভূম

রাজা উদয়নারায়ণের সঙ্গে রাজস্ব নিয়ে মুর্শিদকুলী খাঁর বিবাদ হলে নিকটস্থ বীরকিটির গড়ের প্রান্তরে উভয়পক্ষের ঘোর যুদ্ধ হয়। যেখানে যুদ্ধ হয়েছিল তা 'মুণ্ডমালা' বা 'মুড়মুড়ের ডাঙ্গা' নামে পরিচিত হয়। সম্ভবত 'মুড়মুড়ের ডাঙা' থেকে অপভ্রংশে স্থাননাম মুরারাই হয়েছে। সুকুমার সেন জানিয়েছেন মুণ্ডিতক + রোহিত (গাছ)।

প্রচলিত ছড়া:

পাট, পুনকা, পালং, পুঁই।
পুঁটি, মাগুর, ট্যাংরা, কই,
তবে জানবি মুরারাই ॥
(পুনকা— শাক বিশেষ)

* * *

গুড়, মুড়ি, চিঁড়া দই,
এ চার নিয়ে মুরারাই ॥

* * *

খরাতে কাঠফাটা,
বর্ষায় থই থই।

শীতকালে লেপের তলা
তবে জানবি মুরারাই ॥

মুলুক: বীরভূম

শোনা যায়, অতীতকালে এই স্থানের নাম ছিল মল্লিকপুর। পরে একসময়ে 'ভাতুরা' নাম হয় এবং শেষে 'মুলুক' নামে পরিচিত হয়। এই নাম বিবর্তনের পেছনে একটি কাহিনি প্রচলিত আছে। রামকানাই ঠাকুর নামে জনৈক ভক্ত বৈষ্ণব বৃন্দাবনের পথে এই স্থানে এসে বহু গোরুর পাল এবং রাখাল বালকদের সমাবেশ দেখে এবং রাখালদের বাঁশির মধুর ধ্বনি শুনে ভাবাবেগে গেয়ে ওঠেন—

যেথায় গোরুর পাল আর রাখাল গণ।
মধুর মধুর বংশী বাজে সেই তো বৃন্দাবন ॥

স্থানটিকে বৃন্দাবনতুল্য মনে করে রামকানাই ঠাকুর এখানেই রাধা-কৃষ্ণের যুগল মূর্তিসহ মন্দির প্রতিষ্ঠা করে নিত্য সেবাপূজা এবং অন্নভোগের ব্যবস্থা করেন। স্থানীয় গোপগণ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে এবং ক্রমে তাঁর সাধন ভজন ও নানা অলৌকিক গুণের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। একবার তদানীন্তন বাংলার নবাব জুম্মা খাঁ রামকানাই-এর অলৌকিক ক্ষমতা পরীক্ষা করার জন্য হঠাৎই তিনশো লোক নিয়ে রামকানাই-এর আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। সেই সময় রামকানাই এক গামলা ভাত নিয়ে নিকটে জঙ্গলে তাঁর ভক্তদের মধ্যে পরিবেশন করছিলেন। কোনও রকম দ্বিধা না করে ঠাকুর নবাবের তিনশো সহচরকে অন্নগ্রহণ করার জন্য সাদর আহ্বান জানিয়ে সেই একই গামলা থেকে সকলকে ভাত পরিবেশন করলেন, অথচ গামলায় যত ভাত ছিল তেমনই রয়ে গেল। এই ঘটনায় নবাব বিস্মিত হয়ে করজোড়ে ঠাকুরের কাছে ক্ষমা চেয়ে দেবসেবার জন্য কিছু নিষ্কর ভূসম্পত্তি জায়গির দেবার প্রস্তাব রাখেন। নিষ্কর জমি দান নেওয়ার পরিবর্তে ঠাকুর নামমাত্র খাজনায় কিছু জমি নবাবের কাছ থেকে গ্রহণ করতে রাজি হন। কথিত আছে, রামকানাই তার পাত্র থেকে এক মুঠো ভাত চারিদিকে ছড়িয়ে দেন এবং সেই ভাত যতদুর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে ততদুর পর্যন্ত জমি তিনি নবাবের কাছ থেকে গ্রহণ করেন। ভাত ছড়িয়ে পাওয়া জমির সীমানা 'ভাতুরা' নামে আখ্যায়িত

হয়। নবাবের বদান্যতায় প্রীত হয়ে ঠাকুর নবাবকে আশীর্বাদ করে 'মুলুক খাঁ' উপাধি দান করেন। নবাবও সেই উপাধি সাদরে গ্রহণ করেন এবং তাঁর নতুন উপাধি অনুসারে এই পবিত্রধামের নাম 'মুলুক' রাখার জন্য ঠাকুরকে অনুরোধ করেন। সেই থেকে এই স্থানের নাম মুলুক হয়েছে বলে জানা যায়।

অন্য এক মতে জুম্মা খাঁর সেনাপতি মুলুক খাঁর নামানুসারে স্থাননাম মুলুক হয়।

প্রচলিত ছড়া:

মুলুকের অপরাজিতা
মঙ্গলডিহির রাস
ভুরকুণ্ডার ডেঙ্গো ঠাকুর
শুনতে উপহাস ॥

মুর্শিদাবাদ: মুর্শিদাবাদ

মুর্শিদাবাদ নাম সম্বন্ধে নানা প্রকার তথ্য পাওয়া যায়। পুরনো নথিপত্রে এই স্থানকে মুখসুদাবাদ অথবা মুখসুসাবাদ নামে উল্লেখ করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এখানে মুখসূদন দাস (মধুসূদন দাস) নামে এক বৈষ্ণবের আখড়া ছিল। তিনি প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করেছিলেন এবং সেই অর্থে এই জনপদ পত্তন করেছিলেন বলে তাঁর নামানুসারে স্থাননাম হয় মুখসুদাবাদ। অন্য মতে মুখসূদন দাস নামে একজন নানকপন্থী সন্ন্যাসী গৌরেশ্বর হুসেন শাহ-র অসুখ সারিয়ে দিলে দরবার থেকে এই স্থানে বহু ভূসম্পত্তি পান এবং ক্রমে এখানে জনবসতি গড়ে উঠলে স্থানের নাম হয় মুখসুদাবাদ।

টিফেন্‌থেলারের (Tiffenthaler) মতে স্থানটি আকবরের সময়ে পত্তন হয়েছিল। কিন্তু এই তথ্যের কোনও প্রামাণিক সূত্র পাওয়া যায় না। মুঘল আমলের নথিপত্রে এবং রিয়াজ-উস্-সালাতিনে মক্‌সুসাবাদ নামে এই স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়। রিয়াজ-উস্-সালাতিনের মতে আকবরের সময়ে তদানীন্তন সুবা-বাংলার শাসনকর্তা সৈয়দ খানের ভ্রাতা মক্‌সুখ খান (কারও মতে মক্‌সুখ আলি) ব্যাবসা-বাণিজ্যের সুবিধের জন্য এই স্থানে একটি 'সরাই' পত্তন করেন এবং কালক্রমে জনবসতি গড়ে উঠলে স্থানটি মক্‌সুস খানের নামানুসারে মক্‌সুসাবাদ নামে পরিচিত হয়। ভবিষ্য পুরাণের ব্রহ্মাণ্ড খণ্ডে পাওয়া যায় যে 'মোরসুদাবাদ' নামে একটি স্থান এক যবন দ্বারা

পত্তন হয়েছিল। সৈর-উল-মুতাখরিনও এই স্থানটিকে মক্‌সুদাবাদ নামে উল্লেখ করে।

১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে অওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে টাভার্নিয়র যখন এসেছিলেন এই স্থানটিকে একটি বাণিজ্যপ্রধান স্থান বলে বর্ণনা করে 'মদেসুবাজারকী' (Madesoubazarki) নামে উল্লেখ করেছেন। ১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত অওরঙ্গজেবের একটি মুদ্রা থেকে জানা যায় যে সে সময়ে মুখসুদাবাদে একটা টাঁকশাল ছিল! ঐতিহাসিকদের মতে ১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দে শোভা সিং ও রহিম খাঁর বিদ্রোহের সময় মুকসুদাবাদ লুণ্ঠিত হয়েছিল। এর পরে ১৭১৩ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদকুলী খাঁ বাংলার নবাবি পদ লাভ করলে তাঁর নামানুসারে স্থানটি মুর্শিদাবাদ নামে পরিচিত হয়।

মুর্শিদকুলী খাঁর জীবনবৃত্তান্ত ও তাঁর বাংলার নবাব হওয়ার কাহিনি অতীব রোমাঞ্চকর। কথিত আছে, মুর্শিদকুলী আদিতে ব্রাহ্মণবংশে জন্মেছিলেন। তাঁর দরিদ্র পিতা শৈশবে তাঁকে এক ইরানি বণিকের কাছে বিক্রি করে দেয়। বণিক সেই বালককে নিজের ছেলের মতো লালনপালন ও শিক্ষা দেন। মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর তাঁর নাম হয় মহম্মদ হাদী। বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে তিনি ভারতে ফিরে দাক্ষিণাত্যে আসেন এবং বেরার প্রদেশের দেওয়ানের অধীনে একটি সামান্য কাজ নেন। অল্পদিনের মধ্যেই কর্মকুশলতার জন্য তাঁর দ্রুত পদোন্নতি হয় এবং অওরঙ্গজেব তাঁকে হায়দ্রাবাদের দেওয়ানি পদে নিযুক্ত করেন। তারপর তিনি বাংলার দেওয়ানি এবং 'করতলব খাঁ' উপাধি পেয়ে ঢাকায় আসেন। সেই সময় বাংলার রাজধানী ছিল জাহাঙ্গীর নগর বা ঢাকা এবং অওরঙ্গজেবের পুত্র (কারো মতে পৌত্র) আজিম-উস্‌-শান বাংলার সুবাদার বা নবাব নাজিম ছিলেন। ঢাকায় অবস্থানকালেই কর্মনৈপুণ্যের জন্য বাদশাহের কাছ থেকে তিনি 'মুর্শিদকুলী-মতিমন্‌-উল-মুল্ক আলাউদ্দৌলা জাফর খাঁ নাসিরী নাসির জঙ্গ' উপাধি লাভ করেন এবং তখন থেকেই তিনি মুর্শিদকুলী খাঁ নামে পরিচিত হন। অল্পদিনের মধ্যেই মুর্শিদকুলী খাঁর সঙ্গে নবাব নাজিম আজিম-উস্‌-শানের মনোমালিন্য উপস্থিত হয় এবং দেওয়ান মুর্শিদকুলী তাঁর রাজস্ব বিভাগের সমস্ত কর্মচারী সহ ১৭০৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত মুকসুদাবাদে তাঁর দপ্তর ও কর্মস্থল স্থানান্তরিত করেন। তাঁর সঙ্গে দর্পনারায়ণ কানুনগো এবং জগৎশেঠদের পূর্বপুরুষ মানিকচাঁদ এসেছিলেন। অওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর যখন মুঘল সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ার উপক্রম হয় তখন মুর্শিদকুলী

নিজের প্রভুত্ব বিস্তার করতে সক্ষম হন এবং ১৭১৩ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট ফারুখশিয়রের সময় বাংলার নবাব হন। তখন থেকে মুখসুদাবাদ মুর্শিদাবাদ নামে বাংলার রাজধানী রূপে পরিচিত হয়। যদিও, ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সমস্ত ইংরেজি নথিপত্রে এবং লেখকদের বিবরণীতে স্থানটি মুখসুদাবাদ নামেই উল্লিখিত আছে। পলাশীর যুদ্ধ, বাংলার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতন ও মৃত্যু এবং বাংলা-তথা ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্যের গোড়া-পত্তনের কাহিনি মুর্শিদাবাদের ঘটনাবহুল ইতিহাসে একটি বিয়োগান্তক এবং রোমাঞ্চকর অধ্যায়।

প্রচলিত ছড়া:

হাঁস, বাঁশ, নেড়ে।
মুর্শিদাবাদ জুড়ে ॥

* * *

রেশম, কাঁথা, হাতির দাঁত।
এ তিন নিয়ে মুর্শিদাবাদ ॥

* * *

ঠক, বদমাশ, হারামজাদ।
তিন নিয়ে মুর্শিদাবাদ ॥

* * *

চোর, চোট্টা, হারামজাদ
এ তিন নিয়ে মুর্শিদাবাদ ॥

* * *

কৃষ্ণনগরের ময়রা ভাল,
মালদহের ভাল আম।
উলোর ভাল বাঁদর পুরুষ,
মুর্শিদাবাদের জাম ॥

মৃত্যুঞ্জয়নগর: দ চব্বিশ পরগনা

প্রায় শতাধিক বছর আগে রাখালরাজ গায়েন নামে এক ব্যক্তি সরকারের কাছ থেকে ‘বন্দোবস্ত’ নিয়ে এই স্থানের বন-জঙ্গল কেটে গ্রাম পত্তন করেন। তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মৃত্যুঞ্জয়ের নামে গ্রামের নাম মৃত্যুঞ্জয়নগর রাখেন।

মেখলিগঞ্জ: কুচবিহার

মেখলি অর্থে একপ্রকার সূক্ষ্ম নানা রঙের কারুকার্য করা চট। এক সময় এই স্থানটি এই প্রকার মেখলার জন্য খ্যাত ছিল বলে স্থাননাম মেখলিগঞ্জ।

মেট্যালা: বাঁকুড়া

পূর্বনাম মতিয়ালা। অপভ্রংশে মেট্যালা হয়েছে বলে অনেকে অনুমান করেন। এক মতে এই স্থানে মাটি এঁটেল যুক্ত ছিল বলে স্থানের নাম হয় এঁ্যাটেলী, যা পরে অপভ্রংশে মেট্যালী বা মেট্যালা হয়েছে।

প্রচলিত এক কাহিনি থেকে জানা যায় এখানকার পূর্বতন জমিদার তিলকচন্দ্র সিংহরায় বিষ্ণুপুর মহারাজের সৈন্যবিভাগে যোগদান করে বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিলে মহারাজ বর্গিদের আক্রমণ থেকে তাঁর রাজ্যের পশ্চিম সীমান্ত সুরক্ষিত করার জন্য তিলকচন্দ্রকে এই স্থানে বসতি স্থাপনের অনুমতি দেন। কিছুকালের মধ্যে তিলকচন্দ্র এই অঞ্চলের জমিদাররূপে মান্য হন। স্থানীয় বাসিন্দারা এই জমিদারকে মাটিওয়ালা বলে সম্বোধন করতেন। অর্থাৎ যিনি মাটি বা ভূসম্পত্তির মালিক তিনিই মাটিওয়ালা। পরবর্তীকালে মাটিওয়ালা থেকে মাট্যিয়ালা এবং অপভ্রংশে 'মেট্যালা'য় পরিণত হয়।

মেদিনীপুর: প মেদিনীপুর

মেদিনীপুর নামকরণ সম্পর্কে নানান মত প্রচলিত। খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকের ওড়িশার গঙ্গাবংশের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, এই রাজবংশের অনন্ত বর্মন চোড়ঙ্গদেবের রাজ্য দক্ষিণে গোদাবরী, উত্তরে মিধুনপুর, পূর্বে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে পূর্বঘাট পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পণ্ডিতজন মনে করেন যে 'মিধুনপুর'ই বর্তমান মেদিনীপুর। অন্য এক মতে খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতকের মধ্যে এদেশে প্রাণকর নামে এক স্বাধীন হিন্দুরাজার পুত্র মেদিনীকর এই নগরীর পত্তন করায় কালক্রমে স্থানের নাম হয় মেদিনীপুর। অনেকে মনে করেন দ্বাদশ শতকের দাক্ষিণাত্যের চেরপাদ রাজ্যের চেরো সম্রাটের নাম ছিল মেদিনী রায়। তাঁর রাজ্যের পরিধি বর্তমান পশ্চিম মেদিনীপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং মেদিনী রায় থেকেই মেদিনীপুর নাম হয়েছে। সম্ভবত মেদিনী রায় এবং মেদিনীকর একই ব্যক্তি। 'মেদিনীকোষ' নামে একটি সংস্কৃত কোষগ্রন্থ মেদিনীকরের রচনা বলে জানা যায়।

আরও এক মতে মেঘমল্ল রায় নামে ওড়িশার এক পরাক্রমশালী রাজা ১৫২৪ খ্রিস্টাব্দে এখানকার বিস্তীর্ণ ভূভাগ দখল করে কাঁসাই নদীতীরবর্তী এলাকায় শাসন কায়েম করেছিলেন। তাঁর নাম থেকেই মেদিনীপুর নাম হয় বলে অনেকে মনে করেন, কিন্তু এই সূত্রের সঠিক ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। কথিত আছে, সম্রাট অওরঙ্গজেব জনৈক মৌলানা মুস্তাফা মদনীকে এই স্থানে একটি মসজিদ সম্পর্কিত মহল ও বহু লাখেরাজ সম্পত্তি দান করেন। এই মৌলানা মদনী সাহেবের নাম থেকে 'মদনীপুর' নাম হয়, যা পরে অপভ্রংশে মেদিনীপুর হয়। কিন্তু এই তথ্যের কোনও নির্ভরযোগ্য সূত্র পাওয়া যায় না কারণ, অওরঙ্গজেবের বহু পূর্বে খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতকে প্রণীত আইন-ই-আকবরিতে মেদিনীপুরের উল্লেখ আছে। প্রশাসনিক কারণে সেই সময় মেদিনীপুর অঞ্চল ওড়িশার মধ্যে ছিল।

প্রচলিত ছড়া:

'রে', 'বে', শালা।
তিনে মেদিনীপুর জেলা ॥

* * *

কুঁজড়া, কাওয়ারী, নুর।
তিনে মেদিনীপুর ॥

* * *

গোরু, গুরু, কৈবর্ত।
এ তিন মেদিনীপুরের শর্ত ॥

* * *

ধান যোগায় মেদিনীপুর,
কলা যোগায় হুগলি।
খেজুর, আখের গুড় যোগায়,
ডোবা যোগায় গুগ্‌লি ॥

মেমারি: বর্ধমান

পূর্বনাম মহতাবপুর। কোনও অজ্ঞাত কারণে ইংরেজ আমলে স্থানটি মেমারি নামে পরিচিত হয়। সুকুমার সেন লিখছেন, আরবি মামুরী, মানে, সম্বন্ধ কৃষিস্থান থেকে মেমারি উদ্ভূত হতে পারে। তিনি লিখছেন, "আবার 'অন্য ব্যুৎপত্তি সম্ভব। আরবী-ফারসী 'মমর্, মম্মর্' (যাত্রা বদলের স্থান)। ইংরেজ

আমলের গোড়ার দিকে এখানে ডাক বদল হত। যেহেতু গ্রামটি বড়ো নয় সেই হেতু এই ব্যুৎপত্তিই গ্রহণীয়।"

প্রচলিত ছড়া:

দাঙ্গা, হাঙ্গামা, মহামারী,
এ তিন নিয়ে মেমারি ॥

মোঘলমারী: প মেদিনীপুর

১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে এখানে বাংলা ও ওড়িশার আধিপত্য নিয়ে মুঘল ও পাঠানদের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে মুঘলরা জয়লাভ করলেও অনেক মুঘলসৈন্য মারা যায়। সেই জন্য স্থানটি মোঘলমারী নামে পরিচিত হয়। অন্য এক মতে কথাটা 'মোঘলমাড়ী'। 'মাড়ী' অর্থে 'পথ'। মুঘল-পাঠানের সংগ্রাম একটি 'পথ'-এর ওপর হয় এবং মুঘলসৈন্যরা বিজয়ী হলে স্থানটি আদিতে মুঘলদের পথসূচক নাম হয় 'মোঘলমাড়ী', যা পরে মোঘলমারী হয়। বর্ধমানেও মোঘলমারী নামে একটি জায়গা আছে।

মোবারকগঞ্জ: বর্ধমান

পূর্বনাম শুভ্ররাজপুর এবং পরে শুভরাজপুর হয়। শোনা যায় বাংলা ১২০১ সনে দামোদরের ভীষণ বন্যায় এই স্থানটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। পরে পুনর্বসতি কালে কোনও অজ্ঞাত কারণে স্থাননাম হয় মোবারকগঞ্জ।

মোহনপুর: বীরভূম

প্রচলিত ছড়া:

কলগাঁয়ের হেলে।
মোহনপুরের ছেলে ॥

যশড়া: নদিয়া

স্থানটি বৈষ্ণব জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাটরূপে খ্যাত। যশোহর, খুলনা প্রভৃতি অঞ্চলের শান্তিপ্রিয় লোকদের নিয়ে গঠিত এই জনপদটি পরবর্তীকালে জগদীশ পণ্ডিতের পবিত্র যশস্মৃতি বহন করে 'যশড়া' নামে পরিচিত হয়।

যাত্রাপুর: নদিয়া

যাত্রা অনুষ্ঠান থেকে স্থাননাম যাত্রাপুর। এই নামে নদিয়া জেলায় তিনটি স্থান আছে। কথিত আছে, এক সময় এই তিনটি জায়গাই বাংলার লোকায়ত যাত্রার জন্য খ্যাত ছিল।

রঘুনাথপুর: পুরুলিয়া

প্রচলিত ছড়া:

কুল, বড়ি, আখের গুড়।
তিন নিয়ে রঘুনাথপুর ॥

* * *

হ্যাদে, চিঁড়া, হদে গুড়।
তবে জানবি শহর বটে রঘুনাথপুর ॥

* * *

তসর, চিঁড়া, ভেলি গুড়।
তিন নিয়ে রঘুনাথপুর ॥

* * *

জেলে, কলু, নাপতের ক্ষুর।
এ তিন নিয়ে রঘুনাথপুর ॥

* * *

কামাতে পারে না নাপিত,
ধামাভরা ক্ষুর।
কামাতে কামাতে যায়।
রঘুনাথপুর ॥

পুরুলিয়া জেলায় রঘুনাথপুর নামে ছ'টি স্থান আছে।

রঙ্গারুন: দার্জিলিং

মূল লেপচা থেকে উদ্ভূত নাম। অর্থ যে স্থানে নদী বাঁক নিয়েছে। এ-সম্বন্ধে একটি স্থানীয় লোকগাথা প্রচলিত আছে। একবার রঙ্গীন নদী তার সঙ্গী তিস্তার সঙ্গে ঝগড়া করে আলাদা হয়ে যায় এবং রাগে ফেঁপে ফুঁসে তার জলধারা রঙ্গারুন পাহাড়ীর ওপর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। জলের উচ্ছ্বাসে পৃথিবী ডুবে

যাওয়ার উপক্রম হলে রঙ্গীন শান্ত হয়ে এই স্থানে বাঁক নিয়ে আবার তিস্তার সঙ্গে গিয়ে মেশে এবং দুটি নদীই শান্তিতে এক প্রবাহ হয়ে বইতে থাকে। যে জায়গায় দু' নদীর যুগলপ্রবাহ বিশালাকায় ধারায় প্রবাহিত হয় সেই স্থানের নাম হয় 'রঙ্গিলি রঙ্গলিয়ট' অর্থাৎ 'ভরানদী'। অনেকের মতে অতীতে কোনও এক সময়ে এক বিশাল পাহাড়ি ধসের ফলে নদীর জলে এক কৃত্রিম বাঁধ তৈরি হয়ে এই উপত্যকা প্লাবিত হলে স্থানীয় লোকদের মধ্যে এই লোকগাথা প্রচলিত হয়।

রণমহল: হাওড়া
পূর্বনাম রাণীমহল। শোনা যায় এখানে গৌড়েশ্বরের রানিরা বাস করতেন বলে প্রথমে স্থাননাম হয় 'রাণীমহল', যা পরে অপভ্রংশে রণমহল হয়েছে।

রণীয়াড়া: বাঁকুড়া
কথিত আছে, মুঘল শাসকদের অত্যাচারে উৎপীড়িত হয়ে মধ্যপ্রদেশ নিবাসী শীতলমল্ল নামে জনৈক ভূস্বামী প্রায় বারো হাজার সৈন্য-সামন্ত নিয়ে এই স্থানে এসে বসবাস স্থাপন করে। সেই সৈন্যশিবির 'রণ-আড্ডা' নামে অভিহিত হয়। ক্রমে লোকমুখে 'রণ-আড্ডা' থেকে রণ-আড়া—রণড়ড়া— রণেড়া এবং শেষ পর্যন্ত রণীয়াড়া হয়েছে বলে অনেকে অনুমান করেন।

রসড়া: মুর্শিদাবাদ
প্রচলিত ছড়া:

রসড়া গ্রামখানি রসের সাগর।
মেয়েতে মোড়লি করে, পুরুষ-বাঁদর ॥

রসপুর কলকাতা: হাওড়া
(কলকাতা দেখুন)।

রসুই: বর্ধমান
প্রচলিত ছড়া:

ফাঁসি যাই
তো রসুই যাই না।

রাইপুর: বাঁকুড়া

প্রচলিত ছড়া:

অম্বিকানগর গেছে গানে
খাতরা গেছে দানে।
রাইপুর গেছে বানে।

রাউতবাটি: নদিয়া

কথিত আছে, এক সময় এখানকার জলাশয়ে প্রচুর পরিমাণে রুই বা রোহিত মৎস্য পাওয়া যেত। তা থেকে স্থাননাম হয় রোহিতবাটি, যা পরে অপভ্রংশে রাউতবাটি হয়।

রাউতারা: বাঁকুড়া

রাউত + অরা= রাউতারা। স্থানীয় অঞ্চলে ঘর বা গৃহকে 'অরা' বলা হয়। শোনা যায় আদিতে মাঝি সম্প্রদায়ভুক্ত 'রাউত'-এরা এই স্থানে বসতি স্থাপন করে। রাউতদের বসতি থেকে স্থাননাম হয় রাউত অরা, যা পরে অপভ্রংশে রাউতারা হয়েছে বলে অনুমিত।

অন্য মতে রাউতারা অর্থে রাজপুরুষ বা অশ্বারোহীদের ছাউনিও বোঝায়।

রাখালকালীর ঘাট: মালদহ

মালদহ জেলার শৈলপুর গ্রামের কাছে রাখাল কালীর ঘাট নামে একটি 'স্থান' আছে। রাখালেরা এখানে গোরু চরাত। কিংবদন্তি আছে, একদিন রাখাল বালকেরা খেলার ছলে কালীপুজো করতে উদ্যোগী হয় এবং ওদের মধ্যে একজন পাঁঠার ভূমিকায়, অন্য একজন জিভ বার করে কালীর ভূমিকায় অভিনয় করে। এক বট গাছের নীচে কালীর 'স্থান' হয়। এবং সেখানে ওই পাঁঠারূপী বালকটিকে বলিদানের জন্য নিয়ে গিয়ে অন্য একটি বালক খড়ের খড়্গা দিয়ে বলিদানের জন্য তার ঘাড়ে কোপ মারে। কিন্তু সত্যসত্যই সেই খড়ের খড়্গোর আঘাতে পাঁঠারূপী বালকের শিরোশ্ছেদ হয় এবং রক্তপাত ঘটে। সেই থেকে স্থানটি রাখালকালীর ঘাট নামে পরিচিত হয়।

রাঘবপুর: নদিয়া

নদিয়া-রাজ রাঘবের নামানুসারে স্থাননাম। এই নামে জেলায় দুটি স্থান আছে।

রাঙ্গামাটি: বর্ধমান

কথিত আছে, কোনও সময় স্থানটি কুসুমপুর নামে পরিচিত ছিল, কিন্তু তার কোনও ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় না। জনশ্রুতি আছে, একসময় লঙ্কার রাজা বাংলা জয় করতে এসে ভাগীরথী নদী বেয়ে কুসুমপুর পর্যন্ত হানা দিয়েছিলেন। প্রাপ্ত ঐতিহাসিক তথ্যানুসারে রাঙ্গামাটির প্রাচীন নাম কানসোনাপুরী ছিল। হিউয়েন সাং-এর বিবরণেও এই তথ্যের সমর্থন আছে (কর্ণসুবর্ণ দেখুন)।

রাজাভাতখাওয়া: জলপাইগুড়ি

জনশ্রুতি আছে, ভুটিয়া যুদ্ধের পর শান্তি স্থাপিত হলে এখানে কোচ রাজার আমন্ত্রণে ভুটিয়া রাজা এক ভোজসভায় আপ্যায়িত হয়েছিলেন। সেই থেকে জায়গার নাম রাজাভাতখাওয়া হয়।

রাণাঘাট: নদিয়া

পূর্বনাম জড়ানেতলা। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এ অঞ্চলে ডাকাত দস্যুদের দৌরাত্ম্য ছিল। সেই সময় এখানে রণা নামক এক দস্যু সর্দারের ঘাঁটি ছিল বলে জানা যায়। রণা ডাকাতের ঘাঁটি থেকে স্থানটি 'রণাঘাঁটি' এবং পরে রাণাঘাট নামে পরিচিত হয় বলে অনেকে মনে করেন। এখানকার সিদ্ধেশ্বরী কালীমূর্তি নাকি রণা ডাকাত সর্দারের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং উপাসিত ছিল। অন্য মতে নদিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কনিষ্ঠা রানির নামে স্থাননাম রাণীঘাট হয় যা পরে অপভ্রংশে রাণাঘাট হয়েছে। আরও এক মতে, মুঘল সেনাপতি রাণা মানসিংহ যশোহর অভিযানকালে চূর্নী নদীর তীরে এই স্থানে অবতরণ করেন। রাণার অবতরণের ঘাট থেকে 'রাণার ঘাট' এবং পরে রাণাঘাট হয়েছে বলে অনুমিত। এ ছাড়া 'রাণা' অর্থে ঘাট ইত্যাদির চাতাল, পুকুরের ঘাট ও ঘাটের বাঁধানো সিঁড়ির ধাপকেও বোঝায়। সেই সূত্রেও স্থাননাম রাণাঘাট হতে পারে।

প্রচলিত ছড়া:

যার নাই পুঁজিপাঠ
সে থাকে রাণাঘাট ॥

* * *

তেলী, তিলি, গানের হাট,
এ তিন নিয়ে রাণাঘাট।

* * *

রাণাঘাটের পানতুয়া, বনগাঁর দই
শান্তিপুরের কাঁচাগোল্লা, বাবু বলে কই ॥

* * *

কাশীর মালাই খ্যাত, জয়নগরের মোয়া।
রাণাঘাটের পানতুয়া, নবদ্বীপের খোয়া ॥

* * *

রাণাঘাটের হাতনাড়ুনি।
শান্তিপুরের কলকলানি ॥
নবদ্বীপের খোঁপা।
গুপ্তিপাড়ার চোপা ॥

রানিগঞ্জ: বর্ধমান

এই স্থানের কোলিয়ারির সমস্ত স্বত্ব বর্ধমানের রানির নামে ন্যস্ত হবার পর থেকে স্থানের নাম রানিগঞ্জ হয়েছে বলে অনুমিত।

রানিতলা: মুর্শিদাবাদ

রানীতলাও থেকে রানীতলা হয়েছে। 'তলাও' ফারসি শব্দ। অর্থ দিঘি। কথিত আছে, স্থানীয় লোকদের জলকষ্ট দূর করবার জন্য স্থানীয় হাট-বাজারের কাছে রানি ভবানী দুটি বৃহৎ দিঘি খনন করান। সেই সূত্রে দিঘিদুটি রানিতলাও নামে অভিহিত হয়, যা পরে অপভ্রংশে রানিতলা হয়েছে।

রামকৃষ্ণপুর: নদিয়া

নদিয়ার রাজা রুদ্ররায়ের পুত্র রামকৃষ্ণের নামানুসারে স্থাননাম।

রামচন্দ্রপুর: দ দিনাজপুর

একদা এখানে রামচন্দ্র রায় নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর নামানুসারে স্থাননাম।

হাওড়া জেলাতেও আমতার কাছে রামচন্দ্রপুর নামে গ্রাম আছে। প্রচলিত ছড়াটি হাওড়ার রামচন্দ্রপুর গ্রামকেই বোঝাচ্ছে।

প্রচলিত ছড়া:

জয়পুরের চোপা, খালনার খোঁপা
আমতার টান।
কোঁদল দেখবি যদি
রামচন্দ্রপুরের মেয়ে আন।

রামজীবনপুর: নদিয়া

নদিয়ার রাজা রুদ্র রায়ের পুত্র রামজীবনের নামানুসারে স্থাননাম।

রামবাটি: বর্ধমান

গ্রামে রাম-সীতার যুগলমূর্তি প্রতিষ্ঠিত থাকায় স্থানের নাম রামবাটি হয়েছে বলে অনুমিত।

রামসাগর: বাঁকুড়া

রামসাগর নামে একটি প্রাচীন দিঘি থেকে স্থাননাম রামসাগর হয়েছে বলে জানা যায়। শোনা যায় জনৈক বণিক এই স্থানে শিবের নিকট মানত করে মনস্কামনা পূর্ণ হলে তিনি এই দিঘিটি খনন করেন।

রামেশ্বরপুর: নদিয়া

রাজা রাঘবের অগ্রজ রামেশ্বরের নামানুসারে স্থাননাম।

রায়কতপাড়া: জলপাইগুড়ি

রায় + কত। 'রায়' অর্থ অধিপতি এবং 'কত' অর্থ কোট = দুর্গ। স্থান অর্থে সেনাধ্যক্ষ বা দুর্গাধিপতি বোঝায়। কথিত আছে, কুচবিহার রাজবংশের এক অংশ পারিবারিক কলহের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে এই স্থানে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। এই বিচ্ছিন্ন রাজবংশ রায়কত রাজবংশ নামে পরিচিত ছিল বলে জানা যায়।

রিষড়া: হুগলি

বিপ্রদাসের 'মনসামঙ্গলে' এই স্থানের উল্লেখ আছে। একদা সমৃদ্ধ এই স্থানে ওয়ারেন হেস্টিংসের একটি বাগানবাড়ি ছিল।

প্রচলিত ছড়া:

উড়ে, মেড়ো, হিজড়া।
এ তিন নিয়ে রিষড়া ॥

* * *

হড় (পদবি বিশেষ), হাড়ি, হিজড়া।
এ তিন নিয়ে রিষড়া ॥

রুইয়ের কুঠি: কুচবিহার

শোনা যায়, একসময় এখানে তোরসা নদীর এক শাখা বহতা ছিল। সেই শাখানদীর এক গভীর খাদের মতো অংশে প্রচুর বড় বড় মাছ, বিশেষ করে রুই মাছ পাওয়া যেত। সেই অংশকে স্থানীয় লোকেরা রুই মাছের 'কুড়া' বা 'খাদ' বলত। কালক্রমে সেই শাখানদী চর পড়ে ভরাট হয়ে যায় এবং আগাছার জঙ্গলে ছেয়ে যায়। লোকেরা আগাছার বন কেটে বসবাস আরম্ভ করলে পূর্বোক্ত রুইমাছের 'কুড়া' বা 'খাদে'র অনুসরণে স্থানের নাম রাখে রুইয়ের কুঠি।

রুদড়া: বাঁকুড়া

এখানে প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন রুদ্রদেব শিবের নামানুসারে স্থাননাম 'রুদড়া' হয়েছে বলে অনুমিত।

রূপদহ: নদিয়া

এখানকার সাতটি সাবেক জলাশয় বা বিলের মধ্যে একটির নাম ছিল রূপাই বা রূপার দহ। সেই রূপার দহের পাশে হিজলি গাছের নীচে প্রতিষ্ঠিত রূপাই কালীর 'থান' থেকে স্থাননাম রূপদহ হয়েছে বলে অনুমিত।

রেউই: নদিয়া

কৃষ্ণনগরের প্রাচীন নাম রেউই। রেবতী থেকে রেউই হয়েছে বলে মনে করা হয়। রেবতী ছিলেন পৌরাণিক বাসুদেব রোহিণীর পুত্র শ্রীকৃষ্ণের বৈমাত্র ভ্রাতা বলরামের পত্নী। একসময় এখানে বহু কৃষ্ণোপাসক গোপ বাস

করতেন। সেই সূত্রে স্থাননাম রেউই হয়ে থাকবে। নদিয়ারাজ রুদ্ররায় এই স্থানের নাম রেউই-এর পরিবর্তে কৃষ্ণনগর রাখেন। (কৃষ্ণনগর দেখুন)

রেনক: দার্জিলিং

মূল তিব্বতি থেকে উদ্ভূত নাম। অর্থ— কালো পাহাড়। কেউ কেউ বলেন যে স্থাননামের অর্থ 'নাক'-এর মতো দেখতে পাহাড়।

লঙ্কাসারি: দার্জিলিং

মূল তিব্বতি থেকে উদ্ভূত নাম, অর্থ কাশবন অধ্যুষিত স্থান।

লতাঝরনা: পুরুলিয়া

সম্ভবত লতাপাতার অন্তরালে প্রবাহিত ঝরনা থেকে স্থাননাম লতাঝরনা হয়েছে বলে অনুমিত।

লপচু: দার্জিলিং

মূল লেপচা থেকে উদ্ভূত স্থাননাম। সম্ভবত মূল লেপচা 'লাপ-সো' অর্থ পাহাড়ি পথে বসানো পথনির্দেশক পাথরের 'নিশান পাথর' (sign-post)। কথিত আছে, সরল বিশ্বাসী লেপচা এবং ভুটিয়ারা পাহাড়ি পথের কষ্ট লাঘব করবার মানসে এইসব নিশানরূপী পাথরের ওপর ফুল-পাতা অর্পণ করে যেত। লেপচা ভাষায় কেউ কেউ স্থানটি 'লুক-চোক' নামেও অভিহিত করে; অর্থ, ভেড়া চরানোর জায়গা। এক ইংরেজি ভ্রমণ কাহিনিতে জায়গাটিকে 'লপচোক' নামে উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থ 'শীতল পাথর' (cool stone)। এখানকার চা-বাগান ও বিশেষ প্রকার দার্জিলিং চা বিখ্যাত।

লাভপুর: বীরভূম

পূর্বনাম অট্টহাস। কিংবদন্তি অনুসারে বিষ্ণুচক্রে ছিন্ন হয়ে সতীর অধরোষ্ঠ এইখানে পড়েছিল বলে অধর থেকে স্থাননাম অট্টহাস হয়। স্থানটি সতীপীঠস্থল দেবী অট্টহাস স্থান নামে প্রসিদ্ধ। মুসলমান আমলে এই স্থানটি লৌহ শিল্প ও রেশম শিল্পের জন্য বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। লাভের ব্যাবসার স্থান হিসেবে চলতি কথায় স্থানটি লাভপুর নামে পরিচিত হয়। বিখ্যাত সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মস্থান।

প্রচলিত ছড়া:

নলহাটিতে মা ললাটেশ্বরী
লাভপুরে মা ফুল্লরা।
সাঁইথিয়ায় মা নন্দেশ্বরী,
তারাপীঠে মা জয় তারা।
বোলপুরে মা কঙ্কালীতলা,
বক্রেশ্বরে মা'র পায়ের তলা।
এই ছয় পীঠ নিয়ে বীরভূমের বড়গলা।

লালদহ: বীরভূম

পূর্বনাম লাইদহ। কোপাই নদীর তীরে এই স্থানে একসময় একটি 'দহ' ছিল। স্থানীয় লোকেরা সেই দহকে লাউদহ বলত, যা ক্রমে অপভ্রংশে লালদহ হয়েছে।

লালনগর: নদিয়া

নীলকর সাহেবদের নির্মম অত্যাচারে এই এলাকার নীলচাষিদের রক্তে লাল হওয়া মাটি থেকে স্থাননাম লালনগর হয়েছে বলে অনেকে অনুমান করেন। আর এক মতে লালমুখো সাহেবদের আনাগোনায় স্থাননাম লালনগর হয়েছে।

লালপুর: দ চব্বিশ পরগনা

কথিত আছে, শিবপ্রসাদ দত্ত নামে এক ব্যক্তি জঙ্গলাকীর্ণ এই স্থানটি ইংরেজদের কাছ থেকে 'বন্দোবস্ত' নিয়ে গ্রামপত্তন করেন এবং তাঁর এক পুত্র লালবিহারীর নামে স্থাননাম রাখেন লালপুর।

লেবং: দার্জিলিং

মূল লেপচা থেকে উদ্ভূত নাম। অর্থ জিভের আকৃতির মতো পাহাড়ি স্থান। (tounge shaped spur) দার্জিলিং পাহাড় থেকে এই স্থানটি মুখের ভেতর থেকে জিভ বেরিয়ে আসার মতো দেখায় বলে এই নাম। মূল লেপচা কথাটা 'আলি' ও 'এবং' যার অপভ্রংশে লেবং হয়েছে।

লোবা: বীরভূম

পূর্বনাম 'সোনবা'। সরকারি নথিপত্রে স্থানটিকে 'লোবা' নামে উল্লেখ করা হয়েছে যদিও এই নাম পরিবর্তনের কোনও কারণ জানা যায় না। জায়গাটি বাংলার নবাব হুসেন শাহের সময় পত্তন হয়েছিল বলে জানা যায়।

শক্টী: পূ মেদিনীপুর

এই স্থাননামের উল্লেখ Silimpur inscription of Jaya-Pala of Kamrupa, 11th century-তে পাওয়া যায়।

শংকরপুর: পূ মেদিনীপুর

স্থানটি মৎস্য বন্দরের জন্য খ্যাত।

প্রচলিত ছড়া:

রাম রাউলের শাঁখা।
নবীন মাইতির পাকা ॥
অনুপ জানার গান।
হরু দাসের ধান ॥
সুভাষ নাপিতের ক্ষুর।
এই নিয়ে শংকরপুর ॥

শাঁখাই: বর্ধমান

শাঁখ থেকে শাঁখাই কথাটা এসেছে। এই স্থানের নামকরণ সম্বন্ধে একটি রোচক কাহিনি প্রচলিত আছে। ভাগীরথী তীরে অবস্থিত বৈষ্ণবসাধক উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের আশ্রমে একদিন একটি আট-ন' বছরের অনাথ বালিকা এসে আশ্রয় নেয়। সে খুব কর্মপটু ছিল এবং অল্পদিনের মধ্যেই সব আশ্রমবাসীদের মন জয় করে নেয়। তারপর বয়স বাড়লে গ্রামবাসীদের মনে হয় যে এবার মেয়েটার বিয়ে হওয়া দরকার। যোগ্য পাত্র ঠিক হলে মেয়েটিকে অলংকারাদি এবং বিয়ের চেলি পরিয়ে ভাগীরথী নদীতে রীতি অনুযায়ী স্নান করানোর জন্য নিয়ে যায়। কিন্তু মেয়েটি নদীতে ডুব দেওয়ার পর আর তার দেখা পাওয়া যায় না। গ্রামবাসীরা কান্নায় ভেঙে পড়ে। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কোনও ফল হয় না। ক্রন্দনরত গ্রামবাসীরা বিলাপ করতে করতে গ্রামে ফিরে আসে। এই ঘটনার কয়েক দিন পরে এক শাঁখা বিক্রেতা এক ঝুড়ি শাঁখা মাথায় নিয়ে নদী পার করার জন্য

ভাগীরথীর তীরে আসে এবং একটু দূরে একটি বিয়ের সাজ পরা ফুটফুটে সুন্দরী মেয়েকে দেখতে পায়। মেয়েটি তার কাছে এগিয়ে এসে বলে যে, 'ভাই' আমার সব রকম গয়না আছে শুধু শাঁখা নেই। আমাকে এক জোড়া শাঁখা দেবে? শাঁখারি মেয়েটিকে এক জোড়া শাঁখা দিয়ে পয়সা চাইলে মেয়েটি বলে, 'তুমি আমার পিতা উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের বাড়ি গিয়ে পয়সা চাও, পয়সা পেয়ে যাবে। যদি পিতার কাছে পয়সা না থাকে তবে তুমি তাঁকে বলবে যে ঘরের পূর্ব কোণে একটা কৌটার মধ্যে পাঁচটা মোহর আছে। সেই থেকে তোমার পাওনা মিটিয়ে দেয় যেন।' লোকটি উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের বাড়িতে গিয়ে সব বৃত্তান্ত জানায়। সব শুনে উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন। আজীবন চিরকুমার তাঁর মেয়েই বা কেমন করে এল। শাঁখা বিক্রেতার কথার সত্যতা প্রমাণ করার জন্য দত্ত ঠাকুর তাঁকে ভাগীরথী তীরে নিয়ে যেতে বললেন। নদী তীরে এসে কোথাও কিছু না দেখতে পেয়ে শাঁখা বিক্রেতা ভয়ে দুঃখে কাঁদতে লাগল। সেই সময় হঠাৎই নদীর জলের ভেতর থেকে একটি শাঁখা পরিহিতা নারীহস্ত এক নিমেষের জন্য ভেসে উঠে আবার মিলিয়ে গেল। দত্ত ঠাকুর যেন চেতনা ফিরে পেলেন। তিনি বুঝলেন এই হাত স্বয়ং মা ভগবতীরূপী সেই অনাথ বালিকাটির ছাড়া আর কারও নয়। তিনি দুঃখে ফেটে পড়লেন যে মাকে তিনি চিনতে পারেননি আর এই সাধারণ শাঁখা বিক্রেতা তাঁর স্বরূপ দর্শন পেল। এই ঘটনার পর ভাগীরথী তীরের সেই স্থান এবং নিকটবর্তী জনপদ শাঁখাই নামে পরিচিত হয়।

শাকিটা: বর্ধমান

এই স্থাননামের উল্লেখ Subhankara-pataka inscription of Dharmapala of Pragjyotisa, 12th century-তে পাওয়া যায়।

শান্তিনিকেতন: বীরভূম

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই স্থানের নির্জনতা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে মার্চ মাসে রায়পুরের প্রতাপনারায়ণ সিংহ মহাশয়ের কাছ থেকে প্রায় কুড়ি বিঘা জমি কিনে সেখানে একটি বাগান ও বাসভবন নির্মাণ করে তার নাম দেন শান্তিনিকেতন (Abode of Peace)। কালক্রমে শান্তিনিকেতনের নাম অনুসারেই সংলগ্ন অঞ্চল শান্তিনিকেতন নামে পরিচিত হয়। বোলপুর, বাঁধগড়া, সুরুল, বল্লভপুর,

গোয়ালপাড়া, বয়রাডিহি, শ্যামবাটি, মধুসূদনপুর এবং তালতোড় মৌজাগুলির অংশবিশেষ নিয়ে বর্তমান শান্তিনিকেতনের পত্তন।

১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করে সর্বসাধারণের ঈশ্বর আরাধনার জন্য উৎসর্গ করেন। এখানে যে দুটি ছাতিম (সপ্তপর্ণ) গাছের তলায় বসে দেবেন্দ্রনাথ ধ্যান ও আরাধনা করতে ভালবাসতেন সে দুটি ছাতিম গাছ আজও রয়েছে। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মচর্যাশ্রম নামে সম্পূর্ণ নতুনভাবে এখানে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাচীন ভারতের গুরুগৃহের মতো শহরের কোলাহল ও কৃত্রিমতা থেকে দূরে মুক্ত আকাশের নীচে স্বাভাবিক পরিবেশে যাতে সহজে স্বাধীন ভাবে ছেলেমেয়েরা শিক্ষালাভ করতে এবং গড়ে উঠতে পারে তাই ছিল রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ এই বিদ্যালয়ের কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত ও পুনর্গঠন করে বিশ্বভারতী নামে একটি প্রকৃতই আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারা বিষয়ে শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির সঙ্গে অনুশীলন ও গবেষণা এবং ঐক্য ও মিলনের সাহায্যে জগৎ থেকে আন্তর্জাতিক হিংসা ও বিদ্বেষ নির্মূল করে মানবতার বিজয় গৌরব ঘোষণা করাই বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্য। বিশ্বভারতীর খ্যাতি আজ সমগ্র বিশ্বব্যাপী। পৃথিবীর বহু দেশের মনীষী এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জন্য আসেন।

শান্তিপুর: নদিয়া

শান্তিপুর নামকরণ সম্বন্ধে নানারকম মত আছে। কথিত আছে, এখানে শান্তিপন নামে এক মুনি বাস করতেন এবং তাঁর নামেই স্থাননাম শান্তিপুর হয়েছে।

অন্য মতে, শ্রীশ্রীমৎস্বামী অদ্বৈতাচার্যের শিক্ষাগুরু ফুলিয়ার শান্তাচার্য বেদান্ত-বাগীশ বা দ্বিতীয় শান্তমুনির এখানে আশ্রম ছিল বলে স্থাননাম শান্তিপুর হয়েছে।

কেউ কেউ মনে করেন শান্তিপুর নাম এখানে শান্তমুনির আগমনের আগে থেকেই ছিল। তথ্য প্রমাণস্বরূপ এই স্থানটি প্রায় আট শতাধিক বছরের পুরনো বলে জানা যায়।

অন্য একটি মতে, এই স্থানে শান্তিকর নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন বলে সেই রাজার নামে শান্তিপুর নাম হয়েছে। আবার এও শোনা যায় যে এই স্থানটি ভাগীরথী বা গঙ্গার তীরে অবস্থিত বলে অনেকে তাদের মৃতকল্প আত্মীয়স্বজনকে সজ্ঞানে গঙ্গাতীরস্থ করার জন্য এখানে নিয়ে আসতেন।

তাদের মধ্যে যাঁরা দৈবাৎ রোগমুক্ত হয়ে যেতেন তাঁরা আর সংসারে ফিরে না গিয়ে এই স্থানেই শান্তিতে জীবন যাপন করতেন। এরকম সংসার-বিরাগী শান্তিপ্রিয় লোকদের নিয়ে এই জনপদ গড়ে উঠলে স্থানের নাম হয় শান্তিপুর।

প্রচলিত ছড়া:

শান্তিপুর রসের সাগর।
এক ঘরে তিন তিন নাগর ॥

* * *

তাঁতী, গোঁসাই, পচাভুর।
এই তিনে শান্তিপুর ॥
(ভুর— ঝুরঝুরে গুড়)

* * *

গোঁসাই, তাঁতী, সজনের ফুল
ও তিন নিয়ে শান্তিপুর ॥

* * *

তাঁতী, গোঁসাই, আচার্য ঠাকুর।
এ তিন নিয়ে শান্তিপুর ॥

* * *

তাঁতের শাড়ি, নলেন গুড়।
দুই নিয়ে শান্তিপুর ॥

* * *

তোমার আমার হৃদ্যতা।
যেন শান্তিপুরের লৌকতা (লৌকিকতা) ॥

* * *

চিতল মাছের কোল।
শান্তিপুরের বোল ॥

* * *

রাণাঘাটের হ্যাতনাভুনি।
শান্তিপুরের কলকলানি ॥
নবদ্বীপের খোঁপা।
গুপ্তিপাড়ার চোপা ॥

* * *

শান্তিপুরের খাসা দই
বর্ধমানের বসা দই।
বধূ আমি তোমা বিনা
আর কারও নই ॥

* * *

রাণাঘাটের পানতুয়া, বনগাঁর দই
শান্তিপুরের কাঁচাগোল্লা, বাবু বলে কই ॥

* * *

উলোর-ভুঁয়ের ময়দা আর সৈদাবাদের ঘি,
শান্তিপুরের কড়াই এনে লুচি ভেজে দি।

* * *

উলোর মেয়ের কলকলানি, শান্তিপুরের খোঁপা,
নদের মেয়ের নথনাড়া, কলকাতার চোপা।

* * *

ঢাকা দিয়ে শেয়াল যায়,
পেঁড়োয় কুকুড় ডাকে।
শান্তিপুরের বুড়ি বলে
কামড়ালে মোর নাকে ॥

* * *

যাদু ঘুমোরে ঘুমো
শান্তিপুরে বাঘ এসেছে,
দারুণ হুমো ॥

শালকিয়া: হাওড়া

সুকুমার সেনের মতে শালুক + ইয়া =শালকিয়া

প্রচলিত ছড়া:

গাঁজা, ভাঙ/ গুলি, কলকে
এ তিন নিয়ে শালকে।

শালবাড়ি: কুচবিহার

এখানে শালবনের মধ্যে কুচবিহার মহারাজার একটি বাগানবাড়ি ছিল। সেই থেকে স্থাননাম শালবাড়ি হয়ে থাকবে।

শাহপুর: নদিয়া

গৌড় সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের নামানুসারে স্থাননাম।

শিওড়া: বীরভূম

এই স্থাননামের উল্লেখ Kamuli Grant of Vaidya-Deva of Assam, latter part of 11th century-তে পাওয়া যায়।

শিকারপুর: নদিয়া

শোনা যায় আগে এখানে ঘন জঙ্গল থাকায় শিকারির দল শিকার করতে আসতেন। পরে এই জঙ্গল কেটে গ্রাম পত্তন হলে স্থানের নাম হয় শিকারপুর।

শিবনিবাস: নদিয়া

এই স্থানটি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র দ্বারা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সম্বন্ধে একটি কাহিনি প্রচলিত আছে। নসর খাঁ নামে এক দস্যুকে দমন করার জন্য কৃষ্ণচন্দ্র এই স্থানে শিবির স্থাপন করেন। একদিন সকালে রাজা নদীতে মুখ প্রক্ষালন করছিলেন, এমন সময় একটি রুই মাছ জল থেকে লাফিয়ে উঠে রাজার কোলের ওপর গিয়ে পড়ে। তাই দেখে রাজজ্যোতিষী বলেন 'মহারাজ রাজভোগ্য রোহিত মৎস্য যখন আপনা থেকেই আপনার কোলে লাফিয়ে পড়েছে তখন এই স্থান রাজবাসের জন্য একান্ত উপযুক্ত। আপনি এখানে একটি নগর প্রতিষ্ঠা করুন।'

তিন দিকে ইছামতী নদী প্রবাহিত বলে স্থানটি প্রতিরক্ষার দিক থেকেও বেশ সুরক্ষিত। সবকিছু বিবেচনা করে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এখানে একটি নগর ও বহু দেবালয় স্থাপন করেন। কথিত আছে, একসময় এখানে ১০৮টি শিবমন্দির ছিল। সেই কারণে স্থাননাম হয় শিবনিবাস। সেইসব মন্দির ও প্রাসাদ ইত্যাদি বর্তমানে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে বিশপ হেবর শিবনিবাসে এসেছিলেন। তখন তিনি এখানে চারটি অতি সুন্দর মন্দির দেখেছিলেন। তাঁর বিবরণ থেকে জানা যায় যে এখানকার রাজবাড়ির প্রবেশদ্বার

'গথিক' স্থাপত্যের অতি সুন্দর নিদর্শন ছিল। তাঁর মতে এই রাজবাড়ির ফাটকের গঠনপ্রণালী মস্কোর প্রসিদ্ধ ক্রেমলিন প্রাসাদের ফাটকের মতো, কিন্তু দেখতে আরও সুন্দর ছিল। কৃষ্ণচন্দ্রের সময় শিবনিবাস কাশীতুল্য বিবেচিত হত।

প্রচলিত ছড়া:

শিবনিবাস তুল্য কাশী ধন্য নদী কঙ্কনা।
উপরে বাজে দেব ঘড়ি, নীচে বাজে ঠঙ্‌না ॥

শিবপুর: হাওড়া

প্রচলিত ছড়া:

পাগল, কুকুর, পুকুর।
এ তিন নিয়ে শিবপুর ॥

* * *

গাঁজা, গুলি, সিদ্ধি,
তিনে শিবপুরের বৃদ্ধি ॥

* * *

তাল, মান, সুর।
তিনে শিবপুর ॥

* * *

গজা ডুবুডুবু
ইটারাই ভাসে
সোনার শিবপুর
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসে ॥

শিববাটি: দ দিনাজপুর

কিংবদন্তি অনুসারে বাণরাজা প্রতিষ্ঠিত অতি প্রাচীন বিরূপাক্ষ শিব মন্দির থেকে স্থানের নাম শিববাড়ি বা শিববাটি হয়েছে।

শিমুরালি: নদিয়া

শাল্মলী বা শিমুল গাছের সঙ্গে জড়িত স্থাননাম।

প্রচলিত ছড়া:

বাঁশ, বন, মড়ার খুলি।
এ তিন নিয়ে শিমুরালি ॥

শিমুলিয়া: বর্ধমান
পূর্বনাম সিমুলগড়। এই নামের উল্লেখ ধর্মমঙ্গল কাব্যে পাওয়া যায়। কথিত আছে, সেন রাজাদের সময় এখানে সিমুলগড় নামে একটি ছোটখাটো রাজত্ব ছিল।

শিয়াখালা: হুগলি
একদা শিবশক্তির লীলাক্ষেত্র রূপে খ্যাত এই প্রাচীন স্থানটি 'শিবক্ষেত্র' নামে পরিচিত ছিল। শিবক্ষেত্র অপভ্রংশে শিয়াখালা হয়েছে। রাধাভূষণ তর্কভূষণ কৃত সত্যনারায়ণের ব্রতকথায় এবং সারদাচরণ মিত্র প্রণীত 'রাঢ়ের কায়স্থ' গ্রন্থে শিবক্ষেত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়।

শিয়াড়া: প মেদিনীপুর
পূর্বনাম 'শিরা-বড়া' (Sira-Vada) অপভ্রংশে শিয়াড়া হয়েছে। 'শিড়া-বড়া' নামের উল্লেখ Kamauli Grant of Vaidya-Deva of Assam, latter part of 11th century-তে পাওয়া যায়।

শিয়ান: বীরভূম
জনশ্রুতি আছে, রামায়ণে বর্ণিত ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির নামানুসারে স্থানের নাম হয় 'শৃঙ্গনা'; যদিও ঋষির সঙ্গে এই স্থানের যোগসূত্র জানা যায় না। 'শৃঙ্গনা' ক্রমে অপভ্রংশে 'শিয়ান' হয়েছে।

শিরুলী: বর্ধমান
পূর্বনাম সিমালী। সিমালী নামের উল্লেখ Naihati copper plate of Vallalsena, early 12th century-তে পাওয়া যায়।

শিলদা: প মেদিনীপুর
প্রাচীন সাঁতভূমি বা সামন্তভূমিই বর্তমানে শিলদা নামে পরিচিত বলে

অনুমিত। সাঁতভূমি বা সামন্তভূম থেকেই জাতি হিসাবে 'সাঁওতাল' নামকরণ হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। স্থানীয় লোকের কাছে চলতি কথায় আজও স্থানটি সাঁতভূমি নামে উল্লিখিত হয়। একদা স্থানটি 'ঝাটি বানি' নামেও পরিচিত ছিল। জঙ্গল মহালের বিখ্যাত চুয়াড় বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান ঘাঁটির জন্য স্থানটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। শিলদার একদা প্রতিপত্তিশালী রাজবংশের সম্বন্ধে 'ভৈরব-রঙ্কিনি মাহাত্ম্য' গ্রন্থে পাওয়া যায়—

শিব ভৈরবের মাটি শিল্‌দা পরগনা।
গ্রামে গ্রামে শিব লিঙ্গ এখানে অর্চনা ॥
শৈব রাজা ছিল হেথা প্রাচীন যুগেতে।
তাঁরই কীর্তি এ সকল বিশ্বাস মনেতে ॥
জননী কিশোরমণি ছিল রাজমাতা।
এ সামন্তভূমে তাঁর আছে কীর্তিগাথা ॥
দেশ রক্ষণে কত শক্তি ছিল তাঁর।
যুদ্ধে কেটেছেন মাথা পাঁচশ ভূঞার।
এখনও সে কাটা মুণ্ড 'ইঁদকুড়ি' ভূমে।
অস্ত্রসহ কবরস্থ আছে শিল্‌দা গ্রামে ॥

শিলপাড়া: দ চব্বিশ পরগনা

জঙ্গলাকীর্ণ এই স্থানে বনজঙ্গল কেটে কিছু লোক বসতি স্থাপন করলে স্বপ্নাদেশানুসারে জঙ্গলের মধ্যে একটি শিবমূর্তি পাওয়া যায়। স্থানীয় লোকে শিবমূর্তিটিকে যথারীতি প্রতিষ্ঠা করে স্থাননাম দেন শিবপাড়া। কালক্রমে শিবপাড়া অপভ্রংশে শিলপাড়া হয়।

শিলিগুড়ি: দার্জিলিং

শিলিগুড়ি নাম কোচদের দেওয়া বলে মনে হয়। শিলি— পাথর, গুড়ি— স্তূপ। পাথুরে জায়গাসূচক নাম। কাছের মহানদীতে হিমালয় থেকে বয়ে আসা পাথরের স্তূপ থেকে এই নামের উৎপত্তি। একসময়ে স্থানটি 'শিলাগুড়ি' নামে পরিচিত ছিল। এই স্থাননামের উল্লেখ Kamauli Grant of Vaidya-Deva of Assam. latter part of 11th century-তে পাওয়া যায়। একদা নগণ্য গ্রামটি

বর্তমানে একটি বিশিষ্ট বাণিজ্যকেন্দ্র। এখান থেকে প্রখ্যাত দার্জিলিং-হিমালয়ান রেলপথের আরম্ভ। এই রেলপথটি, বর্তমানে 'হেরিটেজ' রেলপথ হিসেবে গণ্য, শিলিগুড়ি থেকে ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে আরম্ভ হয় এবং ১৮৮১-সনে দার্জিলিং পর্যন্ত লাইন সমাপ্ত হয়।

শীলদুয়ার: কুচবিহার

কথিত আছে, একদা এখানে কামতেশ্বর রাজার রাজধানী ছিল। প্রায় চোদ্দো মাইল ব্যাসে বৃত্তাকৃতি এক সুউচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত সেই রাজধানীতে প্রবেশের জন্য ছ'টি প্রবেশ দ্বার ছিল বলে জানা যায়। প্রধান দ্বার পাথরের তৈরি ছিল বলে শীলদুয়ার নামে পরিচিত ছিল। সেই থেকে স্থাননাম শীলদুয়ার হয় বলে অনুমিত। কথিত আছে, প্রাচীর ও শীলদুয়ার নিকটবর্তী জলঢাকা নদীর গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে বলে অনেকে মনে করেন।

শুকরো/ শুরো: বর্ধমান

প্রাচীন নাম শুরনগর। কথিত আছে, গৌড়ের রাজা আদিশূরের পুত্র ভূশূর গৌড়ের সিংহাসন থেকে বঞ্চিত হলে তিনি গৌড় ত্যাগ করে রাঢ়দেশে ব্রাহ্মণ রাজাদের সান্নিধ্যে নিজের রাজধানী 'শূরনগর' স্থাপন করেন। শূরনগরই কালক্রমে অপভ্রংশে শুকরো বা শুরো হয়েছে।

শুকিয়াপোখরী: দার্জিলিং

মূল নেপালি থেকে উদ্ভূত নাম, অর্থ, শুকনো পুকুর।

শুশুনা: বর্ধমান

পূর্বনাম তারাখ্যাতলা। এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত তারাখ্যাদেবী থেকে তারাখ্যাতলা হয়। এই দেবীর পূজা উপলক্ষে আগে এখানে বলিদান প্রথা প্রচলিত ছিল। সেই সূত্রে পশুবধের স্থলকে 'শুঙ্কা' অথবা শুশুনা বলা হত, ক্রমে স্থানটি শুশুনা নামে পরিচিত হয়। অন্য মতে এই অঞ্চলটি সুফসলা রবি ফসলের জন্য খ্যাত ছিল। তা থেকে স্থাননাম হয় 'সুসোমা'। বাঁকুড়াতেও শুশুনিয়া নামে একটি জায়গা আছে যা পরে অপভ্রংশে শুশুনা হয়েছে।

শ্যাওড়াবেড়ে: হাওড়া

প্রচলিত ছড়া:

গয়লা, জেলে, নেড়ে।
তিনে শ্যাওড়া বেড়ে ॥

শ্যামমাঝির বন্দর: হুগলি

রূপনারায়ণ নদের তীরবর্তী এই স্থানটি প্রাচীন কাল থেকেই ব্যাবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল বলে জানা যায়। এখানে শ্যামচরণ মাঝি নামে এক ধর্মপ্রাণ ব্যবসায়ী বাস করতেন। তাঁর নামানুসারে স্থাননাম শ্যামমাঝির বন্দর হয়েছে বলে অনুমিত।

শ্রীখণ্ড: বর্ধমান

উত্তররাঢ়ের বৈদ্যপ্রধান এই স্থানটি একদা বৈদ্যখণ্ড নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তীকালে গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী খণ্ডেশ্বরী (কালী) মন্দির থেকে স্থাননাম শ্রীখণ্ড হয়। শ্রীচৈতন্যের পার্ষদ নরহরি সরকার ঠাকুর এবং অনুরক্ত ভক্ত রঘুনন্দন ও মুকুন্দ শ্রীখণ্ডের অধিবাসী ছিলেন।

প্রচলিত ছড়া:

খণ্ডের সম্প্রদায় করে অন্যত্র কীর্তন।
নরহরি নাচে তাঁহা রঘুনন্দন ॥

শ্রীনগর: নদিয়া

পূর্বনাম মর্দানা। আনুমানিক ১৬৪০ খ্রিস্টাব্দে নদিয়ারাজ রাঘব রায় প্রাকৃতিক শোভায় মুগ্ধ হয়ে এক রম্য রাজপ্রাসাদ ও মন্দিরাদি নির্মাণ করেন এবং স্থানটির নাম দেন শ্রীনগর।

শ্রীপাঠকুলিয়া: নদিয়া

এই স্থানের সাবেক নাম কুলিয়া। কথিত আছে, শ্রীচৈতন্যদেব স্থানীয় বৈষ্ণব-নিন্দুক পণ্ডিত দেবানন্দের অপরাধ মার্জনা করেন। তদবধি অপরাধ ভঞ্জনের পাঠ সুবাদে স্থাননাম হয় শ্রীপাঠকুলিয়া।

শ্রীপাঠহুদা: নদিয়া

প্রচলিত ছড়া:

ওরে বৃন্দাবন হতে বড় শ্রীপাঠহুদা গ্রাম।
যেথা দিবানিশি শুনিতে পাই দীনবন্ধু নাম ॥

শ্রীপুর: হুগলি

পূর্বনাম আঁটিশেওড়া। রঘুনন্দন মিত্রমুস্তাফী নামে এক জমিদার এখানে বাস করতেন। একদিন স্থানীয় জেলেরা শ্রীকৃষ্ণের এক সুন্দর পাথরের মূর্তি গঙ্গাবক্ষ থেকে উদ্ধার করে। সংবাদ পেয়ে মুস্তাফী মহাশয় একটি মন্দির নির্মাণ করে সেই মূর্তিটিকে প্রতিষ্ঠা করেন এবং স্থানের নাম দেন শ্রীপুর।

শ্রীরামপুর: বীরভূম

বীরভূম জেলার এই স্থানটি সম্বন্ধে কিংবদন্তি আছে, বিক্রমাদিত্য এখানে পঞ্চমুণ্ডির আসনে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। কালক্রমে স্থানটি সাধুসন্ন্যাসীদের সাধনাস্থলে পরিণত হয়। কথিত আছে, জনৈক রামভক্ত সন্ন্যাসী তাঁর আরাধ্য দেবতা রামের নামানুসারে স্থানের নাম রাখেন শ্রীরামপুর।

শ্রীরামপুর: হুগলি

ভাগীরথী তীরে অবস্থিত এই স্থানটির পূর্বনাম শিবপুরং। মুঘল আমলে স্থানটি শেওড়াফুলির রাজা মনোহরচন্দ্র রায়ের জমিদারিভুক্ত ছিল। ১১৬০ খ্রিস্টাব্দে তিনি এই স্থানে শ্রীরামচন্দ্রজিউর বিগ্রহ স্থাপন করার পর থেকে স্থানটি শ্রীরামপুর নামে পরিচিত হয়।

ব্রিটিশ অধিকারের আগে জায়গাটি দিনেমারদের অধিকারে ছিল এবং তারা ডেনমার্কের রাজার নামে 'ফ্রেডরিক নগর' নামে উল্লেখ করত। ইংরেজ আমলে স্থানটি খ্রিস্টান মিশনারি সুবিখ্যাত পাদরি মার্শম্যান, ওয়ার্ড ও কেরি সাহেবের জন্য খ্যাত হয়। এঁদের প্রচেষ্টায় বাংলা ভাষার প্রচার ও শ্রীবৃদ্ধির কথা সর্বজনবিদিত। এই মনীষীত্রয়ের প্রচেষ্টায় সর্বপ্রথম বাংলা ছাপাখানা শ্রীরামপুরে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রথম বাংলা সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণ' এবং প্রথম বাংলা অক্ষরে ছাপা ভারতের মানচিত্র এখান থেকেই প্রকাশিত হয়।

শ্রীরামপুর চাতরা: হুগলি

শ্রীরামপুরের পশ্চিমে অবস্থিত চাতরা অঞ্চলকে নিয়ে একত্রে বলা হয় (চাতরা দেখুন)

প্রচলিত ছড়া:

দড়ি, দড়া, আলকাতরা।
তিন নিয়ে শ্রীরামপুর চাতরা ॥

সপ্তগ্রাম/ আদি সপ্তগ্রাম: হুগলি

বর্তমান আদি সপ্তগ্রাম রেল স্টেশন ও গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী ত্রিবেণী তীর্থের অনতিদূরে প্রাচীন সপ্তগ্রাম অবস্থিত ছিল বলে জানা যায়। গ্রিক ইতিহাসে উল্লিখিত প্রাচীন 'গঙ্গারিডস' বা 'গঙ্গরিডি' রাজ্যই প্রাচীন 'বঙ্গ' রাজ্যরূপে জানা যায় এবং সপ্তগ্রাম সেই রাজ্যের রাজধানী ছিল। সুদূর অতীত কালে বাংলা তথা ভারতের প্রসিদ্ধ বাণিজ্যবন্দর হিসেবে সপ্তগ্রামের খ্যাতি সুদূর রোম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। হিন্দুরাজাদের রাজত্বকালে সপ্তগ্রাম একটি বিশিষ্ট তীর্থ বলে গণ্য হত। সপ্তগ্রাম নামকরণ সম্বন্ধে একটি পৌরাণিক কাহিনি আছে। অতীতে কান্যকুব্জে প্রিয়বন্ত (কারও মতে প্রিয়ব্রত) নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর অগ্নিত্র, মেথাতিথি, বসুষ্মান, জ্যোতিষ্মান, দ্যুতিস্মান, সবন ও ভব্য নামে সাতটি পুত্র ছিল। তাঁরা গৃহাশ্রমী না হয়ে নিভৃতে নির্জনে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে সাতখানি বিভিন্ন গ্রামে তপঃসাধনা করে ঋষিত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সপ্ত ঋষির তপস্থল বলে সেই সাতটি গ্রামের সমষ্টিগত নাম হয় সপ্তগ্রাম। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী লিখেছেন— 'সপ্ত ঋষির শাসনে বোলায় সপ্তগ্রাম।' গ্রামগুলির নাম— বাসুদেবপুর, বাঁশবেড়িয়া, খামারপাড়া, কৃষ্ণপুর, দেবানন্দপুর, শিবপুর ও ত্রিশবিঘা। এই স্থানগুলি পৃথক ভাবে এখনও বিদ্যমান। কথিত আছে, একসময় বর্তমান চব্বিশ পরগনা জেলা, নদিয়া জেলার পশ্চিমাংশ এবং দক্ষিণে ডায়মন্ডহারবার পর্যন্ত এলাকা 'সাঁতগাঁ' নামে পরিচিত ছিল। অতীতে সরস্বতীর খাত দিয়েই ভাগীরথীর অধিকাংশ জলরাশি প্রবাহিত হত এবং দেশের সামুদ্রিক বাণিজ্যের পথও ছিল সরস্বতী নদী। সেই কারণে সরস্বতীর তীরে অবস্থিত সপ্তগ্রাম সহ অন্যান্য জনপদগুলি বিশেষ ঐশ্বর্যশালী ছিল। সপ্তগ্রামের স্বর্ণযুগের কথা বিপ্রদাসের 'মনসামঙ্গল' কাব্যে পাওয়া যায়—

বুহিত্র চাপায়্যা কূলে চাঁদো অধিকারী বলে
দেখিব কেমন সপ্তগ্রাম
তথা সপ্ত ঋষিস্থান সর্বদেব অধিষ্ঠান
সোক্ষ মোক্ষ রম্যন্তর ধাম।...
অভিনব সুরপুরী দেখি ঘর সারি সারি
প্রতি ঘরে কনকের বারা
নানা রত্ন অবিশাল জ্যোতির্ময় কাঁচা চাল
গজ মুক্তা প্রলম্বিত ঝারা।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যে পাওয়া যায়:

এসব সফরে যত সদাগর বৈসে।
যত ডিঙ্গা লয়ে তারা বাণিজ্যেতে আইসে ৷৷
সপ্তগ্রামের বণিক কোথাও না যায়।
ঘরে বসে সুখ মোক্ষ নানা ধন পায় ৷৷

আনুমানিক ১২৯৫ খ্রিস্টাব্দে সপ্তগ্রাম মুসলমান অধিকারে আসে। ১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথম পর্তুগিজ বাণিজ্যতরী সপ্তগ্রাম বন্দরে নোঙর করে। পরবর্তী কালে সপ্তগ্রাম বন্দরের কাছেই ‘পোর্ট পেকুইনা’ নামে পর্তুগিজ উপনিবেশ গড়ে ওঠে যা পরে ‘হুগলি’ নামে পরিচিত হয়। মুঘল আমলে ভাগীরথী তীরবর্তী স্থানগুলি পর্তুগিজ জলদস্যুদের উপদ্রবের জন্য ‘বটঘক খানা’ অথবা উপদ্রবের কেন্দ্র নামে অভিহিত হত। ইংরেজ অধিকারের পূর্ব পর্যন্ত সপ্তগ্রাম একটি বিখ্যাত বন্দর ছিল এবং এখানে দেশবিদেশের বাণিজ্যতরীর সমাগম হত। বস্তুত পর্তুগিজদের উপদ্রব এবং ক্রমে নিকটস্থ হুগলি বন্দরের অভ্যুত্থান এবং সরস্বতী নদী মজে যাওয়ার ফলে সপ্তগ্রামের প্রাধান্য কমে আসতে থাকে এবং সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে এখানে সমৃদ্ধির স্বর্ণযুগ অস্তমিত হয়ে যায়। একসময়ে সপ্তগ্রাম একটি সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবতীর্থ রূপে গণ্য হত। চৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বাদশ গোপালের অন্যতম বলে পরিচিত উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর সপ্তগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। চৈতন্যদেবের প্রধান পার্ষদ নিত্যানন্দ এখানে বহুদিন বাস করেছিলেন বলে জানা যায়।

প্রচলিত ছড়া:

কথোদিন থাকি নিত্যানন্দ খড়দহে।

সপ্তগ্রামে আইলেন সর্বজন সহে ॥
সপ্তগ্রামে যত হৈল কীর্তন বিহার।
শত বৎসরেও তাহা নারি বর্ণিবার ॥
* * *
সপ্তগ্রাম ধরণীতে নাহি তার তুল।
চালে চালে বৈসে লোক ভাগীরথী কূল ॥

সমুদ্রগড়: বর্ধমান
কেউ কেউ মনে করেন মহাভারতোক্ত বঙ্গরাজ সমুদ্র সেন এখানে রাজত্ব করতেন। আবার কারও মতে গুপ্তবংশীয় সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের সঙ্গে এই স্থানের সম্বন্ধ ছিল। সেই সূত্রে স্থাননাম সমুদ্রগড় হয়েছে বলে অনুমিত। একদা মুকুট রায় নামে একজন ক্ষমতাশালী ব্রাহ্মণ রাজা সমুদ্রগড়ে ছিলেন বলে জানা যায়। চৈতন্যভাগবৎ, শিবকঙ্কণ চণ্ডী প্রভৃতি গ্রন্থে এই স্থানের উল্লেখ আছে। অনেকের মতে মহাকবি কালিদাস নিকটেই বাস করতেন, যদিও তার কোনও প্রামাণিক তথ্য পাওয়া যায় না।

সমেশ্বর: হাওড়া
এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত সোমনাথ শিবের নামানুসারে স্থাননাম সমেশ্বর হয়েছে।

সরদার আটি: উ চব্বিশ পরগনা
শোনা যায় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময় বাগরাই সর্দার নামে এক ব্যক্তি রাজবাড়িতে খাজনা জমা দিতে আসে। সেই সময় একদল ডাকাত রাজবাড়ি আক্রমণ করে। বাগরাই সর্দার বিপুল বিক্রমে ওই ডাকাত দলকে বাধা দেয়। তার সাহসিকতায় মুগ্ধ হয়ে মহারাজ মালরামেশ্বর মৌজাটি মহাত্রাণ নিষ্কর বলে সর্দারের নামে দানপত্র করে দেন। বাগরাই সর্দার এখানে গ্রাম পত্তন করলে নাম হয় সর্দার আটি।

সাঁতরা: নদিয়া
পূর্বনাম 'শান্তি-বড়া' (Santi-Vada) অপভ্রংশে সাঁতরা হয়েছে। 'শান্তি-বড়া' নামের উল্লেখ Kamauli Grant of Vaidya-Deva of Assam, latter part of 11th century-তে পাওয়া যায়।

সাঁতরাগাছি: হাওড়া

প্রচলিত ছড়া:

সাঁতরাগাছির ওল ভাল
ক্ষীরোদ নট্টের ঢোল ভাল ॥

সাগরদিঘি: মুর্শিদাবাদ

কথিত আছে, এই দিঘি খুব গভীর করে খনন করা সত্ত্বেও জল ওঠেনি। রাজার প্রতি স্বপ্নাদেশ হয় যে সাগর নামে জনৈক কুম্ভকার যদি দিঘির মধ্যে থেকে এক কোদাল মাটি তুলে ফেলে তবেই জল উঠবে। রাজার আদেশে সাগর এক কোদাল মাটি তোলার সঙ্গে সঙ্গেই দিঘি জলে পূর্ণ হয়ে যায়, কিন্তু সাগর জলমগ্ন হয়ে মারা যায়। সেই কারণে সাগরের নাম থেকেই দিঘির নাম সাগরদিঘি হয়। সাগরদিঘি সম্বন্ধে আরও একটি কাহিনি প্রচলিত আছে। এক সময় পালবংশীয় রাজা মহীপাল তাঁর পরিবারবর্গ সহ স্থানান্তরে যাবার সময় পথে এখানে শিবির সন্নিবেশ করেন। রাজসৈন্য ও কর্মচারীগণকে দেখে স্থানীয় দুই ব্রাহ্মণ বালক বিশেষ ভয় পেয়ে এক গাছে উঠে বসে। বালকদের মধ্যে একজন এত ভয় পায় যে গাছের ডালেই সে প্রাণ হারায়। এই খবর রাজার কানে পৌঁছলে তাঁরই জন্য ব্রহ্মহত্যা ঘটেছে মনে করে তিনি অত্যন্ত অনুশোচনা করতে থাকেন। পণ্ডিতগণ ব্যবস্থা দেন যে রাজা ও রানি যতদূর পর্যন্ত একসঙ্গে পায়ে হেঁটে যেতে পারবেন ততদূর পর্যন্ত একটি জলাশয় খনন করলে ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে রাজা মুক্তি পাবেন। প্রায় আধক্রোশ পর্যন্ত চলার পর রানি ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েন। তখন রাজা আধক্রোশ দৈর্ঘ্যের একটি জলাশয় খনন করার আদেশ দেন। প্রবাদ অনুসারে পালবংশীয় রাজা মহীপাল সাগরদিঘির প্রতিষ্ঠাতা কিন্তু সাগরদিঘি নামকরণ সম্বন্ধে প্রথমোক্ত কাহিনিই নির্ভরযোগ্য তথ্য বলে মনে হয়।

প্রচলিত ছড়া:

সাগরদিঘি— পোপাড়া
দেখে শুনে পা বাড়া ॥

সাগরদ্বীপ: দ চব্বিশ পরগনা

বঙ্গোপসাগরের সঙ্গে গঙ্গার সঙ্গমে অবস্থিত এই স্থানটি হিন্দুদের কাছে বিশেষ পবিত্র। স্থানমাহাত্ম্য এবং স্থাননামের পেছনে এক সুন্দর পৌরাণিক কাহিনি আছে।

রাজা রামের ত্রয়োদশ পূর্বপুরুষ, অযোধ্যার রাজা সগর নিরানব্বুইবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করার পর একশোতম অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রস্তুতি করছিলেন। এর পূর্বে একমাত্র ভগবান ইন্দ্র একশোবার এই যজ্ঞ করেছিলেন। রাজা সগরের এই একশোতম যজ্ঞের প্রচেষ্টার কথা শুনে ইন্দ্র ঈর্ষা পরায়ণ হয়ে সগরের যজ্ঞের অশ্বকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে সমুদ্রের ধারে কপিলমুনির আশ্রমের এক পাতালকক্ষে লুকিয়ে রাখলেন। মুনি তখন গভীর তপস্যায় মগ্ন ছিলেন। তিনি কিছুই জানতে পারলেন না। রাজা সগর এবং তাঁর ষাট হাজার পুত্র সেই যজ্ঞের অশ্বের খোঁজ করতে করতে কপিলমুনির আশ্রমে পৌঁছলেন। কপিলমুনিই তাদের যজ্ঞের ঘোড়াকে আটকে রেখেছেন ভেবে তাঁর তপস্যায় ব্যাঘাত হেনে তাঁকে উত্ত্যক্ত করতে লাগলেন। তপোভঙ্গ হয়ে মুনি ক্রোধে রক্তচক্ষু অগ্নিশর্মা হয়ে সগর ও তাঁর পুত্রদের দিকে তাকাতেই তাঁরা সকলে এক নিমেষে ভস্মীভূত হয়ে গেলেন এবং মুনি অভিশাপ দিলেন যে তাদের আত্মা কখনও স্বর্গারোহণ করতে পারবে না। রাজা সগরের এক পৌত্র তাঁর পিতা ও পিতৃব্যদের খোঁজে কপিলমুনির আশ্রমে পৌঁছে তাঁর পূর্বপুরুষদের আত্মার মুক্তি প্রার্থনা করলে মুনি জানালেন যে, যদি স্বর্গীয় নদী গঙ্গার জল তার ভস্মীভূত পূর্বপুরুষদের ভস্ম স্পর্শ করে তবেই তাঁদের আত্মার মুক্তি হবে। স্বর্গের নদী গঙ্গাকে মর্তে আনার জন্য সগরের পৌত্র আজীবন প্রার্থনা করেও সক্ষম হলেন না, এবং অবশেষে প্রাণত্যাগ করলেন। সগরের পৌত্রের কোনও সন্তান-সন্ততি ছিল না, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর দৈবযোগে তাঁর বিধবা স্ত্রী ভগীরথ নামে এক পুত্র সন্তান জন্ম দেন। ভগীরথের কঠোর তপস্যায় অবশেষে গঙ্গা মর্তে অবতরণ করতে রাজি হলেন এবং মর্তের পথ দেখিয়ে ভগীরথ গঙ্গাকে নিয়ে কপিলমুনির আশ্রমের দিকে এগুতে থাকলেন। কিন্তু তীরে এসে তরী ডোবার মতো বর্তমান হাতিয়াগড় নামক স্থানে এসে ভগীরথের পথ বিভ্রম হল। তিনি আর গঙ্গাকে পথ দেখিয়ে এগোতে পারলেন না। গঙ্গা তখন নিজেকে শত ভাগে বিভক্ত করে এগিয়ে চললেন এবং অবশেষে একটি ধারা কপিলমুনির পাতালগর্ভে স্পর্শ করে সগররাজা ও তাঁর পুত্রদের আত্মাকে মুক্তি দিলেন। শতধারায় প্রবাহিত গঙ্গা মোহনায় ভেঙে পড়ে সমুদ্রে গিয়ে মিশে গেল।

প্রচলিত লোককথায় রাজা সগরের সঙ্গে জড়িত স্বর্গ থেকে সমুদ্র পর্যন্ত গঙ্গার প্রবাহের কাহিনি থেকে সমুদ্রের নাম হল 'সাগর' এবং দ্বীপাকৃতি কপিলমুনির আশ্রমের নাম হল সাগরদ্বীপ।

সাতজান: হুগলি

সাতজান স্থাননামের তাৎপর্য অস্পষ্ট, কিন্তু স্থাননামের অন্ত্যপদে 'জান' শব্দ প্রয়োগের উল্লেখ Puspabhadra Inscription of Dharmapala of Pragjyotisa, 12th century-তে পাওয়া যায়।

সাতালীবস্তী: জলপাইগুড়ি

জঙ্গলাকীর্ণ এই স্থানে বহু পূর্বে মেচ জাতি একটি উৎসব পালন করতেন যাকে মেচ ভাষায় 'সাঁতালু হাটাই' বলা হত। সাতালু হাটাই থেকেই স্থাননাম সাতালীবস্তী হয়েছে বলে অনুমিত।

সাদাতপুর: হাওড়া

পূর্বনাম ঘোষালবাটি। মুসলমান রাজত্বকালে সাহাদত আলি নামে এক বিশিষ্ট মুসলমান এখানে জায়াগের নিয়ে বসবাস স্থাপন করেন। তাঁর নামানুসারে স্থানটির নাম সাহাদাতপুর হয় এবং পরে অপভ্রংশে সাদাতপুর হয়েছে।

সাদেকবাগ: মুর্শিদাবাদ

সাধক বাগ বা সাদক সরাই নামেও পরিচিত এই স্থানে একদা বিভিন্ন ধর্মের সাধকদের বাস ছিল এবং সাধক মস্তরামের (কারও মতে মস্তরাম আউলিয়া) আখড়া ছিল। সাধকদের বাস থেকে স্থাননাম সাধকবাগ বা সাদেগবাগ হয়েছে বলে মনে করা হয়। মস্তরাম সম্বন্ধে জানা যায়, তাঁর প্রকৃত নাম ছিল সদানন্দ। তিনি শারীরিক ও যৌগিক শক্তির জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং পায়ে হেঁটে ভাগীরথী পারাপার করতেন বলে প্রবাদ আছে। শোনা যায়, একবার নবাব আলিবর্দি তাঁকে একটি শাল ও কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রা দান করেন। এই দান পাওয়া মাত্র মস্তরাম শালখানিকে অগ্নিকুণ্ডে এবং মুদ্রাগুলিকে নদীর জলে ফেলে দেন। এই কথা শুনে আলিবর্দি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর পাঠানো জিনিসগুলো ফেরত চেয়ে পাঠান। মস্তরাম তৎক্ষণাৎ অগ্নিকুণ্ড থেকে সেইরকম দশটি শাল এবং নদীর জল থেকে প্রায় পাঁচগুণ স্বর্ণমুদ্রা তুলে নবাবের বিস্ময় উৎপাদন করেন। আলিবর্দি তাঁর অদ্ভুত ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে একখানি ঢাল ও তরবারি উপহার দেন।

সানপুকুরিয়া: দ চব্বিশ পরগনা

কিংবদন্তি আছে, গ্রাম পত্তন করার সময় একটি পুকুর খনন করতে গিয়ে একটি শান-বাঁধানো ঘাট দেখতে পাওয়া যায়। ওই সময় খননকারীর প্রতি স্বপ্নাদেশ হয় যে, ওই পুকুর যেন আর খনন করা না হয়। স্বপ্নাদেশানুসারে পুকুর কাটা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং গ্রামবাসীরা দৈব জ্ঞানে ওই শানের ঘাটে ফুল-মালা দিয়ে পুজো করতে থাকে। কিন্তু হঠাৎ একদিন ঘাটটি অদৃশ্য হয়ে যায়। এই ঘটনা থেকে গ্রামের নাম সানপুকুরিয়া হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।

সারেঙ্গা: বাঁকুড়া

'সারেগা' নামক জনৈক স্থানীয় সাঁওতালি বাসিন্দার নামানুসারে স্থাননাম সারেঙ্গা হয়েছে বলে জানা যায়।

সাহেবধনী: নদিয়া

শ্রীচৈতন্য পরবর্তী নব বৈষ্ণবধর্মের অন্যতম লৌকিক উপশাখা সাহেবধনী সম্প্রদায়ের নামানুসারে এই স্থাননাম হয়েছে বলে অনুমিত। স্থানটি সাহেবধনী লোকধর্মের উৎসস্থান বলে বিবেচিত।

সিউড়ি: বীরভূম

শূরী বা শৌর্যশালী শব্দের অপভ্রংশে সিউড়ি হয়েছে বলে অনুমিত। ইংরেজি Suri বাংলা শূরী শব্দেরই দ্যোতক। কেউ কেউ মনে করেন এককালে এই স্থানে বৌদ্ধদের প্রাধান্য ছিল এবং তাঁরা এই স্থানকে 'শিবাড়ী' নামে অভিহিত করতেন। শিবাড়ী থেকে অপভ্রংশে সিউড়ি নাম হওয়াও সম্ভব।

প্রচলিত ছড়া:

বাঁকুড়ার রামগতি।
সিউড়ির কালীগতি।
নলহাটির জগজ্জ্যোতি ॥

* * *

হাড়ি, মুচি, বাউরি।
এ তিন নিয়ে সিউড়ি ॥

কাঠ, পাতা (শালপাতা), বাউরি।
তিনে শহর সিউড়ি ॥

সিংটী: হাওড়া
শোনা যায় বহুকাল পূর্বে বাংলার ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের ব্রাহ্মণরাজা রাজা রুদ্রনারায়ণ রায় পাঠান সর্দার কতলু খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয় লাভ করে এই স্থানে সিংহবাহিনী দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এই কারণে স্থানের নাম হয় 'সিংহটী,' যা পরে অপভ্রংশে সিংটী হয়েছে।

সিঙ্গারকোন: বর্ধমান
প্রচলিত ছড়া:

গান, বাজনা, সুজন।
তিন নিয়ে সিঙ্গারকোন ॥

সিঙ্গি: বীরভূম
গ্রামদেবী সিংহেশ্বরী দেবীর নামানুসারে স্থাননাম সিঙ্গি হয়েছে বলে জানা যায়।

সিঙ্গুর: হুগলি
প্রাচীন নাম সিংহপুর। অনেকে অনুমান করেন যে এই স্থানেই বঙ্গরাজ সিংহবাহুর রাজধানী ছিল। 'সিংহপুর' অপভ্রংশে সিঙ্গুর হয়েছে বলে অনুমিত।

সিংহলের প্রাচীন ইতিহাস 'মহাবংশ' থেকে জানা যায় যে, সুপ্রদেবী নামে এক বাঙালি রাজকন্যা যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হলে সাথসিংহ নামে এক সার্থপতিকে বিবাহ করেন। এঁদের পুত্র প্রবল পরাক্রান্ত রাজা সিংহবাহু রাঢ়দেশে একটি বিস্তীর্ণ জঙ্গল পরিষ্কার করে সিংহপুর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। মহাবংশে এই রাজ্য 'লাড়ারট্ঠ' অর্থাৎ রাঢ়রাষ্ট্র বলে উল্লিখিত হয়েছে। কিংবদন্তি অনুসারে এই সিংহবাহুর জ্যেষ্ঠ পুত্র বিজয় সিংহ সাতশত বীর সহচর নিয়ে জাহাজে করে গিয়ে তাম্রপর্ণী বা লঙ্কাদ্বীপ জয় করেন। বিজয় সিংহ থেকেই লঙ্কাদ্বীপ 'সিংহল' নামে পরিচিত হয় বলে অনেকে মনে

করেন। কথিত আছে, বুদ্ধদেব যে দিন দেহত্যাগ করেন, বিজয় সিংহ ঠিক সেই দিনই লঙ্কাদ্বীপে পদার্পণ করেন। বিজয় সিংহের অভিযান সম্বন্ধে কবি দ্বিজেন্দ্রলাল লিখেছেন—

একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়।
একদা যাহার অর্ণব পোত ভ্রমিল ভারত সাগর ময় ॥

প্রচলিত ছড়া:

অঙ্কনাতে গেল ঘোষ, মহিনাতে বসু,
বড়িশাতে রহিল মিত্র, দুঃখ রহে না কিছু ॥
বালিতে রহিলা দত্ত, প্রতাপ প্রচুর,
ব্রহ্মগ্রামে গেল সেন, দে-ও চিত্রপুর।
সিংহপুরে রায় সিংহ, হরিপুরে দাস।
পানিহাটিতে গত চন্দ্র, গুহ বঙ্গ বাস ॥

সিঙ্গুর গেটরা: প মেদিনীপুর
এই স্থানে একটি পুকুর খনন করার সময় লাল পাথরের একটি গৌরাঙ্গ মূর্তি পাওয়া যায়। অনেকে অনুমান করেন সিন্দূর বর্ণের গৌরাঙ্গ মূর্তিকে কেন্দ্র করেই স্থাননাম সিঙ্গুর গেটরা হয়েছে।

সিভক: দার্জিলিং
মূল লেপচা থেকে উদ্ভূত স্থাননাম। মূল লেপচায় স্থানটি সু-ভক্ নামে পরিচিত। অর্থ গতিশীল ঘনীভূত শীতল হাওয়া। এখানে তিস্তা নদী একটি পাহাড়ি খাদ থেকে ভীষণ বেগে সমতলে পতিত হয় বলে যে শীতল বায়ুবেগ উত্থিত হয় সেই সুবাদে স্থাননাম।

সিমলাপাল: বাঁকুড়া
প্রচলিত ছড়া:

বারো নদী তেরো খাল।
তবে পাবি সিমলাপাল ॥

সিয়ারকুল: বর্ধমান

প্রচলিত ছড়া:

খোস, পাচড়া, অম্লশূল।
এ তিন নিয়ে সিয়ারকুল ॥

সীতারামপুর: দ চব্বিশ পরগনা

স্থানীয় প্রাচীন জমিদার বংশের গৃহদেবতা সীতারামজিউর নামে স্থাননাম সীতারামপুর হয়েছে বলে জানা যায়।

সুখপুকুরিয়া: নদিয়া

এই স্থান সম্বন্ধে কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণীতে পাওয়া যায় :

সুখভোগ ইচ্ছায় বিরহে গঙ্গাকূলে।
বসতি করিতে স্থান খুঁজে খুঁজে বুলে ॥

সুখসাগর: নদিয়া

কথিত আছে, একসময় এই স্থানে গঙ্গা বহতা ছিল এবং মনোরম পরিবেশ ও স্বাস্থ্যকর বলে নদিয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এখানে মন্দিরাদি নির্মাণ করেন। এই কারণে স্থাননাম সুখসাগর হয়ে থাকবে। পরবর্তীকালে এই স্থানে ইংরেজদেরও স্বাস্থ্যনিবাস ছিল বলে জানা যায়। আদি সুখসাগর গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়ার পর গঙ্গার চরে নতুন জনপদ গড়ে উঠলে সুখসাগর নামেই পরিচিত হয়।

প্রচলিত ছড়া:

কে বলে আমার গোপাল বোঁচা?
সুখসাগরের মাটি এনে নাক করব সোজা।

সুগন্ধা: হুগলি

শোনা যায় মুঘলরাজত্বকালে জনৈক চিন্তামণি বসু ধন্বন্তরী চিকিৎসাবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতার জন্য সম্রাট জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে 'রায়' উপাধি এবং তিন শতাধিক বিঘা 'সুগন্ধা' জায়গির পান। সম্ভবত সেই কারণে স্থাননাম সুগন্ধা হয়েছে।

সুন্দরবন: দ চব্বিশ পরগনা

সুন্দরবন জঙ্গলের মধ্যে 'সুন্দরী' গাছের আধিক্য থাকায় সুন্দরবন নাম হয়েছে বলে অনেকে অনুমান করেন। অন্য মতে, সমুদ্র তীরবর্তী জঙ্গল থেকে সমুদ্র-বন বা সমুন্দর বন থেকে সুন্দরবন হয়েছে। সুন্দরবনের জঙ্গল এত দুর্ভেদ্য যে দিনের বেলাতেও তার মধ্যে দৃষ্টি চলে না। এই জঙ্গলে নানা রকম হিংস্র প্রাণী বাস করে, তার মধ্যে সুন্দরবনের 'কেঁদো' বাঘ বা 'রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার'-এর মতো হিংস্র জন্তু পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না। সুন্দরবনের নদী-নালা নরখাদক হিংস্র কুমিরের জন্য খ্যাত।

প্রচলিত ছড়া:

দোজবরের মাগ।
সোঁদরবনের বাঘ ॥

সুপুর: বীরভূম

পূর্বনাম স্বপুর, অপভ্রংশে সুপুর হয়েছে। কথিত আছে, পুরাণে উল্লিখিত রাজা সুরথ রাজ্যহারা হয়ে এখানে এসে তপস্যা করেন। (বোলপুর দেখুন)

সুবর্ণবেহার: নদিয়া

কথিত আছে, প্রাচীন কালে এই স্থানে সুবর্ণসেন নামে এক রাজার আধিপত্য ছিল। এক মতে সেই রাজার নামানুসারে স্থাননাম সুবর্ণবেহার হয়েছে। অন্য মতে, পূর্বে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাল রাজাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এক বৌদ্ধ বিহার ছিল এখানে। সেই জন্য স্থাননাম সুবর্ণবিহার থেকে সুবর্ণবেহার হয়েছে। আরও এক মতে একসময় এখানে সুবর্ণ নামে এক কুম্ভকার রাজা বাস করতেন। শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তিনি সপরিবারে তাঁর মাটির নির্মিত রাজভবনের নীচে এক নিরাপদ তলঘরে আশ্রয় নেন, কিন্তু দৈব দুর্ঘটনায় বেরোনোর পথ না পেয়ে সপরিবারে সমাহিত হন। সেই কুম্ভকার সুবর্ণ রাজার নাম থেকে স্থাননাম সুবর্ণবেহার হয়েছে।

সেকরাহাটি: হাওড়া

এক সময় এখানে কেবলমাত্র স্বর্ণকার বা সেকরাদের বসবাস ছিল বলে স্থাননাম সেকরাহাটি হয়েছে বলে অনুমিত। স্থানটি শঙ্করহাটি নামেও পরিচিত। শঙ্করহাটির অপভ্রংশ সেকরাহাটি নাম হওয়াও সম্ভব।

সেখদিঘি: মুর্শিদাবাদ

গৌড়রাজ হোসেন শাহ্ এই দিঘিটি খনন করেছিলেন বলে জানা যায়। কথিত আছে, দিঘি খনন করার পর জল না ওঠায় তিনি এক ফকিরের শরণাপন্ন হন। সেই ফকির তাঁর এক শিষ্যকে একটি লাঠি হাতে দিয়ে দিঘির মাঝখানে পুঁতে দিতে বলেন। সেই লাঠি দিঘির মাঝখানে পোঁতার সঙ্গে সঙ্গেই দিঘি জলে ভরে যায়। হোসেন শাহ্ সেই ফকির বা শেখের নামে দিঘির নাম রাখেন শেখদিঘি। কালক্রমে দিঘির পাড়ে জনবসতি গড়ে উঠলে স্থাননাম হয় সেখদিঘি।

সেন্‌চল: দার্জিলিং

মূল লেপচা থেকে উদ্ভূত নাম, অর্থ ভেপসা এবং কুয়াশাচ্ছন্ন পাহাড়। স্থানটি 'টাইগার হিল' নামে পরিচিত একটি প্রসিদ্ধ পর্যটনস্থল।

সেনরা: পুরুলিয়া

'সেনরাজ্য' থেকে অপভ্রংশে সেনরা হয়েছে বলে অনুমিত। একদা এই অঞ্চলে সেনরাজাদের আধিপত্যের বহু নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়।

সেরপুর: মুর্শিদাবাদ

কিংবদন্তি আছে, এই স্থানের সীমান্তবর্তী কোপাই নদীর তীরবর্তী জঙ্গল থেকে বের হয়ে প্রতিদিন একটি বাঘ প্রখ্যাত বৈষ্ণব সাধক ভগবান দাসের আশ্রমে এসে রাধাবিনোদ পুজোর প্রসাদ খেয়ে যেত। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে 'শের', অর্থাৎ বাঘ, থেকে সেরপুর স্থাননাম হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।

সৈদাবাদ: মুর্শিদাবাদ

নামকরণের কোনও ইতিহাস বা লৌকিক কথা জানা যায় না, কিন্তু স্থানটি ঐতিহাসিক। স্থানটি একদা আর্মেনিয়ান এবং পরে ফরাসিদের অধিকারে ছিল। ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে জারি করা অওরঙ্গজেবের একটি ফরমান থেকে জানা যায় যে আর্মেনিয়ানরা ওই সময় এখানে কুঠি স্থাপন করার অনুমতি পায়। পরে জায়গাটি ফরাসি অধিকারে এলে প্রখ্যাত ফরাসি জেনারেল ডুপ্লে এখানে কিছুদিন 'রেসিডেন্ট' ছিলেন। বর্ধিষ্ণু কাশিমবাজারের নৈকট্যের জন্য সেই সময় সৈদাবাদের যথেষ্ট ব্যবসায়িক গুরুত্ব ছিল বলে জানা যায়।

প্রচলিত ছড়া:

উলোর ভুঁয়ের ময়দা আর সৈদাবাদের ঘি,
শান্তিপুরের কড়াই এনে লুচি ভেজে দি ॥

সৈয়দপুর: দ দিনাজপুর
এখানে 'ঠাকুরপীর' নামে একটা আস্তানা আছে। কথিত আছে, স্থানটি পূর্বে কোনও হিন্দু 'ঠাকুরের' স্থান ছিল। পরে সৈয়দ বংশের কোনও মুসলমান পীর এখানে আস্তানা করেন এবং সেই কারণে আস্তানার নাম হয় 'ঠাকুর পীর'। সৈয়দবংশের পীরের অবস্থান বা আস্তানা থেকে স্থানের নাম সৈয়দপুর হয়েছে বলে অনুমিত।

সোনাজোল: হুগলি
এই স্থানের নামের উল্লেখ Khalimpur Grant of Dharmapal North-Central Bengal, 1st quarter of the 9th century-তে পাওয়া যায়।

সোনাতলা: হুগলি
প্রচলিত ছড়া:

কাঁড়াড়, করাতী, জোলা।
তিনে সোনাতলা ॥

(কাঁড়াড়— পদবি বিশেষ।
করাতী— কাঠ চেরাই শ্রমিক।)

সোনাদহ: বাঁকুড়া
পূর্বনাম সুবর্ণ হ্রদ। অপভ্রংশে সোনাদহ হয়েছে।

সোনাদা: দার্জিলিং
মূল লেপচা থেকে উদ্ভূত নাম। অর্থ ভালুকের গুম্ফা। শোনা যায় স্থানটি একদা বন্য জন্তুজানোয়ারে অধ্যুষিত ছিল।

সোনামুখী: বাঁকুড়া

সোনামুখী নামক স্থানীয় গ্রামদেবীর নামে স্থাননাম। শোনা যায়, এই দেবী মূর্তির নাক কালাপাহাড় ভেঙে দিয়েছিল। এখানকার রেশম বিখ্যাত।

প্রচলিত ছড়া:

সোনামুখী, মধুপুরী
ঢুকলে বেরাতে নারি ॥

* * *

মুখে বুলি, খাতায় বাকি।
বাড়ি তার সোনামুখী ॥

সোমড়া: হুগলি

সুকুমার সেন জানাচ্ছেন, সোম পদবিধারী ব্যক্তিদের পাড়া অথবা বেড়।

প্রচলিত ছড়া:

শান্তিপুর ডুবুডুবু
গুপ্তিপাড়া ভাসে।
সোনার সোমড়ার লোক,
দেখে দেখে হাসে।

হবিবপুর: নদিয়া

একসময় গঙ্গা তীরবর্তী এই স্থানে গোপেরা বাস করত এবং গঙ্গার চরাভূমিতে প্রচুর গবাদি পশু পালন করত। সেই কারণে স্থানটি দুগ্ধজাত দ্রব্য, দই, ছানা এবং বিশেষত ঘিয়ের জন্য খ্যাত ছিল। ঘিকে শুদ্ধ ভাষায় হব্বি বলে। সেই থেকে স্থানের নাম হয় হব্বিগঞ্জ, যা পরে অপভ্রংশে হবিবপুর হয়েছে। মুসলমানি নাম 'হবি' বা 'হাবাবির' সঙ্গে স্থাননামের কোনও যোগসূত্র পাওয়া যায় না।

হরগৌরীর মাঠ: নদিয়া

প্রচলিত ছড়া:

ওপারে জন্তি গাছটি, জন্তি বড় ফলে,
গো জন্তির মাথা খেয়ে প্রাণ কেমন করে।

প্রাণ করে আই ঢাই, গলা হল কাঠ,
কতক্ষণে যাব রে ভাই হরগৌরীর মাঠ ॥
হরগৌরীর মাঠেরে ভাই পাকা পাকা ধান,
পান কিনিলাম, চুন কিনিলাম
ননদ ভাজে খেলাম ॥

হরধাম: নদিয়া

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নদিয়া জেলার বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি প্রধান জনপদ স্থাপন করেন। হরধাম তার মধ্যে একটি। কৃষ্ণচন্দ্রের পঞ্চম পুত্র হরচন্দ্রের নামে স্থাননাম।

প্রচলিত ছড়া:

রাণাঘাট ছাড়ি আইলাম হরধাম,
যথায় বিরাজে এক রাজা গুণগ্রাম।
রক্তগন্ধ ফোঁটা ভালে উজ্জ্বল শরীর,
তাঁর রক্তে বহে কৃষ্ণচন্দ্রের রুধির ॥

হরিণঘাটা: নদিয়া

কথিত আছে, একসময় যমুনা নদী এখানে বহতা ছিল। তখন এখানকার জঙ্গলের হরিণেরা নদীর ঘাটে জল খেতে আসত বলে জানা যায়। সেই থেকে স্থাননাম হরিণঘাটা হয়েছে বলে অনুমিত।

হরিপাল: হুগলি

পূর্বনাম 'শমুল' বা 'সিমুলাই'। 'দিগ্বিজয় প্রকাশ' নামক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে এই নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। একদা এখানে হরিপাল নামে এক রাজার রাজধানী ছিল। পরবর্তীকালে সেই রাজার নাম অনুসারে স্থাননাম হরিপাল হয়।

হরিয়াতাড়া: প মেদিনীপুর

গ্রামদেবী হরিয়া বুড়ির নামানুসারে স্থাননাম হরিয়াতাড়া হয়েছে। আদ্যপদে 'তাড়া' শব্দ সম্ভবত 'বুড়ি' শব্দের অপভ্রংশ। সুকুমার সেন জানাচ্ছেন, তাড়া অর্থ গাছ। প্রাচীন বাংলা অর্থে।

হরিশঙ্করপুর: মুর্শিদাবাদ

অতীতে পদ্মা নদীর চরাভূমিতে জনবসতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে পূর্ববঙ্গ থেকে হরিশ ও শঙ্কর নামে দু'জন উদ্যোগী শূদ্র নেতা এখানে আসেন। জনবসতি স্থাপনের পর ওই দুই নেতার নামানুসারে হরিশঙ্করপুর স্থাননাম হয়।

হরিশচন্দ্রপুর: মালদহ

কিংবদন্তি অনুসারে এখানে মহাভারতে উল্লিখিত রাজা হরিশচন্দ্রের রাজধানী ছিল। সেই থেকেই স্থাননাম হরিশচন্দ্রপুর হয়েছে।

হলদিয়া: পূ মেদিনীপুর

পূর্বনাম 'হলদ্বীপ'। অপভ্রংশে 'হলদিয়া' হয়েছে। অর্থ, হালচাষের দ্বীপ। বর্তমানে এটি বন্দরশহর ও পেট্রোকেমিক্যাল কারখানার জন্য খ্যাত।

হাওড়া: হাওড়া

অনেকের মতে 'হাওড়' বা কর্দমাক্ত জলাভূমি থেকে হাওড়া নাম হয়েছে। এই অঞ্চলে জলমগ্ন নিম্নভূমি একসময় খুব বেশি ছিল বলে জানা যায়। ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে এই অঞ্চল একটি পৃথক জেলারূপে গঠিত হয়। তার আগে এই অঞ্চলটি কখনও বর্ধমান, কখনও হুগলি আবার কখনও বা চব্বিশ পরগনা ও নদিয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত রূপে দেখানো হত। কলকাতার সঙ্গে সর্বভারতের প্রধান যোগসূত্র হাওড়া রেলস্টেশন ভারতের প্রাচীন এবং সর্বপ্রধান রেলকেন্দ্র। হাওড়া রেলস্টেশন বর্তমানে 'হেরিটেজ' মর্যাদাভুক্ত।

প্রচলিত ছড়া:

মশা, মাছি, মাউড়া (হিন্দিভাষী)
এ তিন নিয়ে হাওড়া ॥

* * *

দিনাজপুরের কায়েত ভাল,
হাওড়ার ভাল শুঁড়ি।
পাবনার বৈষ্ণব ভাল,
ফরিদপুরের মুড়ি ॥

হাঁসখালি: নদিয়া

প্রচলিত ছড়া:

ইট, খোলা, টালি।
তিনে হাঁসখালি ॥

হাজিপুর: বাঁকুড়া

প্রচলিত ছড়া:

হাজিপুরের তাল-পাটালি
বাসুলডাঙ্গার খই।
ধামুয়ার রাঙা মুলো,
উলুবেড়ের দই ॥

* * *

হাজিপুরের কুকড়াঘাটি
চাল দেয় মুঠি মুঠি ॥

* * *

হাজিপুর, গাজীপুর মধ্যে খোলাখালী।
তার মধ্যে আছেন এক চামুণ্ডা-কালী ॥

হাটগোবিন্দগঞ্জ: হুগলি

প্রায় তিনশো বছর আগে গঙ্গায় জেলেদের জালে একটি সুন্দর শ্রীকৃষ্ণের প্রস্তরমূর্তি ওঠে। জেলেরা মূর্তিটিকে গঙ্গার তীরে একটি স্থানে রেখে নিকটবর্তী গ্রামের জমিদার রঘুনন্দন মিত্রমুস্তাফী মহাশয়ের কাছে খবর পাঠালে জমিদার মহাশয় সেই মূর্তিটি নিজের গ্রামে নিয়ে গিয়ে একটি মন্দির তৈরি করে প্রতিষ্ঠা করেন। গঙ্গাবক্ষ থেকে তুলে জেলেরা মূর্তিটিকে কিছুক্ষণের জন্য এই পল্লিতে রেখেছিল বলে জমিদার মহাশয় এই পল্লির নাম রাখেন 'গোবিন্দগঞ্জ'। পরবর্তীকালে ওই জমিদারের বংশধরেরা এখানে একটি বাজার বা হাট বসালে স্থানের নাম হয় হাট গোবিন্দগঞ্জ। (শ্রীপুর দেখুন)

হাড়িপুর: নদিয়া

বলরাম হাড়ি প্রবর্তিত লোকধর্ম বলরামী বা বলাহাড়ী থেকে স্থাননাম হয়েছে বলে অনুমিত।

হাড়োয়া: উ চব্বিশ পরগনা

প্রখ্যাত স্থানীয় পীর গোরাচাঁদ বা গোরাই গাজীর 'হাড়' থেকে স্থানের নাম হাড়োয়া হয়েছে বলে অনুমিত। এই পীরের সমাধি এবং সংলগ্ন মসজিদ সম্বন্ধে একটি কাহিনি আছে। পীরের সাবেক নাম শাহ্ সৈয়দ আব্বাস আলি রহমতুল্লা বরকতউল্লা। তিনি প্রায় ৬৮০ বছর আগে সুদূর আরব থেকে ধর্ম প্রচারের জন্য বাংলায় আসেন। বাংলায় তিনি গোরাচাঁদ পীর নামে খ্যাত হন কিন্তু এই নাম পরিবর্তনের কোনও যোগসূত্র জানা যায় না। কথিত আছে, একবার সুন্দরবন অঞ্চলের হাতিগড় এলাকার রাজার সঙ্গে ধর্মসংক্রান্ত বিবাদে জড়িত হলে ধর্মযুদ্ধে তিনি গুরুতর আহত হয়ে নিকটস্থ কুলটিবিহারী গ্রামে এক নির্জন স্থানে আশ্রয় নেন। সেখানে স্থানীয় কালু ঘোষ নামক এক গোয়ালার গোরুর পাল থেকে একটি গোরু রোজ সকলের অলক্ষ্যে পীর সাহেবকে নিজের বাঁট থেকে দুধ খাওয়াত। গোরুটির নিয়মিত ভাবে দুধ কম হয়ে যাওয়ায় একদিন কালু ঘোষ সেই গোরুর পেছন পেছন গিয়ে এই আশ্চর্য ঘটনা দেখে বিস্মিত হয়। পীর তখন কালু ঘোষকে জানান যে তাঁর শেষসময় উপস্থিত এখন সে যদি তাঁর স্বগ্রামে নিয়ে গিয়ে গোর দেয় তবে তাঁর আত্মার সদগতি হয়। করুণা পরবশ হয়ে কালু ঘোষ পীরকে তাঁর স্বগ্রামে নিয়ে গিয়ে যথারীতি কবরস্থ করে। হিন্দু হয়ে মুসলমানকে কবর দেওয়ায় কালু ঘোষ স্বজাতিদের কাছে তার বিধর্মী কাজের জন্য বিদ্রূপের পাত্র হয়ে ওঠে। কালু ঘোষ ওই বিদ্রূপের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে একদিন রোষবশে এক সঙ্গীকে হত্যা করে বসে। মামলা গৌড় রাজার দরবার পর্যন্ত পৌঁছায়। অবধারিত মৃত্যুদণ্ডের কথা ভেবে কালু ঘোষের স্ত্রী পীর সাহেবের কবরের কাছে গিয়ে তার স্বামীকে মৃত্যুদণ্ড থেকে বাঁচানোর জন্য প্রার্থনা জানায়। শোনা যায়, পীর সাহেব কবর থেকে উঠে গৌড়রাজের দরবারে গিয়ে স্বয়ং কালু ঘোষের প্রাণরক্ষার জন্য আবেদন করেন। গৌড়রাজ এই ঐশী দৃশ্য দেখে অভিভূত হয়ে কালু ঘোষের প্রাণদণ্ড মকুব করলেন তো বটেই, পীর সাহেবের গোরস্থানের নিকটেই একটি মসজিদ তৈরি করার আদেশ দেন এবং কালু ঘোষকে সেই মসজিদের প্রধান পুরোহিত নিযুক্ত করেন। কালু ঘোষ এবং তার বংশধরদের অবশ্য এখন আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায় না।

হাতিশালা: নদিয়া

প্রবাদ আছে এখানে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের হাতিশালা ছিল। সেই থেকে স্থাননাম হাতিশালা হয়েছে।

হাপানিয়া: নদিয়া

'হা-পানিয়া' কথা থেকে স্থাননাম হাপানিয়া হয়েছে বলে মনে করা হয়। 'হা' অনুশোচনার্থক শব্দ এবং 'পানিয়া' অর্থে জল বোঝায়। শোনা যায় এখানে যখন জনবসতি গড়ে ওঠে তখন এই অঞ্চলে তীব্র জলকষ্ট ছিল। কোনও নদী, খাল, বিল বা জলাশয় ছিল না। তাই 'হায়-পানি' থেকে কালক্রমে স্থাননাম হাপানিয়া হয়েছে।

হালিশহর: উ চব্বিশ পরগনা

পূর্বনাম হাবেলী শহর থেকে স্থাননাম। স্থানটি হালিশহর-কুমারহট্ট নামেও পরিচিত। (কুমারহট্ট দেখুন) পণ্ডিতজনের বাস বলে খ্যাত এই স্থানে শ্রীচৈতন্যদেবের দীক্ষাগুরু বাস করতেন বলে জানা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিখ্যাত ভক্তি-সংগীত রচয়িতা শক্তি-সাধক রামপ্রসাদ সেন হালিশহরে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রচলিত ছড়া:

উলুই (উলা) পাগল
গুপ্তিপাড়ার বাঁদর।
হালিশহরের তেঁদর ॥

হাসনহাটি: বর্ধমান

প্রচলিত ছড়া:

লাঠালাঠি ফাটাফাটি।
এই নিয়ে হাসনহাটি ॥

হিজড়ামোতা: নদিয়া

কিংবদন্তি আছে, একসময় এই অঞ্চলের কয়েকটি বাড়িতে ছেলে জন্মানোর পর হিজড়ার দল নাচগান করতে আসে। কিন্তু নাচগানের পর কোনও বাড়ি

থেকে বকশিশ না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ হিজড়ারা স্থান ত্যাগ করার আগে চতুর্দিকে মূত্রত্যাগ করে যায়, এই ঘটনা থেকেই স্থানের নাম হিজড়ামোতা হয়েছে বলে অনেকে অনুমান করেন।

হিজলী: পূ মেদিনীপুর

একসময়ে রূপনারায়ণ নদীর মুখ থেকে হুগলি নদীর দক্ষিণ তীর পর্যন্ত এলাকা হিজলী নামে পরিচিত ছিল। সম্ভবত হিজল গাছের বন থেকেই এই নাম হয়। পর্তুগিজরা প্রথমে এই অঞ্চলে আসে এবং তারপর এই অঞ্চলটি দিনেমার ও ইংরেজ অধিকারে আসে। তৎকালীন ইউরোপিয়ান নথিপত্রে স্থানটিকে বিভিন্ন নামে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন ইনঘি, এঞ্জেলি, হিঙ্গেলি, এনজেলিন, ইনজারলে, ইনজিলি, হিডজেলি, কেডজেলি এবং নেডজেলি।

প্রচলিত ছড়া:

হিজলী মণ্ডলে বৈকুণ্ঠ মহাশয়।
রসিকেন্দ্র চূড়ামণি যাহার হৃদয় ॥
শত শত সাধু সেবা করে নিরন্তর।
আপনা বিকাগ্রত্যা সাধু সেবে দৃঢ়তর ॥

হিলসামারী কালীটোলা: মালদহ

অতীতে স্থানটি গঙ্গাগর্ভে বিলীন ছিল। গঙ্গা সরে গেলে এখানে একটি 'ঢাব' থেকে যায়। ওই 'ঢাবে' প্রচুর ইলিশ মাছ পাওয়া যেত বলে লোকে স্থানটি ইলসামারী বা হিলসামারী 'ঢাব' বলত। পরে কালী মণ্ডল নামে এক ব্যক্তি এই ঢাবের কাছে প্রথম বসবাস আরম্ভ করে এবং ক্রমশ এখানে একটি জনপদ গড়ে ওঠে। কালীটোলা কথাটা উক্ত কালী মণ্ডলের নাম স্মরণে হিলসামারীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে স্থাননাম হিলসামারী কালীটোলা হয়েছে।

হুগলি: হুগলি

১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথম পর্তুগিজ বাণিজ্যতরী সপ্তগ্রাম বন্দরে নোঙর করে। সপ্তগ্রামের অল্প দূরে ১৫৩৭- ৩৮ সালে তারা 'পোর্টি পেকুইনা' নামে একটি পর্তুগিজ উপনিবেশ গড়ে তোলে যা পরে হুগলি নামে পরিচিত হয়। পর্তুগিজেরা 'গোলা'কে 'গোলিন' বলত। 'গোলিন' কথাটাই পরে অপভ্রংশে

হুগলি হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। অন্য মতে প্রাচীন কালে ভাগীরথী তীরে প্রচুর 'হোগলা' ঝাড় দেখা যেত। সেই 'হোগলা' থেকেই 'হুগলি' স্থাননাম হয়েছে বলে অনেকের বিশ্বাস। তৎকালীন ইংরেজি গ্রন্থাদিতে ও মানচিত্রে স্থানটি হুগলি, ওগোলি, ওগ্‌লি, গোলিন, ইউগাল, হাগলে, গোলি প্রভৃতি নামে উল্লিখিত হয়েছে। ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগিজরা সম্রাট আকবরের অনুমতি নিয়ে এখানে কুঠি স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে পর্তুগিজ জলদস্যুদের দমন করতে এসে মুঘল সৈন্যদের সঙ্গে পর্তুগিজদের তুমুল যুদ্ধ হয় যার ফলে অধিকাংশ পর্তুগিজ সৈন্যসামন্ত ও বাণিজ্য জাহাজ বিধ্বস্ত হয়ে যায়। সামান্য কিছু পর্তুগিজ সৈন্য জলপথে গোয়ায় পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচান। পর্তুগিজদের পতনের পর ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজরা হুগলিকুঠি স্থাপন করেন। এখানে ইংরেজরা ব্যবসায়ে বিশেষ সুবিধা করতে না পারায় এবং পরবর্তীকালে হুগলির মুসলমান ফৌজদারের সঙ্গে বিবাদের জন্য জব চার্নক হুগলি ত্যাগ করে সুতানুটিতে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করেন (কলিকাতা দেখুন)। বাংলার সর্বপ্রথম ছাপাখানা হুগলিতে স্থাপিত হয়। পঞ্চানন কর্মকার ও মনোহর দাসের সহযোগিতায় উইলকিন্স সাহেব এই ছাপাখানা স্থাপন করেন। ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে এই ছাপাখানায় হ্যালহেড সাহেবের বাংলা ব্যাকরণ ছাপা হয়। 'লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন' এই প্রবাদবাক্যের প্রসিদ্ধ দানবীর গৌরী সেন প্রায় সাড়ে তিনশো বছর আগে হুগলি শহরের অন্তর্গত বালি মহল্লায় জন্মগ্রহণ করেন।

প্রচলিত ছড়া:

পেটে ভাত নেই, মুখে বুলি।
তবে জানবি জেলা হুগলি ॥

* * *

মদ, মাগি, গুগলি।
এ তিন নিয়ে হুগলি ॥

* * *

মোগল, মিশি, মাথাঘষা।
তিন দেখতে হুগলি আসা ॥

হুগলির ভাল কোটাল, লেঠেল,
বীরভূমের ভাল খোল।
ঢাকের বাদ্যি থামলে ভাল,
বলো হরি হরিবোল ॥

* * *

ধান যোগায় মেদিনীপুর,
কলা যোগায় হুগলি।
খেজুর, আখের গুড় যোগায়,
ডোবা যোগায় গুগলি।

হুড়িনান: প মেদিনীপুর

গ্রামে অধিষ্ঠিত হুড়োশ্বরী গ্রামদেবীর নামানুসারে স্থাননাম হুড়িনান হয়েছে।

হেঙ্কেলগঞ্জ/হিঙ্গলগঞ্জ: উ চব্বিশ পরগনা

১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে যশোহর জেলাশাসক হেঙ্কেলসাহেব সুন্দরবন অঞ্চলে কৃষি উদ্যোগের জন্য 'সুপারিন্টেন্ডেন্ট' পদে নিযুক্ত হয়ে আসেন। তাঁর উদ্যোগে বন-জঙ্গল কেটে কৃষি উপযোগী ভূমি এবং জনপদ তৈরি করা হলে স্থানীয় লোকেরা স্থানটিকে হেঙ্কেলসাহেবের নামে হেঙ্কেলগঞ্জ নামে অভিহিত করে। কথিত আছে, জঙ্গল পরিষ্কার করার সময় অনেকবার বাঘের উপদ্রবের সম্মুখীন হতে হয় কিন্তু হেঙ্কেলসাহেবের নাম শুনে বাঘও নাকি পিছিয়ে যেত। পরবর্তীকালে সার্ভে রিপোর্টে লোকমুখে উচ্চারিত প্রচলিত নামানুসারে হিঙ্গলগঞ্জ নাম নথিভুক্ত করা হয়।

হোয়েড়া: হুগলি

'হোয়োড়া' ফারসি শব্দ, অর্থ বিড়াল। স্থাননামের সঙ্গে 'বিড়াল'-এর যোগসূত্র অস্পষ্ট।

পরিশিষ্ট— ক

একই নামের একাধিক স্থাননাম

বাংলায় বিভিন্ন জায়গায় একই নামে অনেক অনেক স্থান আছে। স্থান বিশেষে একই নামের পেছনে বিভিন্ন গল্প-গাথা বা ইতিহাস থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু সেই তথ্য অনুসন্ধান সাপেক্ষ। কৌতূহলী পাঠকের জন্য এখানে বিভিন্ন জেলায় একই নামে একাধিক স্থাননামের কিছু উদাহরণ দেওয়া হল। প্রদত্ত প্রতিটি গ্রামের সংখ্যা নির্দেশিত জেলাগুলি থেকে সংগৃহীত নামের সমষ্টি বিশেষ। বিশদভাবে অনুসন্ধান করলে এই সংখ্যার পরিবর্ধন বা পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

অনন্তপুর: ২৫
চব্বিশ পরগনা, দিনাজপুর, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বীরভূম, মালদহ, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি।

আলীপুর: ২৫
চব্বিশ পরগনা, দিনাজপুর, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদহ, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি।

আসনবনী: ২০
পুরুলিয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর।

কমলপুর: ৫২
চব্বিশ পরগনা, দার্জিলিং, দিনাজপুর, নদিয়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি।

কল্যাণপুর: ৩০
চব্বিশ পরগনা, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি।

কলিকাপুর: ৩২
চব্বিশ পরগনা, দিনাজপুর, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হাওড়া।

কাশীপুর: ৩০
চব্বিশ পরগনা, দিনাজপুর, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি।

[illegible]: ২১
বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর।

কৃষ্ণপুর: ৫৬
কুচবিহার, চব্বিশ পরগনা, দিনাজপুর, নদিয়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হুগলি।

কৃষ্ণনগর: ৫০
চব্বিশ পরগনা, দিনাজপুর, নদিয়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি।

খয়েরবনী: ২১
পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর।

খাঁপুর: ৩০
চব্বিশ পরগনা, দিনাজপুর, নদিয়া, বর্ধমান, বীরভূম, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি।

গোপালনগর: ৩৮
চব্বিশ পরগনা, দিনাজপুর, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হুগলি।

গোপালপুর: ১৪২
কুচবিহার, চব্বিশ পরগনা, দিনাজপুর, নদিয়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি।

গোবিন্দপুর: ১০৬
কুচবিহার, চব্বিশ পরগনা, দিনাজপুর, নদিয়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, মালদহ, মেদিনীপুর।

গোপীনাথ: ৬২
চব্বিশ পরগনা, দিনাজপুর, নদিয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি।

চণ্ডীপুর: ৫৮
চব্বিশ পরগনা, দিনাজপুর, নদিয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হাওড়া।

চন্দনপুর: ২৬
চব্বিশ পরগনা, দিনাজপুর, নদিয়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর, হুগলি।

চাঁদপুর: ৫১
চব্বিশ পরগনা, দিনাজপুর, নদিয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি।

চাঁদবিলা: ২৬
বাঁকুড়া, মেদিনীপুর।

জগদীশপুর: ২৪
চব্বিশ পরগনা, দিনাজপুর, নদিয়া, বর্ধমান, বীরভূম, মালদহ, মেদিনীপুর, হাওড়া।

জগন্নাথপুর: ৭০
চব্বিশ পরগনা, দিনাজপুর, নদিয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি।

জয়কৃষ্ণপুর: ৩০
চব্বিশ পরগনা, নদিয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি।

জয়পুর: ২৯
চব্বিশ পরগনা, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, নদিয়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি।

জামবনী: ২৭
পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর।

তেঁতুলিয়া: ৩১
চব্বিশ পরগনা, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হুগলি।

দামোদরপুর: ৩৬
কুচবিহার, দিনাজপুর, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি।

দুর্গাপুর: ৬২
চব্বিশ পরগনা, দিনাজপুর, নদিয়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বীরভূম, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হুগলি।

দেবীপুর: ২৮
চব্বিশ পরগনা, দিনাজপুর, নদিয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি।

ধরমপুর: ৩০
দিনাজপুর, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হুগলি।

ধর্মপুর: ৩৩
কুচবিহার, চব্বিশ পরগনা, নদিয়া, বর্ধমান, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি।

নবগ্রাম: ৩৬
চব্বিশ পরগনা, দিনাজপুর, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, হুগলি।

নারায়ণপুর: ৭০
চব্বিশ পরগনা, দিনাজপুর, নদিয়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি।

নিশ্চিন্তপুর: ৪৭
চব্বিশ পরগনা, দিনাজপুর, নদিয়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি।

পাহাড়পুর: ২৫
জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, নদিয়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হুগলি।

পারুলিয়া: ৩১
চব্বিশ পরগনা, নদিয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর।

পুরুষোত্তমপুর: ৩৭
চব্বিশ পরগনা, দিনাজপুর, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হুগলি।

প্রতাপপুর: ৩৫
দিনাজপুর, নদিয়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি।

ফতেপুর: ৫১
চব্বিশ পরগনা, দিনাজপুর, নদিয়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি।

বনকাটি: ৩৪
পুরুলিয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদহ, মেদিনীপুর।

বলরামপুর: ৭৬
কুচবিহার, চব্বিশ পরগনা, দিনাজপুর, নদিয়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি।

বসন্তপুর: ৩০
কুচবিহার, দিনাজপুর, নদিয়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি।

বাসুদেবপুর: ৬৪
চব্বিশ পরগনা, দিনাজপুর, নদিয়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি।

বাহাদুরপুর: ৩৩
চব্বিশ পরগনা, দিনাজপুর, নদিয়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হুগলি।

বিষ্ণুপুর: ৩৯
চব্বিশ পরগনা, দিনাজপুর, নদিয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হুগলি।

বৃন্দাবনপুর: ৩০
চব্বিশ পরগনা, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি।

বৈকুণ্ঠপুর: ২৭
কুচবিহার, চব্বিশ পরগনা, দিনাজপুর, নদিয়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি।

ভগবানপুর: ২৯
চব্বিশ পরগনা, দিনাজপুর, নদিয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি।

ভবানীপুর: ৫২
চব্বিশ পরগনা, দিনাজপুর, নদিয়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি।

মথুরাপুর: ২৭
চব্বিশ পরগনা, দিনাজপুর, নদিয়া, বর্ধমান, বীরভূম, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর।

মধুপুর: ৪০
কুচবিহার, চব্বিশ পরগনা, দিনাজপুর, নদিয়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হুগলি।

মনোহরপুর: ৩১
চব্বিশ পরগনা, দিনাজপুর, নদিয়া, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি

মহম্মদপুর: ২৯
চব্বিশ পরগনা, দিনাজপুর, বীরভূম, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হুগলি।

মহেশপুর: ৫৭
চব্বিশ পরগনা, দিনাজপুর, নদিয়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি।

মাধবপুর: ৫৩
চব্বিশ পরগনা, দিনাজপুর, নদিয়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি।

মামুদপুর: ২৯
চব্বিশ পরগনা, দিনাজপুর, বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হুগলি।

মীর্জাপুর: ৪১
চব্বিশ পরগনা, দিনাজপুর, নদিয়া, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, বর্ধমান, া, বীরভূম, হুগলি।

মুকুন্দপুর: ৪৪
চব্বিশ পরগনা, দিনাজপুর, নদিয়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি।

মোহনপুর: ৫৬
কুচবিহার, চব্বিশ পরগনা, দিনাজপুর, নদিয়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হুগলি।

রঘুনাথপুর: ৮৮
চব্বিশ পরগনা, দিনাজপুর, নদিয়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি।

রতনপুর: ৩৩
কুচবিহার, চব্বিশ পরগনা, দিনাজপুর, নদিয়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি।

রসুলপুর: ২২
চব্বিশ পরগনা. দিনাজপুর, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হুগলি।

রাউতাড়া: ২৮
চব্বিশ পরগনা, দিনাজপুর, নদিয়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি।

রাধানগর: ৫৩
চব্বিশ পরগনা, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, নদিয়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি।

রাধাবল্লভপুর: ২৫
চব্বিশ পরগনা, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হুগলি।

রামকৃষ্ণপুর: ৩০
চব্বিশ পরগনা, দিনাজপুর, নদিয়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর।

রামচন্দ্রপুর: ৮০
চব্বিশ পরগনা, দিনাজপুর, নদিয়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি।

রামনগর: ৫৯
চব্বিশ পরগনা, নদিয়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি।

রামপুর: ৭০
কুচবিহার, চব্বিশ পরগনা, দিনাজপুর, নদিয়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি।

রায়পুর: ৩০
চব্বিশ পরগনা, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, নদিয়া, বর্ধমান, বীরভূম, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হুগলি।

লক্ষ্মীপুর: ২৬
চব্বিশ পরগনা, দিনাজপুর, নদিয়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বীরভূম, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, হুগলি।

শংকরপুর: ৩২
চব্বিশ পরগনা, দিনাজপুর, নদিয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হুগলি।

শালবনী: ২৭
পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর।

শিবপুর: ৪৩
কুচবিহার, চব্বিশ পরগনা, দিনাজপুর, নদিয়া, বর্ধমান, বীরভূম, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি।

শিমুলিয়া: ৩৩
চব্বিশ পরগনা, নদিয়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর।

শেরপুর: ২৬
চব্বিশ পরগনা, দিনাজপুর, নদিয়া, বর্ধমান, বীরভূম, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি।

শ্যামপুর: ৫২
চব্বিশ পরগনা, দিনাজপুর, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি।

শ্যামসুন্দরপুর: ৪০
চব্বিশ পরগনা, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হুগলি।

শ্রীকৃষ্ণপুর: ২৮
চব্বিশ পরগনা, দিনাজপুর, নদিয়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি।

শ্রীপুর: ২৬
চব্বিশ পরগনা, দিনাজপুর, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হুগলি।

শ্রীরামপুর: ৭৩
চব্বিশ পরগনা, দিনাজপুর, নদিয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি।

সন্তোষপুর: ২৮
কুচবিহার, চব্বিশ পরগনা, নদিয়া, বর্ধমান, বীরভূম, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি।

সাহাপুর: ৪৬
চব্বিশ পরগনা, দিনাজপুর, নদিয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি।

সুলতানপুর: ২৮
চব্বিশ পরগনা, দিনাজপুর, নদিয়া, বর্ধমান, বীর , মালদহ, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি।

হরিপুর: ৫৭

কুচবিহার, চব্বিশ পরগনা, দিনাজপুর, নদিয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হুগলি।

হরিহরপুর: ৩১

চব্বিশ পরগনা, দিনাজপুর, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, মালদহ, মেদিনীপুর, হুগলি।

হোসেনপুর: ২১

চব্বিশ পরগনা, দিনাজপুর, নদিয়া, বর্ধমান, বীরভূম, মালদহ, মেদিনীপুর, হুগলি।

দ্রষ্টব্য:

মেদিনীপুর পূর্ব ও পশ্চিম এবং চব্বিশ পরগনা ও দিনাজপুর উত্তর ও দক্ষিণ উভয় ক্ষেত্রে একত্রিত সংখ্যা দেওয়া হয়েছে।

পরিশিষ্ট— খ

বিচিত্র এবং শ্রুতিমধুর স্থাননাম

এখানে কিছু বিচিত্র এবং শ্রুতিমধুর স্থাননামের উদাহরণ দেওয়া হল। স্থানীয় কিংবদন্তি বা গাথা থেকে এই সব নামের উৎপত্তি হয়েছে বলে অনুমিত। অনেকে মনে করেন এই সব বিচিত্র নাম অধিকাংশই 'অস্ট্রিক' গোষ্ঠীভুক্ত।

অকাল পৌষ: বর্ধমান ও মেদিনীপুর
অকাল মেঘ: চব্বিশ পরগনা
অলংকার: মুর্শিদাবাদ

আউলবালি: হুগলি
আউস: দিনাজপুর ও বর্ধমান
আঁসফল: হুগলি
আকন্দ: মালদহ ও মেদিনীপুর
আটাত্তর: মেদিনীপুর
আঠাশ: দিনাজপুর
আতাই: মুর্শিদাবাদ
আতুসী: বর্ধমান
আধলা: চব্বিশ পরগনা
আমকলা: মেদিনীপুর
আমদই: মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া
আলতাগ্রাম: জলপাইগুড়ি
আলোকঝারি: কুচবিহার ও দার্জিলিং
আহ্লাদপুর: বর্ধমান

ইঁদুরডাঙ্গা: মেদিনীপুর
ইটমারা: বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর
ইনদাবিন্দা: বাঁকুড়া

উইপোকা: মেদিনীপুর
উচ্ছাখালি: চব্বিশ পরগনা
উজলমালিক: মুর্শিদাবাদ
উপলদহ: মেদিনীপুর
উলটা: মেদিনীপুর

ঊষা: বর্ধমান

এগরা: মেদিনীপুর
এগরো: বর্ধমান
এড়োন্ত: পুরুলিয়া

কইকালা: হুগলি
কঙ্কণকিয়ারি: পুরুলিয়া
কচুখালি: চব্বিশ পরগনা
কড়কড়া: পুরুলিয়া
কড়াই: দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ
কদমা: মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, দিনাজপুর
কবুতরখোপি: দিনাজপুর
করঞ্জলি: চব্বিশ পরগনা
করঞ্জা: মালদহ, মেদিনীপুর
কর্জডাঙ্গা: মালদহ
কলকলি: মুর্শিদাবাদ
কলমিখালি: মুর্শিদাবাদ
কলস: চব্বিশ পরগনা
কলসী: দিনাজপুর, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর
কাঁকড়ি ঝরনা: বাঁকুড়া, মেদিনীপুর
কাঁকুড়িয়া: মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হুগলি
কাঁচাখাওয়া: জলপাইগুড়ি
কাঁসাচোরা: বাঁকুড়া
কাজলা: দিনাজপুর
কানকাটা: বাঁকুড়া
কানা: পুরুলিয়া
কানীবামনী: নদিয়া, বর্ধমান
কালপেঁচী: মালদহ
কালিন্দী: মেদিনীপুর
কাসুন্দীপাড়া: হুগলি
কুকড়াখুপি: মেদিনীপুর
কুঞ্জনে: বাঁকুড়া, হুগলি
কুন্দপুষ্করিণী: বাঁকুড়া
কুমড়া: দিনাজপুর, চব্বিশ পরগনা, পুরুলিয়া
কুর্সি: নদিয়া
কুলরাখি: মেদিনীপুর
কুসুমগ্রাম: বর্ধমান
কৃষ্ণপ্রিয়া: মেদিনীপুর
কেতকী: মেদিনীপুর
কেলেমেলে: বাঁকুড়া
কোঠকলা: দিনাজপুর
কৌতুকপুর: নদিয়া
ক্ষীরগ্রাম: বর্ধমান

খড়খড়ি: বাঁকুড়া
খড়মপুর: চব্বিশ পরগনা, বর্ধমান, মালদহ
খনখুন্যা: মেদিনীপুর
খন্তি: দিনাজপুর
খয়রা: পুরুলিয়া, মুর্শিদাবাদ, হাওড়া
খয়েরপাড়া: জলপাইগুড়ি
খাঁদারামী: বাঁকুড়া, মেদিনীপুর
খাটগ্রাম: বাঁকুড়া, হুগলি
খাড়ু: চব্বিশ পরগনা, হুগলি
খাসাবস: কুচবিহার
খেমটা: বর্ধমান
খেলনা: মেদিনীপুর
খোশবাসপুর: মুর্শিদাবাদ

গগনা: মেদিনীপুর
গড়গড়া: বীরভূম
গণ্ডগোল: দার্জিলিং

গনগনি: মেদিনীপুর
গরুবাসা: কুচবিহার
গাড্ডা: মুর্শিদাবাদ
গুড়গুড়িয়া: মালদহ
গুহরা: মেদিনীপুর
গোমুতা: মেদিনীপুর

ঘটপাতিলা: চব্বিশ পরগনা
ঘটিডুবা: মেদিনীপুর
ঘটিহারা: চব্বিশ পরগনা
ঘুনঘনি: মেদিনীপুর
ঘৃতগ্রাম: মেদিনীপুর
ঘোড়াডাল: চব্বিশ পরগনা
ঘোল: মেদিনীপুর
ঘোলা: চব্বিশ পরগনা, হাওড়া

চকচকি: দিনাজপুর, বাঁকুড়া
চঞ্চলী: বীরভূম
চন্দনপিঁড়ি: চব্বিশ পরগনা
চন্দ্রমণিপুর: বাঁকুড়া
চম্পকলতা: নদিয়া
চাঁদকাটি: মুর্শিদাবাদ
চাঁদা: চব্বিশ পরগনা, নদিয়া, বর্ধমান, বীরভূম, মেদিনীপুর, হুগলি
চাপাটি: পুরুলিয়া
চামরদানি: মুর্শিদাবাদ
চালুন: দিনাজপুর
চিঁড়া: দিনাজপুর, হুগলি
চিকনমাটি: জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং
চিতিড়ী: পুরুলিয়া
চিত্রশালী: চব্বিশ পরগনা
চিত্রা: পুরুলিয়া, মেদিনীপুর
চিমটা: চব্বিশ পরগনা
চুচুরমুচুর: দার্জিলিং
চেঁচাইচণ্ডী: মালদহ
চৈতা: চব্বিশ পরগনা, মালদহ, মেদিনীপুর
চৈতালী: বাঁকুড়া
চোঙ্গাবেঙ্গা: মেদিনীপুর
চোরাফুল: বাঁকুড়া
চৌকা: মেদিনীপুর
চৌরালি: চব্বিশ পরগনা

ছত্তিশ: দিনাজপুর
ছত্রপুর: মুর্শিদাবাদ
ছত্রাক: মালদহ
ছাতাতলা: বাঁকুড়া
ছাত্রলিয়া: বাঁকুড়া
ছিপি: দিনাজপুর
ছিয়াশি: দিনাজপুর
ছিলিমপুর: দিনাজপুর, মালদহ
ছুঁচিয়া: নদিয়া
ছুরিমারা: মেদিনীপুর
ছোলাখালি: মেদিনীপুর

জবা: নদিয়া
জলজলা: বাঁকুড়া
জলবিন্দু: মেদিনীপুর
জাড়া: মেদিনীপুর
জামতালগাড়া: মেদিনীপুর

জামাইপোতা: বর্ধমান
জীরাপাড়া: মেদিনীপুর
জেঠাগেড়ে: মেদিনীপুর
জোলকোল: হুগলি

ঝগড়াডি: পুরুলিয়া
ঝরনাকোচা: পুরুলিয়া
ঝাঁঝরা: বর্ধমান, মালদহ
ঝালঝলি: কুচবিহার
ঝাড়ুবাটি: বর্ধমান
ঝিঙ্গা: চব্বিশ পরগনা
ঝিলিমিলি: বাঁকুড়া, মেদিনীপুর

তিড়িং: বাঁকুড়া
তিপ্পান্ন: মেদিনীপুর
তিলখোঁজা: মেদিনীপুর
তিলুরি: বাঁকুড়া
তুলসীঘাট: চব্বিশ পরগনা
তেলকুলি: পুরুলিয়া

থিলবিল: দিনাজপুর

দুগ্ধ: পুরুলিয়া
দুধকলা: নদিয়া
দুধেবুদে: মেদিনীপুর
দোলাচোলা: মালদহ
দো'শো: দিনাজপুর

ধপধপি: চব্বিশ পরগনা
ধরাজুড়ি: মেদিনীপুর
ধরাশাই: মেদিনীপুর
ধাপধাড়া: বীরভূম, হুগলি
ধামাখালি: চব্বিশ পরগনা
ধুতুরা: দিনাজপুর
ধুলাগড়: হাওড়া

ননীকলা: বাঁকুড়া
নন্দাই: বর্ধমান
নবঘনপুর: বর্ধমান
নবনী: কুচবিহার
নবীনা: হুগলি
ন'হাজারী: চব্বিশ পরগনা
নাগবাঙ্গানী : কুচবিহার
নাগরডাঙ্গা: হুগলি
নাগরা: পুরুলিয়া, মালদহ, মেদিনীপুর
নাড়ুখাকী: মুর্শিদাবাদ
নাতনী: চব্বিশ পরগনা
নাদাডাঙ্গা: চব্বিশ পরগনা
নানাগঞ্জ: নদিয়া
নাপিতচক: মেদিনীপুর
নামছাড়া: বাঁকুড়া
নামোড়ি: পুরুলিয়া
নারি: বর্ধমান
নিকারঘাটা: চব্বিশ পরগনা
নিজদন্ত: মেদিনীপুর
নিপপলাশী: বীরভূম
নিশাপুর: চব্বিশ পরগনা
নুনবাড়: মেদিনীপুর
নুনুবৈরাগী: দার্জিলিং
নেংটিছাড়া: দার্জিলিং

নোনাঘোলা: চব্বিশ পরগনা

পরাগ: বর্ধমান
পরোটা: বীরভূম
পলতা: চব্বিশ পরগনা, বর্ধমান, মেদিনীপুর
পাঁকানানি: মেদিনীপুর
পাখিহাগা: কুচবিহার
পাচ্ছিপাড়া: মুর্শিদাবাদ
পাটতেঁতুল: মেদিনীপুর
পাতিপাড়া: বর্ধমান
পানপাড়া: চব্বিশ পরগনা, দিনাজপুর, নদিয়া, বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর
পান্তাবাড়ি: কুচবিহার, দার্জিলিং
পায়ড়াউড়া: মেদিনীপুর, হুগলি
পারিজাতপুর: মেদিনীপুর
পালঙ্গপুর: মেদিনীপুর
পিঠা: হুগলি
পিয়ারা: চব্বিশ পরগনা
পিয়ালসোল: পুরুলিয়া
পিরিতচক: বাঁকুড়া
পুটপুটে: মেদিনীপুর
পেঁচাআড়া: পুরুলিয়া, বাঁকুড়া
পেটভাতমাগপালা: কুচবিহার
পৌষশিউলি: মেদিনীপুর
প্রচণ্ডপুর: বীরভূম
প্রজাপাড়া: বীরভূম
প্রেমগঞ্জ: বর্ধমান

ফাজিলপুর: চব্বিশ পরগনা, দিনাজপুর, বীরভূম
ফুটিগোদা: চব্বিশ পরগনা
ফুরফুরা: হুগলি
ফুলুই: হুগলি
ফুলঝুরি: বর্ধমান
ফুলমতী: বাঁকুড়া
ফুলসুন্দরী: মেদিনীপুর

বউঘোলা: চব্বিশ পরগনা
বউঠাকুরানী: চব্বিশ পরগনা
বনশ্রীগৌরী: মেদিনীপুর
বরণডালা: বর্ধমান
বর্ষা: মেদিনীপুর
বসন্ত: দিনাজপুর, বীরভূম
বসুধা: বর্ধমান
বহিন: দিনাজপুর
বহুরূপা: মেদিনীপুর
বাঁদরগাছ: দার্জিলিং
বাঁশি: বাঁকুড়া
বাজু: মেদিনীপুর
বাটিঘরা: মেদিনীপুর
বাতাসপুর: বীরভূম, বর্ধমান, মেদিনীপুর
বাদশা: বর্ধমান, হুগলি
বাবলা: বর্ধমান, মেদিনীপুর, মালদহ, হুগলি
বালা: মেদিনীপুর
বাসনচক: মেদিনীপুর
বাহানা: মেদিনীপুর, হুগলি

বাহুল্য: মেদিনীপুর
বিকালচক্: মেদিনীপুর
বিছুটি: মুর্শিদাবাদ
বিড়ালগড়িয়া: পুরুলিয়া
বিরহিণী: দিনাজপুর
বিরহী: নদিয়া
বিলাত: মেদিনীপুর
বুবিবুড়ি: বাঁকুড়া
বৃদ্ধাপাড়া: বর্ধমান
বেগারখাটা: কুচবিহার
বেগুনকোদর: পুরুলিয়া
বেঙা: বর্ধমান, হুগলি
বেদিয়াপোতা: চব্বিশ পরগনা
বেলুন: মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হুগলি
বেসমটাঁড়া: পুরুলিয়া
বৈঁচি: হুগলি
বোগলাহাসি: মালদহ
ব্যাংমুতা: মেদিনীপুর

ভাইনগর: মেদিনীপুর
ভাঙ্গাগড়া· মেদিনীপুর
ভাতখাওয়া: জলপাইগুড়ি
ভাতার: বর্ধমান
ভাদর: মালদহ
ভানুকুমারী: কুচবিহার
ভিনভিনা: বর্ধমান
ভুতভুতি: মেদিনীপুর
ভুবনখালি: চব্বিশ পরগনা
ভুবনমঙ্গলপুর: মেদিনীপুর
ভূতশহর: বাঁকুড়া
ভেটকি: চব্বিশ পরগনা
ভোজপুর: বর্ধমান
ভোমরা: দিনাজপুর
ভ্রমরকোল: বীরভূম

মনসুখা: মেদিনীপুর
মনোহরা: দিনাজপুর
মন্তাপাড়া: দিনাজপুর
মন্দ্রা: চব্বিশ পরগনা, বর্ধমান, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, হুগলি
মধুরকোল: মুর্শিদাবাদ
ময়দা: চব্বিশ পরগনা
ময়না: চব্বিশ পরগনা, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, মালদহ
ময়ূরনাচনা: বাঁকুড়া
মরিচকাটা: বর্ধমান
মরিচবাড়ি: কুচবিহার
মরালী: বীরভূম
মর্যাদা: বর্ধমান
মলয়া: চব্বিশ পরগনা
মশলা: মুর্শিদাবাদ
মশাগ্রাম: বর্ধমান, মেদিনীপুর
মসুরিয়া: হুগলি
মহুগ্রাম: দিনাজপুর, বীরভূম
মাইয়া: মুর্শিদাবাদ
মাকালতলা: পুরুলিয়া
মানিকহীরা: চব্বিশ পরগনা
মামাভাগিনা: চব্বিশ পরগনা
মালসা: বীরভূম
মালিকা: নদিয়া

মাসীআড়া: বাঁকুড়া, হাওড়া
মিরগী: বাঁকুড়া
মিস্টারপাড়া: মালদহ
মুগকল্যাণ: হাওড়া
মুচিপাড়া: মেদিনীপুর
মুড়িশাই: মেদিনীপুর
মুনতিকাটি: মেদিনীপুর
মেঘরাজপুর: মেদিনীপুর
মোয়ামারি: কুচবিহার

যবনীকাটা: মেদিনীপুর
যমদুয়ার: পুরুলিয়া

রঙমহল: হাওড়া
রত্নমালা: মেদিনীপুর
রন্ধনীপাড়া: দিনাজপুর
রসুনচক: মেদিনীপুর
রাগপুর: মেদিনীপুর, হুগলি
রুপাহার: দিনাজপুর
রোদনপুর: মেদিনীপুর

লঙ্কা: পুরুলিয়া
লতাঝরনা: পুরুলিয়া
লবঙ্গ: চব্বিশ পরগনা
লাবনী: মেদিনীপুর
লোটাভাঙ্গা: মালদহ

শঙ্খহার: মেদিনীপুর
শতখণ্ড: দিনাজপুর
শর্বরী: নদিয়া, পুরুলিয়া, মালদহ

শাঁখা: পুরুলিয়া
শাঁখাখুলিয়া: মেদিনীপুর
শাগপাড়া: মেদিনীপুর
শালাগ্রাম: পুরুলিয়া
শালীপুর: চব্বিশ পরগনা
শিউলি: বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর
শীলা: বর্ধমান
শুকুরপুকুর: মুর্শিদাবাদ
শেফালিকাচন্দন: দিনাজপুর
শ্রাবনড়ি: পুরুলিয়া

ষাঁড়ধরা: মেদিনীপুর
ষাটঘরিয়া: কুচবিহার

সত্তর: বর্ধমান
সন্ধ্যাজল: বীরভূম
সরা: বাঁকুড়া
সন্তানগর: মেদিনীপুর
সহস্র: দিনাজপুর
সাঁড়াশিপুর: মেদিনীপুর
সাতবিশ: চব্বিশ পরগনা
সাতভাইয়া: চব্বিশ পরগনা
সানকিবেড়িয়া: চব্বিশ পরগনা
সাপকাটা: মেদিনীপুর
সাহসপুর: দিনাজপুর, মেদিনীপুর
সিঁদুরটোপা: বীরভূম
সিঁদুরমুছি: দিনাজপুর
সিঙ্গি: চব্বিশ পরগনা, বর্ধমান, বীরভূম
সিজগ্রাম: চব্বিশ পরগনা, মুর্শিদাবাদ

সুগন্ধা: হুগলি
সুজল: দিনাজপুর
সুন্দরিকা: চব্বিশ পরগনা
সুদপুর: বর্ধমান
সুরা: বর্ধমান
সুর্মনগর: বাঁকুড়া
সোনাকোপা: চব্বিশ পরগনা
সোনাচোরা: বর্ধমান
সোহাগপুর: মেদিনীপুর
স্থিরপাড়া: চব্বিশ পরগনা

হড়হড়িয়া: মুর্শিদাবাদ
হদহদি: মেদিনীপুর
হলহলি: মেদিনীপুর
হল্মাপুর: পুরুলিয়া
হাঁটুভাঙ্গা: নদিয়া
হাঁড়িডাঙ্গা: বাঁকুড়া, মেদিনীপুর
হাঁসডিমা: পুরুলিয়া
হাজার: বীরভূম
হাড়ভাঙ্গি: চব্বিশ পরগনা
হাতা: চব্বিশ পরগনা
হাতিন্দা: মালদহ
হাণ্ডিডাঙ্গা: মেদিনীপুর
হালুয়া: মালদহ
হিজল: মুর্শিদাবাদ
হিড়হিড়া: দার্জিলিং
হিসাবি: চব্বিশ পরগনা
হেলেঞ্চা: চব্বিশ পরগনা, নদিয়া
হোগলা: চব্বিশ পরগনা, মালদহ, মেদিনীপুর

[স্থাননামগুলি বেশ কিছু পুরনো ডকুমেন্ট এবং গ্রন্থ থেকে সংকলন করা হয়েছে। সুস্পষ্ট তথ্যের অভাবে মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগনা এবং দিনাজপুরের ক্ষেত্রে বিভক্ত এলাকার নির্দেশ দেওয়া সম্ভব হল না।]

পরিশিষ্ট— গ

অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ইত্যাদি শব্দের স্থাননাম

অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ইত্যাদি শব্দের দ্বারা প্রভাবিত বাংলা স্থাননামের কিছু উদাহরণ এখানে দেওয়া হল।

আড়া/আড়ি— অস্ট্রিক, অর্থে উঁচু ডাঙা জমিতে বসতি। উদাহরণ— বাঁদীআড়া: বাঁকুড়া, বামুনআড়ি: বর্ধমান

কুণ্ডা/কুণ্ড/ কুণ্ডী— তেলেগু 'কোন্ডা', (Telegu 'Konda') অর্থে ছোট পাহাড়, পাথর (hill, rock)। উদাহরণ— টুকনিয়া কুণ্ড: চব্বিশ পরগনা, তুষকুণ্ডা: বীরভূম, খলিসাকুণ্ডী: নদিয়া

গুড়া/গুড়ি—দ্রাবিড় 'গাড্ডা' 'গড্ডি', (Dravidian 'gadda' 'gaddı') তেলুগু 'গাড্ডা' (Telegu gadda), কন্নড়, 'গাড্ডে' (Kannada, gadde) অর্থে পিণ্ড, তাল, ডেলা, নদীতীর, কিনারা, ধার (lump, mass, clot, bank, brink, edge)। উদাহরণ—জলপাইগুড়ি, শিমুলগুড়ি: জলপাইগুড়ি।

চো/চু/চা/চি— তিব্বতি-বার্মা (Tibeto Burman), অর্থে জল, বস্তু (water, things)। উদাহরণ—ডহুচি: মালদহ, নাড়িচা: হুগলি, বঁইচা: নদিয়া।

জোল/জুলি— দ্রাবিড় 'গোটা' (Dravidian gota), আসামি 'গোল' (Assamese gol), কান্ধ 'গোরর' (Kandh gorr)। উদাহরণ— পুঁটীজোল: মুর্শিদাবাদ, গাজোল: মালদহ, খারজুলী: বর্ধমান, কাইজুলি: বীরভূম।

জোড়/জোড়া/ জুরি/ জুড়া/ জুড়িয়া—দ্রাবিড় 'গোটা' 'জোটিকা' 'জোরা' (Dravidian gota, jotika, jora)। অর্থ নদীখাত, জলপথ (channel, water-course)। উদাহরণ—শালজোড়: হাওড়া, আমলাজোড়: বর্ধমান, আড়াজুড়ি: বাঁকুড়া, শিমজুড়ি: বর্ধমান।

ঝোর/ঝোরা— কন্নড় 'জোরু' (Kannada joru) অর্থে জলধারা বা ঝরনা (drip, flow, trickle) উদাহরণ— আসনঝোর: বাঁকুড়া, সাঁকোঝোরা: জলপাইগুড়ি।

দহ/দা— অস্ট্রিক (Austric), কোলারিয়ান (Kolarim), মুণ্ডা (Munda) অর্থে জল, জলাশয় (water, water-body)। উদাহরণ—নওদা: মুর্শিদাবাদ, খড়দহ: চব্বিশ-পরগনা।

পোল/ভোল— তেলুগু 'পোলাম' (Telegu polam), কন্নড় 'পোলাল' (Kannada polal)। অর্থে খেত, শস্যখেত (field, cornland) উদাহরণ—গিলাপোল: নদিয়া, গুড়পোল: হাওড়া, কপিতভোল: মেদিনীপুর।

বাটিটাকি— ওড়িয়া (Oriya) অর্থে, সেইসব জমি যাদের খাজনা প্রতিবাটি (অর্থাৎ ২৪ বিঘা) পিছু মাত্র একটাকা। উদাহরণ: অম্বিবাটিটাকি: মেদিনীপুর, গুড়িবাটিটাকি: মেদিনীপুর।

বাড়— অস্ট্রিক (Austric)। উদাহরণ—বাড়বাকড়া: বাঁকুড়া, বাড়বেগুনিয়া: মেদিনীপুর।

বাহারা— মরাঠি (Marathi), অর্থে জলাভূমি বা অন্যজমি যা বন্যায় প্লাবিত হয়। উদাহরণ—মঠবাহারা: বীরভূম, আমলাইবাহারা: বীরভূম, পানবাহারা: মালদহ।

বির— সানতালি (Santali) অর্থে, অরণ্য (forest) উদাহরণ—বিরকোটা: মেদিনীপুর, বিরগুছিনা: মেদিনীপুর।

বুদবুদ/ দমদম/ বজবজ/ কোলকোল—সম্ভবত অস্ট্রিক (Austric), অন্যান্য এই ধরনের নামের অপভ্রংশ কীভাবে হল তা সঠিক জানা যায় না।

ভিটি/ভিটা— তামিল 'ভিদু', 'ভিট্টু' (Tamil vidu, vittu), দ্রাবিড় '(বি) Dravidian '(B hitti') অর্থে ভিটা, বাস্তুভিটা (homes, homestead land)। উদাহরণ—রাঙাভিটা: মালদহ, ভোগভিটা: দার্জিলিং।

মুণ্ডা— অস্ট্রিক। উদাহরণ—চামুণ্ডা, গোমুণ্ডা

শোল/ শোলা/ শুলি—দ্রাবিড় 'জোটা', 'জোলি' (Dravidian jota, joli) অর্থে নালি, ছোট নদী (channel, stream) উদাহরণ—আসনাশোল: বাঁকুড়া, বাবুইশোল: বর্ধমান, কোলশুলি: বাঁকুড়া, বেলেশুলি: বীরভূম।

ড়— দ্রাবিড় 'বড়া' (Dravidian vada), কোলারিয়ান, 'ওড়াক' (Kolarian, orak) অর্থে গৃহ (house)। উদাহরণ—হাওড়া: হাওড়া, উখড়া: মালদহ, গোবড়া: নদিয়া, ইকড়া: বীরভূম।

হকাণ্ড— তামিল 'আন্ডাই' (Tamil andai) অর্থ খেতের উঁচু প্রান্ত (raised side of a field)। উদাহরণ—ছোটহকাণ্ড: মেদিনীপুর, গুজিহকাণ্ড: মেদিনীপুর।

গ্রন্থপঞ্জি

অন্নদাশঙ্কর রায়— ছড়া সমগ্র।

অমলেন্দু মিত্র— রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর।

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়— বাঁকুড়ার মন্দির।

পশ্চিমবাংলার গ্রামের নাম।

ছড়ায় স্থান বিবরণ।

অশোক মিত্র (সম্পাদিত)— পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা (পাঁচ খণ্ড)।

কালীপদ লাহিড়ী— গৌড় ও পাণ্ডুয়া।

কুমুদনাথ মল্লিক— নদীয়া কাহিনী।

গৌরহরী মিত্র— বীরভূমের ইতিহাস।

তারাপদ সাঁতরা— ছড়া প্রবাদে গ্রাম বাংলার সমাজ।

দীনেশচন্দ্র সেন— বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য।

নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়— বীরভূম কাহিনী।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার (পুরাতত্ত্ব/ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ)

পুরাকীর্তি সমীক্ষা, মেদিনীপুর

কোচবিহার জেলার পুরাকীর্তি

বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি।

পূর্ণেন্দু পত্রী— ছড়ায় মোড়া কলকাতা।

পূর্ব-রেল বিভাগ (১৯৪০)— বাংলায় ভ্রমণ (দুই খণ্ড একত্রে)।

প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়— মহানাদ বা বাংলার গুপ্ত ইতিহাস।

ফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী— শ্রীরামপুর পরিচিতি।

বিনয় ঘোষ— পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি।

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়— হেটো বই হেটো ছড়া।

পশ্চিমবঙ্গের লৌকিক দেবদেবী ও লোকবিশ্বাস

ব্রজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়— সংবাদপত্রে সেকালের কথা (দুই খণ্ড)।
মোহিত রায়— নদীয়া স্থান নাম।
যতীন্দ্রমোহন দত্ত— পশ্চিমবঙ্গের গ্রামের নাম (প্রবন্ধ, প্রবাসী আশ্বিন-কার্তিক ১৩৬৪ সংখ্যায় প্রকাশিত)।
যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি— গ্রামের নাম (প্রবন্ধ, প্রবাসী আশ্বিন ১৩১৭ সংখ্যায় প্রকাশিত)।
যোগেশচন্দ্র বসু— মেদিনীপুর ইতিহাস।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর— লোকসাহিত্য।
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়— বাঙ্গালার ইতিহাস (দুই খণ্ড)।
রাধারমণ মিত্র— কলিকাতা দর্পণ।
শিবনাথ শাস্ত্রী— রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ।
সমীরেন্দ্র সিংহরায়— আমাদের গ্রাম।
সুকুমার সেন— বাংলা স্থান নাম।
ভাষার ইতিবৃত্ত।
সুধীরকুমার পালিত— বাঁকুড়ার ভূগোল ও ইতিবৃত্ত।
সুধীরকুমার মিত্র— হুগলি জেলার ইতিহাস (তিন খণ্ড)।
সুধীর চক্রবর্তী— পশ্চিমবঙ্গের মেলা ও মহোৎসব।
সুবলচন্দ্র মিত্র (সংকলিত)— সরল বাংলা অভিধান।

Archaeological Survery of India— Bishnupur.
Bengal District Gazetteers— Bankura, Birbhum, Burdwan, Dinajpur, Hooghly, Howrah, Jalpaiguri, Kochbihar, Malda, Midnapore, Murshidabad, Nadia, Purulia, 24 parganas.
Chanda, S. N: Saints in Indian Folklore.
Chatterjee, Suniti Kumar: The Origin and Development of the Bengali Language.
Ghosh, J. C. : Bengali Literature.
Goswami, Krishnapada : Place-Names of Bengal (article; published in Calcutta University Journal of the Department of Letters- 1943).
Hunter. W.W. : Annals of Rural Bengal

Mazumdar, R, C. :History of Ancient Bengal
Mitra, Asok (edit) : West Bengal District Census Handbook- 1951 : Bankura, Burdwan, Birbhum, Coochbehar, Darjeeling, Hooghly, Jalpaiguri, Malda, Midnapore, Murshidabad, Nadia, 24-Parganas, West Dinajpur.
Sengupta, Shankar : Folklore of Bengal.
Statesman, The Calcutta Tercentenary Issue.
Wilson, H. H.: A Glossary of Judicial and Revenue terms and useful words occuring in official documents, etc- 1855- Reprinted as Wilson's Glossary-1940.

স্থাননামের সূচি

উল্লিখিত স্থাননামের জেলা অনুসারী সূচি

কুচবিহার

চব্বিশ পরগনা (উত্তর)

চব্বিশ পরগনা (দক্ষিণ)

জলপাইগুড়ি

দার্জিলিং

দিনাজপুর (উত্তর)

দিনাজপুর (দক্ষিণ)

নদিয়া

পুরুলিয়া

বর্ধমান

বাঁকুড়া

বীরভূম

মালদহ

মুর্শিদাবাদ

মেদিনীপুর (পশ্চিম)

মেদিনীপুর (পূর্ব)

হাওড়া

হুগলী

বিশেষ সূচি

বিষয়সূচি
